মুহাম্মাদ আল-গাযালী

ইসলামী আকীদা

অনুবাদ

মুহাম্মদ মূসা

খোশরোজ কিতাব মহল

মুহাম্মাদ আল-গাযালী

ইসলামী আকীদা

অনুবাদ

মুহাম্মদ মূসা

খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৭১১৭০৮৪, ৭১১৭৭১০

প্রকাশক

মহীউদ্দীন আহমদ

খোশরোজ কিতাব মহল

১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

ফোন ঃ ৭১১৭৭১০, ৭১১৭০৮৪

প্রথম প্রকাশ	ঃ	আগস্ট,	১৯৮৬
দ্বিতীয় প্রকাশ	ঃ	জুন,	১৯৯২
তৃতীয় প্রকাশ	ঃ	এপ্রিল,	১৯৯৭
চতুর্থ প্রকাশ	ঃ	অক্টোবর,	২০০৯

মূল্য ঃ দুইশত টাকা মাত্র

ISBN : 984 - 438 - 054 - 5

মুদ্রণে

মহীউদ্দীন আহমদ

জাতীয় মুদ্রণ

১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা - ১১০০

ফোন ঃ ৭১২০০৫৩

প্রকাশকের কথা

প্রখ্যাত মিসরীয় পণ্ডিত ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযালী বিরচিত 'আকীদাতুল মুসলিম' শীর্ষক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'ইসলামী আকীদা'। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয় নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। বিষয় তিনটি হল ঃ তৌহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। ইসলামের যাবতীয় আকীদা সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে এ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

ইসলামী আকীদা বা বিশ্বাসজনিত বিষয়গুলো অনুধাবন করা সহজ ব্যাপার নয়। এজন্য গভীর জ্ঞান, উপলব্ধি ও সদাজাগ্রত অনুভূতির প্রয়োজন। তবে আলোচ্য পুস্তকে জনাব গাযালী অতি সহজভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়গুলো পাঠকদের সামনে পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম মহলে অমুসলিমদের মনগড়া জড়বাদী দর্শন ও যুক্তিবাদের প্রভাবকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বাংলা ভাষায় সেসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবির ইসলাম বিরোধী দর্শন-চর্চার মোকাবেলা করার মত কোন পুস্তক এ যাবত প্রকাশিত হয়নি। এক্ষেত্রে মুহাম্মাদ আল-গাযালীর লেখা 'ইসলামী আকীদা' গ্রন্থটি একটি অভিনব সংযোজন। গ্রন্থকার জীবিত নেই। আমরা তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করি।

বর্তমান যুগ-পরিবেশে এ গ্রন্থখানির ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পুনঃমুদ্রণ করা হল।

আশা করা যায়, গ্রন্থখানি পাঠক সাধারণের কাছে সমভাবেই সমাদৃত হবে।

— প্রকাশক

অনুবাদকের আরয

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সায়্যিদিল মুরসালীন। ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন। 'ইসলামী আকীদা' বইটি মূলত মিসরীয় লেখক এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুন-এর অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ আল-গাযালীর লেখা "আকীদাতুল মুসলিম" গ্রন্থের বাংলা রূপান্তর। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর এই লেখকের অসংখ্য বই রয়েছে। আরবী ভাষী পাঠকের কাছে তা খুবই সমাদৃত হয়ে আসছে।

'ইসলামী আকীদা' গ্রন্থে লেখক ইসলামের তিনটি মৌলিক দিক তৌহীদ, রিসালাত এবং আখেরাত সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ইসলামের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস মূলত এ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। লেখক প্রতিটি বিষয়ের সপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে যুক্তি পেশ করেছেন। প্রতিটি জটিল বিষয়কে তিনি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'আকদ' শব্দ থেকেই 'আকীদা' এবং 'ইতিকাদ' শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি। 'আকীদা' বলতে এমন জিনিস বুঝায়, যার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় অথবা মানুষ যাকে নিজের দীন হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এ শব্দটিরই বহুবচন হচ্ছে, 'আকাইদ'। 'ইতিকাদ' শব্দের অর্থ সত্য বলে মেনে নেয়া, অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করা, দীন হিসেবে গ্রহণ করা। ইসলামী আকীদা বলতে এমন জিনিস বুঝায়, যার উপর ঈমান এনে একজন মানুষ মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এবং যার উপর থেকে ঈমান প্রত্যাহার করে নিলে একজন মুসলমান ইসলামের গণ্ডি থেকে বাইরে চলে যায়।

আকাইদ শাস্ত্রের উপর আরবী ভাষায় প্রচুর বই-পুস্তক রচিত হলেও বাংলা ভাষায় এর উপর কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ এ পর্যন্ত রচিত হয়নি। ফলে এ

বিষয়ের সাথে বাংলাভাষী পাঠকগণ বলতে গেলে একেবারেই অপরিচিত। মাদরাসাসমূহে এর কিছু সীমিত চর্চা থাকলেও তা নির্ভেজাল ইসলামী আকাইদ হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে না। তার উপর রয়েছে যুক্তিবাদ, প্লেটোবাদ, গ্রীক দর্শন, বেদান্ত দর্শন ইত্যাদির প্রভাব। তাছাড়া এর সাথে ইসলামী আকাইদের নামে যুক্ত হয়েছে এমন কতকগুলো বিষয়, যা ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দর্শন বিভাগে এর কিছু চর্চা থাকলেও তা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হচ্ছে না ; দর্শনের একটি আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবেই তা পড়ানো হচ্ছে।

আকাইদ শাস্ত্রের এই ত্রুটিপূর্ণ ও সীমিত চর্চার কারণে এ দেশের মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসেও রয়েছে মারাত্মক ত্রুটি। বিশ্বাসের মধ্যে ত্রুটি থেকে গেলে যাবতীয় কাজের মধ্যে তার ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এ কারণেই এখানকার মুসলমানদের মধ্যে কবর পূজা, পীরপূজা এবং শির্ক-বিদআতের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের বিশ্বাস হচ্ছে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে উসিলা (মাধ্যম) না বানালে ঈমান ঠিক হবে না, আখেরাতে পার পাওয়া যাবে না এবং বেহেশতে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথচ এই মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎখাতের জন্যই ইসলামের আগমন। ইসলাম ঘোষণা করছে ঃ আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝখানে কোন মধ্যস্বত্বভোগীর স্থান নেই। বান্দা সরাসরি তার প্রভুর কাছে আবেদন জানাবে।

ইমরান ইবনুল ফাসীল (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে নবুওয়াত দানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন। সর্বোত্তম এমন কি জিনিস আছে, বান্দা যাকে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উসিলা বানাতে পারে ?" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশের অনুগত হও, তাঁর নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য কর, মিথ্যা পরিত্যাগ কর এবং সত্যের সহায়তা কর" (আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ.

২৮)। তাদের আরো বিশ্বাস মুসলমানরা যত অপরাধই করুন না কেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের শাফাআত করে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেবেন।

লেখক এ জাতীয় অলীক ধারণা-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছেন এবং ইসলামের সঠিক আকীদা-বিশ্বাসকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রমাণ সহকারে তুলে ধরেছেন। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এ বইখানি যথেষ্ট উপকারী হবে বলে আমরা আশা রাখি।

মূল গ্রন্থের বাংলা প্রতিলিপি প্রস্তুত করার ব্যাপারে মুহতারাম আবদুল মান্নান তালিব সাহেব (সম্পাদক ঃ মাসিক 'পৃথিবী' ও মাসিক 'কলম') আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। যেখানে বিষয়বস্তু অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছে — তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে বিষয়টিকে সহজ করে নিয়েছি। বলতে গেলে অনেক জায়গায় তিনি নিজ হাতে অনুবাদের প্রয়োজনীয় সংশোধনও করে দিয়েছেন। আরবী কবিতাগুলোর বাংলা কবিতারূপ তিনিই দিয়েছেন।

মূল গ্রন্থে হাদীসসমূহের কোন বরাত দেয়া হয়নি। আমি অনেক পরিশ্রম করে তার বরাত সংগ্রহ করেছি। এরপরও যেগুলোর বরাত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, ইন্‌শাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন করা হবে। কুরআনের আয়াতসমূহের তরজমার ক্ষেত্রে তাফহীমুল কোরআন, মাআরেফুল কোরআন, বায়ানুল কোরআন এবং আল-কুরআনুল করীম (ফাউন্ডেশন) অনুসরণ করা হয়েছে।

তারিখ ঃ ২৪ মুহাররম, ১৪০৬
১০ অক্টোবর, ১৯৯৬

মুহাম্মদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা, পো ঃ কালাইয়া
জেলা ঃ পটুয়াখালী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর জন্য। সালাত ও সালাম সর্বশেষ নবী রহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতি। ইসলামের দুইটি দিক — একটি, বিশ্বাসগত ; অপরটি, ক্রিয়াগত। আকাইদ শাস্ত্র এই বিশ্বাসগত দিক অর্থাৎ ঈমান ও আকীদা নিয়ে আলোচনা করে। এটি বলতে গেলে তাত্ত্বিক, অতি সূক্ষ্ম, নিরস ও জটিল বিষয়। আর ফিক্হ শাস্ত্র বিশ্বাসের ব্যবহারিক অর্থাৎ ক্রিয়াগত দিক ও তার বিধান নিয়ে আলোচনা করে। বর্তমান শতকের লেখক শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযালী বিষয়টিকে সরস, সজীব ও সহজবোধ্য করে তুলে ধরে তাঁর পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি প্রধানত তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করেছেন — তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাত। লেখক প্রতিটি বিষয়ের আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকেও যুক্তি পেশ করেছেন।

গ্রন্থখানি প্রথম, প্রকাশিত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে মুদ্রিত সকল কপি বিক্রি হয়ে যায়। বিভিন্ন অসুবিধার কারণে গ্রন্থখানি সত্বর পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়নি। বিলম্বে হলেও ইফাবা কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন। আল্লাহর বান্দাগণ গ্রন্থখানি দ্বারা উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। — আমীন।

বিনীত

অনুবাদক

তারিখ ঃ ঢাকা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯

যিলহজ্জ, ১৪১২

জুন, ১৯৯২

ভূমিকা

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু কথা পাঠকদের সামনে পেশ করছি। গোটা দীনের ইমারত আকাইদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আলোচনাটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখ এজন্য যে, আজ পর্যন্ত এই বিষয়কে সঠিক খাতে কমই প্রবাহিত করা হয়েছে। আমাদের ধর্মীয় সাহিত্যের মধ্যে এমন কিতাবের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত, যা বর্তমান যুগের মুসলমানদের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে এবং এদিক থেকে তাদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্বস্ত করতে পারে। এই অভাব অনুভব করেই আকাইদের দুরূহ আলোচনায় নেমেছি।

আকাইদ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে ভঙ্গিতে আলোচন্য করা হয়েছে তা থেকে ভিন্নতর ভঙ্গিতে আমরা এই আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করেছি এবং আকাইদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিসমূহকে ভিন্নতর পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছি। জ্ঞান গবেষণার বাজারে কোন অভিনব সৃষ্টি উপস্থাপন করার আশায় আমি তা করিনি। বরং অতীত অভিজ্ঞতা, ইসলামের ইতিহাস সংঘটিত দুর্ঘটনা এবং কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও দলিল-প্রমাণের আলোকেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

নাম সর্বস্ব 'ইলমে কালাম' অথবা 'ইলমে তাওহীদের' মধ্যে যে ব্যক্তিই আকাইদের আলোচনা পড়বে, আলেমগণ যেসব জটিল সমস্যায় ভুগছেন এবং তাদের মধ্যে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক বাহাস চলছে, যে ব্যক্তিই তা অধ্যয়ন করবে, অতঃপর এই বিতর্কের পরিণতিতে যে ফলাফল সামনে এসেছে এবং বিশেষ ও সাধারণ নির্বিশেষে সবার ঈমান ও আমলের উপর যে প্রভাব পড়েছে, যে ব্যক্তিই তা মূল্যায়ন করবে — সেই ব্যক্তি মৌলিকভাবে কয়েকটি ধারণা কায়েম না করে থাকতে পারে না। আমরা কালামশাস্ত্রের যত বই-পুস্তক পাঠ করেছি তার আলোকে কালামশাস্ত্রের ধরন ও নীতি-পদ্ধতির ব্যাপারে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক. বর্তমানে প্রচলিত কালামশাস্ত্রের প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক। সেখানে কতগুলো বিষয় ঠিক করে তা থেকে কতগুলো নির্দিষ্ট ফলাফল বের করা হয় মাত্র। বর্তমান যুগের গণযন্ত্রের *(Calculator)* কাজের যে ধরন, কালামশাস্ত্রের কাজের ধরনও অনেকটা তেমনি। অথবা তার

ধরনটাকে পরিমাপযন্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়। তা একটি কার্ডের উপর জিনিসের পরিমাণের অংকটা মুদ্রিত করে দেয় এবং কার্ডটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামনে রেখে দেয়া হয়। কালামশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দলিল প্রমাণ পেশ করার ধরনটা সম্পূর্ণ তদ্রূপ। নিঃসন্দেহে কালামশাস্ত্রে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের সামনে এসেছে, যার ফলে আমাদের বুদ্ধিবিবেক প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

কিন্তু ইসলামের প্রকাশভঙ্গী তার চেয়ে ভিন্নতর। সে কেবল বুদ্ধি-বিবেককেই সম্বোধন করে না। সে আকাইদের পুনর্গঠন করতে গিয়ে বুদ্ধি-বিবেক এবং হৃদয় উভয়কেই সম্বোধন করে। সে চিন্তা ও অনুভূতি উভয়কেই নাড়া দেয়। সে মানসিক শক্তিকে সজাগ করার সাথে সাথে আবেগ-অনুভূতিকেই জাগ্রত করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ইলমে তাওহীদ' যেভাবে পড়ানো হয় আমি অতি কাছে থেকে তা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, এ্যালজাবরার সমাধানের *(Algebraic Equation)* ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা যেরূপ হয়ে থাকে — তাওহীদের পাঠ গ্রহণ করার সময় তাদের ঠিক তদ্রূপ মানসিক অবস্থা হয়ে থাকে। এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যার ধরন এবং তার প্রভাবের মধ্যে আমি উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য অনুভব করিনি।

ইলমে তাওহীদ এবং কালামশাস্ত্র নিঃসন্দেহে জ্ঞানকে প্রখর করে, কিন্তু অন্তরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী সত্তা (ওয়াজিবুল ওয়াজুদ) এবং তাঁর চিরন্তনত্বের সপক্ষে ডজন ডজন প্রমাণ পেশ করা হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর অন্তর সেই মহান স্রষ্টার মহিমা-গৌরবের অনুভূতি থেকে শূন্য রয়ে যায়। যে মহান সত্তা তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, ভাল ও খারাপ কাজের অনুভূতি দান করেছেন — তাঁর জন্য সে নিজের অন্তরে আকর্ষণ ও ভালবাসা অথবা ভয়-ভীতির কোন উত্তাপ অনুভব করে না।

আকাইদ শিক্ষার পদ্ধতি কি এরূপ হওয়া উচিত ছিল ? আকাইদ শাস্ত্রের এই স্থবিরতার ফলে লোকেরা তাসাউফের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়। এখানে তারা নিজেদের যে পিপাসা নিবারণ করতে পারেনি, তাসাউফের কাছে তা নিবারণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাসাউফ এমন একটি উপত্যকা যেখানে পদস্খলনের আশংকাই অধিক। এখানে পথ খুব কমই পাওয়া যায়, বরং পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাসাউফ এমন একটি প্রস্তরময় মরুভূমি, যেখানে পরিভ্রমণকারী সাধারণত নিজের গন্তব্য স্থান সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাসাউফ যে আল্লাহ প্রেমের কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি করে তাতে সন্দেহ নেই। তা অন্তরকে বিশ্ব স্রষ্টার সাথে কিছুটা সংযুক্ত করে বটে, কিন্তু এই পথে পা পিছলে যাওয়ার এত বেশি আশংকা রয়েছে যে, তা চিন্তা করলে শরীর শিউরে উঠে।

আকাইদের যে আলোচনা আজ পর্যন্ত শুষ্ক, নিরানন্দ এবং নিরেট দার্শনিক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার মধ্যে কিছুটা উষ্ণতা ও জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। এজন্য আমি কিতাব ও সুন্নাতকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করেছি।

দুই. যে অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে আকাইদ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটেছে তা এই শাস্ত্রের মেজাজ-প্রকৃতির উপর গভীর এবং খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজনৈতিক সংঘাত এবং ফেরকাগত বিরোধ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রচলিত বিতর্কে শত্রুতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, অপবাদ ও সমালোচনার এমন ধ্বংসাত্মক বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে যে, কয়েক শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত আমরা সেই তিক্ত ফল ভোগ করছি। প্রচণ্ড বিরোধ ও সংঘাতময় পরিবেশে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ অবস্থায় যদি প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভবও হয় তাহলে তাকে উদার মনে গ্রহণ করে নেয়াটা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এরূপ ধারণা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, যদি আমরা মনে করি যে,

কোন বিতর্ক অনুষ্ঠানে একত্র হয়ে আকাইদের মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেখানে শব্দের মারপ্যাঁচ, ফেরকাগত স্বার্থে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা এবং বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করার প্রবণতা প্রবল থাকে, যেখানে হাতে থাকে এরিস্টটলীয় দর্শনের তীর এবং সেই তীরের আঘাতে নিজের প্রতিপক্ষকে জনসমক্ষে অপদস্থ করার মনোভাব কার্যকর থাকে, সেখানে এরূপ জটিল বিষয়ের সমাধান বের করা মোটেই সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ আমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষমা করুন, এ ধরনের বিতর্কে তাঁরা আগ্রহের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং তাকে আরো মারমুখী করে তোলেন। অথচ এ সময় মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিই দুনিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এভাবে তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের পরিবর্তে বিতর্কের এ ভয়ংকর ময়দানে পরস্পর মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে তাঁরা শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকেন। তাঁরা অতীত হয়ে গেলেও এই বিতর্কযুদ্ধ আজ সশরীরে বিরাজমান। তাঁদের অবিনশ্বর দেহ বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক ঝগড়া এখনো বেঁচে আছে। .... আর তা মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক এবং তার অস্তিত্বের জন্য স্থায়ী বিপদে পরিণত হয়ে আছে।

ইসলামী বিশ্ব জঙ্গী খ্রিস্ট জগতের সামনে শেষ পর্যন্ত মাথা হেট করে দিয়েছে. এ মর্মান্তিক চিত্রও আমরা দেখেছি। ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারীদের চিন্তাগত বিরোধের ফলেই ঘটেছে এই পরাজয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই পুঁতিগন্ধময় ঐতিহাসিক বিতর্কের ঝড় চলছেই। দুঃখের বিষয়, আজ যারা ইসলামের খেদমতের দাবিদার—তাদের কোন কোন দল এই ঝগড়াকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে।

আমি বুঝতে পারছি না — মুসলিম মিল্লাতের মত অন্য কোন মিল্লাতে আজ চিন্তার ঐক্য ও আবেগের একাত্মতার এত বেশি প্রয়োজন আছে কি ? অতএব কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দিলে তাকে মিল্লাতের চিন্তাশীল ও মননশীল ব্যক্তিদের গণ্ডী থেকে বের করে এনে জাতীয় পর্যায়ে দাঁড় করানোটা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং

মুসলিম উম্মাতের সাথে প্রকাশ্য দুশমনিরই নামান্তর বলা যায়। বাকযুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উস্তাদ আহমাদ ইজ্জাত পাশা বলেন ঃ

এটা এমন কোন ঝগড়া ছিল না যা বৈঠকে আলোচনা, তর্কশাস্ত্রের পরিধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের সীমা অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু আমরা এই অর্থহীন বিতর্কের মধ্যে মহামহিম আল্লাহ্‌র নামকেও ঢুকিয়ে দিয়েছি।

অতএব আমাদের মধ্যকার প্রতিটি দল প্রতিপক্ষকে কাফের বলে ফতোয়া দেয়ার চেষ্টায় রত হল। এভাবে এই প্রাথমিক বিরোধ মাযহাবী যুদ্ধের রূপ নেয়, যার লেলিহানশিখা নির্বাপিত হচ্ছে না। জাহ্‌মিয়া ও মুতাযিলাদের মধ্যকার বিরোধ মূলত এখান থেকে শুরু হয় যে, একদল বলল ঃ বান্দা নিজেই তার কাজের স্রষ্টা। তারা কর্তার পরিবর্তে স্রষ্টা শব্দের ব্যবহার করে। তারা বলে ঃ বান্দা তার ইচ্ছার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এই আকীদা সঠিকই হোক অথবা ভ্রান্ত হোক — তা ইলমী বাহাসের বিষয়বস্তু হতে পারে। এতে উভয় দলের সর্বাধিক এতটুকু অধিকার অবশ্যই ছিল যে, একদল অপর দলের মত প্রত্যাখ্যান করতে পারত, তার সমালোচনা করতে পারত এবং তার ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা তুলে ধরতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকল না।

কাদরিয়া সম্প্রদায় বলল ঃ আমাদের আকীদাকে স্বীকার না করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা যদি আখেরাতে কাউকে শাস্তি দেন তাহলে তিনি জুলুমই করবেন।

অপর দল বলল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ব্যাপকতা এবং তাঁর কুদরতের সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করছ। এটা কুফরীরই শামিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের মতবিরোধ চলছিল। অতঃপর কালের প্রবাহে তার ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা থেকে অদ্ভুত ও অযৌক্তিক মতবাদের জন্ম হতে থাকে।

মতবিরোধ এবং বিতর্ক এতটা আকর্ষণ সৃষ্টি করে যে, আকাইদের মধ্যে অনেক হাস্যকর ও যুক্তিহীন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং মুতাযিলা সম্প্রদায়

এবং আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে এও একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে পড়েছে যে, যাদুর তাৎপর্য কি ? মেঘ কিভাবে সৃষ্টি হয় ? এই হাস্যস্পদ কথার কি কোন আগামাথা আছে ?

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এবং অপরাপর সাহাবীর মধ্যে খিলাফতের প্রসঙ্গ নিয়ে যে মতবিরোধ হয়েছিল, আজও মুসলমানরা তাতে জড়িত হয়ে নিজেদের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। এই উম্মাত ছাড়া জমিনের বুকে আর কোন উম্মাত আছে কি, যারা নিজেদের বিস্মৃত অতীতের ইতিহাসের মর্মান্তিক বিবাদকে এভাবে চোষণ করে ?

আবার এ ব্যাপারটিকে আমরা কোন আকীদার বিষয়বস্তুর মধ্যে ঢুকাচ্ছি ? এটাকে আমরা কেন অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার মত শুধু ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি না ? কেন লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে ? আমরা যদি কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেই যে, অমুক ব্যক্তি ভুল করেছে এবং অমুক ব্যক্তি ঠিক করেছে তাহলে আমাদের এই ফয়সালার সাথে আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমানের কি সম্পর্ক আছে ? অথচ আল্লাহ্ তাআলার পরিষ্কার বাণী রয়েছে ঃ

তারা ছিল একটি দল যা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের জন্য ; আর তোমরা যা কিছু অর্জন করবে তার ফল তোমরাই ভোগ করবে। তারা কি করছিল তা তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে না।

— সূরা আল-বাকারা ঃ ১৩৪ এবং ১৪১ আয়াত

আজ যখন আমরা আমাদের দ্বীনী পুস্তিকাসমূহে নামসর্বস্ব সালাফী এবং অ-সালাফীদের বাকবিতণ্ডার প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই, তাদের মুখে নিজেদের ভাইদের জন্য কুফরী ও ফাসেকীর শব্দ এমনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে যেন পায়ের আঘাতে খেলার বল অহরহ ডিগবাজি খাচ্ছে। এই অবসন্ন জাতির দুর্বল শরীরে ধ্বংসাত্মক ব্যাধি নিজের বাসা বানিয়ে নিয়েছে এবং তা অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থপ্রাণ পথপ্রদর্শকের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।

এই অনর্থক মতবিরোধ উম্মাতের মন-মানসিকতায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তাদের জীবনে এর প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই মতবিরোধের যে ভাল দিক রয়েছে তাতে তারা হাতও লাগায়নি, কিন্তু ক্ষতিকর দিকটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে।

যদিও আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, আমল ছাড়া ঈমানের অস্তিত্ব সম্ভব কি না ? আমলে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য উপাদান, না আনুসঙ্গিক বিষয় ? তবুও সাধারণ মুসলমানদের কাছে একথাই গৃহীত হল যে, ঈমানের জন্য আমল জরুরী নয়, আমল ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, শুধু তার রং এবং পালিশ। এভাবে মিল্লাতে ইসলামিয়া এই মতবিরোধকে নিজেদের কর্মবিমুখতার সপক্ষে বাহানা হিসাবে দাঁড় করেছে।

যদিও পূর্ববর্তীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষ সংকল্প এবং কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন, না কোন অদৃশ্য শক্তির অধীন ? এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে একথা অগ্রাধিকার পেল যে, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতার মালিক নয়, সে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন, অসহায়, নিয়ন্ত্রিত এবং হুকুমের দাস। এভাবে মুসলিম সমাজ কাপুরুষতা, হীনমন্যতা ও নিরুৎসাহের শিকার হয়ে পড়ে।

পূর্ববর্তীদের মধ্যে বিতর্ক চলল যে, মুসলমানরা জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তিদের উসীলা ছাড়া আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হতে পারে কিনা ? তখন মুসলমানদের মধ্যে এই কথাই সাধারণভাবে গৃহীত হল যে, পীর-ওলীগণের মধ্যস্থতার একান্ত প্রয়োজন। যদি কেউ কোন পীরের মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছার দুঃসাহস করে তাহলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এর ফলে সমাজে শিরকের ধ্বংসাত্মক বিষ ছড়িয়ে পড়ল এবং আসমান-যমীনের স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে গেল।

এভাবে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে পাপের অসংখ্য ব্যাধি জন্ম নেয়, যা উম্মাতের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উম্মাতের পতনের জন্য এগুলোই অনেকাংশে দায়ী।

আমি ইসলামী আকীদার সঠিক চিত্র পেশ করতে গিয়ে এসব বিরোধের কাঁটা থেকে নিজের কাপড় বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। যেখানে এই বিরোধ থেকে দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব ছিল, সেখানে আমি নিজের দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু যেখানে তার প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি, সেখানে তার প্রতিবাদ করেছি এবং যে কথা আমার কাছে অধিকতর সঠিক মনে হয়েছে, তা ব্যক্ত করেছি। কোথাও প্রতিপক্ষের অজ্ঞতাকে চিহ্নিত করতেও হয়েছে—কিন্তু তার উপর কুফরীর ফতোয়া চড়ানো থেকে অবশ্যই বিরত থেকেছি। অজ্ঞতাকেও শুধু এজন্যই চিহ্নিত করেছি যে, আমার মতে এই অজ্ঞতাই অনেক জটিল সমস্যার মূল কারণ। তাই তা চিহ্নিত করা একান্ত প্রয়োজন।

অনেক সময় এ ব্যাপারে আমাকে কোন কোন ব্যক্তির বদমেজাজ ও কর্কশ ব্যবহারের শিকার হতে হয়েছে। আমি তার প্রতিটি কথার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে তা উপেক্ষা করে যাওয়াটাই উত্তম মনে করেছি। তার কারণ এই যে, এমন এক উম্মাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে, যাদের এ সময় ঐক্য ও সংহতি একান্ত প্রয়োজন। অতএব আমাদের নিজেদের স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে তার মূল্য আদায় করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হিসাব নেবেন।

তিন. আকাইদ শাস্ত্রের অবস্থা তো এই, যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। এখন এই বিষয়ের উপর আমাদের এখানে যেসব বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে তা উদ্দেশ্যের দিক থেকে চরমভাবে ব্যর্থ, বাহ্যিক সাজসজ্জা, ছাপা ও বাঁধাইয়ের দিক থেকেও এবং বিষয়বস্তু ও তথ্যের দিক থেকেও। বাহ্যিক দিক থেকে বলতে গেলে কোন জ্ঞান-ভাণ্ডারকেই এভাবে তুলে ধরা হয় না। একদিকে মূল পাঠ, অপরদিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আরেক দিকে টীকা-টিপ্পনী। তা এমন বিক্ষিপ্তভাবে বিন্যস্ত যে, একটি অপরটির সাথে একাকার হয়ে গেছে। তার উপর বিশ্রী ভাষা এবং দুর্বল প্রকাশভঙ্গী।

আমাদের এ যুগে সাহিত্য এত উন্নতি লাভ করেছে যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ লেখক ও সাহিত্যিকগণ ভাষার উপর এতটা দক্ষতা অর্জন করেছেন যে, তারা অতি সাধারণ বিষয়কেও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রীতিতে উপস্থাপন করেন। এভাবে তারা হাজারো মানুষকে নিজেদের যাদুকরী বর্ণনার প্রভাবে যেদিকে চান সেদিকে টেনে নিয়ে যান। তাহলে আমাদের আকাইদ শাস্ত্র কি অপরাধ করেছে যে, তা মূল পাঠ আর টীকাসহ ক্ষয়িষ্ণু, প্রাণহীন ও দুর্বল ভঙ্গিতে পেশ করা হবে ?

আমরা এই বাহ্যিক ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করলেও তার অভ্যন্তরীণ ও সৌন্দর্যগত ত্রুটিও কম নয়। আমরা যখন আকাইদ শাস্ত্রের উপর সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন প্রথম দৃষ্টিতেই অনুভব করতে পারি যে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা এবং তাঁর গুণাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামী সংস্কৃতির এই শাখাটি গ্রীক, ইহূদী ও অন্যান্য দর্শনের দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে ইসলামী আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার নিজস্ব রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং আকাইদ শাস্ত্রের উপর লিখিত বই-পুস্তক দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার চিন্তাধারার জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে।

কত বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, ইসলামী সংস্কৃতির এই বিভাগটির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে পূর্ববর্তী যুগের আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ গ্রীক দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা নিকৃষ্টভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার মধ্যে এই বিষ মিশ্রিত করে রেখে দিয়েছেন। আমরা তাঁদের এই ভূমিকার রহস্য ও দূরদর্শিতা অনুধাবন করতে অক্ষম। অবশ্য ইসলাম মানুষকে চিন্তার যে স্বাধীনতা দিয়েছে তা থেকে বিষয়টি প্রমাণিত হয়। নিঃসন্দেহে ইসলামের জ্ঞানচর্চা কোন বিশেষ দেশ বা জাতিপ্রীতির সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সারা দুনিয়াই তার বিচরণভূমি।

কিন্তু এও কম দুঃখজনক ব্যাপার নয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী আকাইদ শাস্ত্রবিদদের এই কর্মপন্থার ফলে ইসলামী আকাইদ গ্রীক দর্শনের পরিভাষা,

বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমান এবং এই দর্শনের প্রবক্তাদের বক্তব্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। এখন সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গীতে ইসলামী আকীদার উপর বই-পুস্তক রচনা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তা অবশ্যই ইসলামী আকীদার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, অন্তরের অন্তস্থলে ইসলামী আকাইদের শিকড় তখনই মজবুত হতে পারে এবং উম্মাত তার ফল তখনই ভোগ করতে পারে, যখন এ ব্যাপারে ইসলামের অনুসৃত প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করা হবে এবং তাকে ইসলামের অনুসৃত পন্থায় উপস্থাপন করা হবে।

কী আশ্চর্যের ব্যাপার, ইলমে কালামের উপর যেসব মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে তা একনাগাড়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে গেলেও কোথাও কোন আয়াত অথবা হাদীস দেখা যাবে না। যদি কোথাও তার চেহারার সামান্যতম অংশও নযরে পড়ে তাহলে তা অন্ধকার রাতে জোনাকির আলো অথবা মরুভূমির সবুজের সাথে তুলনীয়।

সম্ভবত দর্শনশাস্ত্রের রুচিসম্পন্ন কিছু লোক এসব বইয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। এজন্য আমরা তাদের তিরস্কার করছি না। কিন্তু একে কিভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, ইসলামী আকাইদকে তার মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে অথবা তার মূল ভিত্তি থেকে পৃথক করে রাখা হবে ?

আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সঠিক পথ দেখান।

—আহযাব ঃ ৪

মুহাম্মাদ আল-গাযালী

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

	বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

১

আল্লাহ্

এই পূত পবিত্র নামটি সেই মহান সত্তার পরিচয় বহন করে যাঁর ওপর আমাদের রয়েছে অবিচল ঈমান। তিনিই আমাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছেই আবার ফিরে যেতে হবে।

কল্যাণময় প্রাচুর্যময় আল্লাহ্ তাআলাই যাবতীয় প্রশংসা ও সম্মানের উপযুক্ত। তাঁকেই সমীহ্ করতে হবে এবং তিনি ক্ষমা করার অধিকারী। আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করে শেষ করতে পারি না। তাঁর উপযুক্ত প্রশংসা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাঁর সম্মান ও পবিত্রতা বর্ণনা করার হক আদায় করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

ইতিহাসের সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষও যদি আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে কুফরী ও বিদ্রোহে লিপ্ত হয়— তাতে তাঁর মর্যাদা লেশমাত্রও হ্রাস পাবে না এবং তাঁর রাজত্বেও ঘাটতি দেখা দেবে না। তাঁর আলোক প্রভায় কোনরূপ পার্থক্য সূচিত হবে না। তাঁর শান-শওকত ও মহানত্বের ঔজ্জ্বল্য সমভাবে বিরাজিত থাকবে। তিনি মহা পবিত্র এবং সার্বিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি নিজ সত্তায় ও গুণাবলীতে সুমহান। তাঁর রাজত্ব এতই প্রশস্ত এবং তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে, কোন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের বোকামী অথবা কোন নাদান মূর্খের আহাম্মকী এর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারবে না।

এ যুগের মানুষ যদি আত্মপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, পার্থিব লালসায় ডুবে যায়, আখিরাতকে ভুলে যায় এবং নিজের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহলে

পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। সে আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ ۔ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّه يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۔

এমন কিছু লোক রয়েছে যারা না জেনে-শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেক উদ্ধত শয়তানের অনুসরণ করে। অথচ তার সম্পর্কে লেখা রয়েছে— যে ব্যক্তিই এটাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তাকেই সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের পথ দেখাবে। — সূরা হজ্জ ঃ ৩—৪

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তাআ'লার অস্তিত্বের ব্যাপারটা কোন জটিল বিষয় নয়। তা অনুধাবন করার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন নেই, এটা বোঝা কারো পক্ষে কষ্টকরও নয়। এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ব্যাপার। মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি তা সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং তার স্বভাবই তাকে এ সম্পর্কে পথ দেখায়।

কখনো এরূপও হয়ে থাকে যে, তীক্ষ্ণ আলোকচ্ছটা দর্শনের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আবার কখনো এরূপও হয় যে, কোন জিনিস আমাদের খুবই কাছে কিন্তু চোখ তা দেখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। যদি এমনটি না হত তাহলে কোন মুমিন অথবা নাস্তিকের পক্ষে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হত না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

আল্লাহ্ সম্পর্কে সন্দেহ ? অথচ তিনিই আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। —সূরা ইবরাহীম ঃ ১০

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁরা সবাই আল্লাহ তাআলার উলুহিয়াত সম্পর্কে মানব জাতির চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি করার জন্যই এসেছেন। কেননা মানুষ যদিও স্বভাবগতভাবেই আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় লাভ করতে পারে কিন্তু তারা এ পথে অগ্রসর হয়ে ভুলবশত শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তাদের বুদ্ধি-বিবেক তাঁর সম্পর্কে যথাযথ ও নির্ভুল ধারণা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

মহামহিম আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

هٰذَا بَلٰغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ․

বস্তুত এটা মানব জাতির জন্য একটি পয়গাম। এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হবে। তারা জেনে নেবে যে, উপাস্য কেবল একজনই। বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবে।

—সূরা ইবরাহীম ঃ ৫২

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ․

অতএব হে নবী! তুমি ভালভাবে জেনে নাও— আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদত পাবার উপযুক্ত আর কেউ নেই। তোমার নিজের অপরাধের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

—সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯

জঘন্য পরিবেশ মানব প্রকৃতির পক্ষে অত্যন্ত আশংকাজনক। এটা তার প্রকৃতিকে কদাকার ও নিঃশেষ করে দেয়। পঙ্কিল পরিবেশ তার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে এমন সব রোগের জন্ম দেয় যা তার অনুভূতির পবিত্রতা এবং রুচিবোধের সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। সে তখন নর্দমার পানি পান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ঝর্ণার স্বচ্ছ পানি প্রত্যাখ্যান করে। ডালিম ও আঙুরের পরিবর্তে তিতা ফল পছন্দ করে।

নিগূঢ় কথা হচ্ছে— একদল মানুষ ঈমান ও সংশোধনের পথ পরিহার করে কুফর ও শিরকের পথ বেছে নেয়। অথচ শিরক এমন এক জিনিস যার কোন বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা দার্শনিক ভিত্তি নেই। মানব প্রকৃতির সাথে এর কোন সম্পর্কেও নেই। হাদীসে কুদসীতে রাসূল (সঃ)-এর ভাষায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ فَاَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحْلَلْتُ لَهُمْ .

> আমি আমার বান্দাদের সবাইকে তৌহীদের প্রতি একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তানের দল এসে তাদেরকে দীনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর আমি তাদের জন্য যেসব জিনিস হালাল করেছি, এরা সেগুলো তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করে।
>
> —মুসলিম ঃ কিতাবুল জান্নাত

যে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সারা দুনিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে, তার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কঠিন প্রবণতা রয়েছে। তা দুনিয়ার সমস্ত ধর্মকেই ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এই সমাজে যদি আল্লাহ্‌র কোন স্থান থেকে থাকে তবে তা এমন অবস্থায় যে, ধর্ম একটা কল্পনার গুটি অথবা আফিমের গুটি, যা তাঁর নাম উচ্চারণকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এতে সন্দেহ নেই যে, আজকের বিশ্বে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তা আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্বেরই পরিণাম। আল্লাহ্‌র দীন যে মহান মূল্যবোধ নিয়ে এসেছিল, দুনিয়ার মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই মূল্যবোধগুলো কি ? সত্য-ন্যায়-ইনসাফ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মনের ঐশ্বর্য। আজকের বিশ্ব যখন পুনরায় এই মূল্যবোধের দিকে ফিরে আসবে তখনই দুনিয়ার মানুষ এই নৈরাজ্য ও দেউলিয়াত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। আর পার্থিব জগৎ তার প্রকৃতিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য এই মূল্যবোধের দিকে অবশ্যই ফিরে আসবে। যেমন

শিশু তার মায়ের পেট থেকে নিজেই নিজের পথ তৈরি করে বেরিয়ে আসে অথবা পাখির ছানা যেভাবে ডিমের খোসা থেকে বেরিয়ে আসে। দুনিয়া যেদিন এই প্রকৃতিগত পথের সন্ধান পেয়ে যাবে তখন সে সরাসরি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। কেননা ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ফিতরাতের ধর্ম। এর সপক্ষে এখানে কিছু দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাতে অলস মস্তিষ্ক ব্যক্তির চিন্তা-দর্শনের বন্ধ জানালাও খুলে যেতে পারে। সে এই জানালার ফাঁক দিয়ে মহাসত্যের উজ্জ্বল আলোকপ্রভা অবলোকন করতে সক্ষম হবে।

এক মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা নয়। সে তার সন্তানদেরও সৃষ্টি করেনি। সে যে পৃথিবীর বুকে পদচারণা করছে তাও তার সৃষ্টি নয়। সে যে বিশাল আসমানের শামিয়ানার নিচে বসবাস করছে তাও সে সৃষ্টি করেনি। যুগে যুগে যেসব স্বৈরাচারী নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দাপটে আল্লাহ্ হওয়ার দাবি করেছে, তারাও এসব কিছুর স্রষ্টা হওয়ার দাবি করার সাহস করেনি। অতএব একথা অকাট্যভাবেই বলা যায়, কোন মানুষই তার নিজের স্রষ্টা নয় এবং সে নিজেকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেনি! আর কোন জীব-জন্তু ও জড় পদার্থের পক্ষে নিজ নিজকে সৃষ্টি করার কোন প্রশ্নই আসে না। অনুরূপভাবে এটাও চূড়ান্ত কথা যে, কোন জিনিসই স্বয়ং সৃষ্টি হতে পারেনি। অতএব আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই বাকি রইল না। কুরআন আমাদের সামনে এই দলিল পেশ করেছে ঃ

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۔ أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۔

এরা কি কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজেরাই অস্তিত্ব লাভ করেছি ? অথবা এরা নিজেরাই কি নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ? অথবা পৃথিবী ও আকাশসমূহ কি এরাই সৃষ্টি করেছে ? বরং এরা কোন কথায়ই দৃঢ় প্রত্যয়ী নয়।

—সূরা তূর ঃ ৩৫-৩৬

অনুরূপভাবে আরবরা যে সাদামাটা পরিবেশে বসবাস করত, তার মধ্যে সৃষ্টির যে সৌন্দর্য বিরাজিত ছিল, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে ঃ

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ .

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

> এরা কি উটগুলোকে দেখতে পায় না—কেমন করে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, এরা কি আকাশমণ্ডল দেখে না—কিভাবে তা সমুন্নত করা হয়েছে ? এরা কি পর্বতমালা দেখে না— কিভাবে তা মজবুতভাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে ? এরা কি ভূ-পৃষ্ঠ দেখে না—কিভাবে তা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ? —সূরা গাশিয়া ঃ ১৭—২০

দুই কোন ব্যক্তি একটি বাড়িতে প্রবেশ করে এর মধ্যে একটি খাবার ঘর *(Dining Room)*, একটি শোয়ার ঘর *(Bed Room)*, একটি মেহমান খানা *(Drawing Room)* এবং একটি গোসলখানা *(Bath Room)* দেখতে পেল। এর প্রতিটি কক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জিনিস নিজ নিজ স্থানে সুবিন্যস্ত অবস্থায় প্রস্তুত রয়েছে। সে এসব দেখে অবশ্যই মন্তব্য করবে— সরাসরি এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগুলো অস্তিত্ব লাভ করেনি। অবশ্যই এই আরামদায়ক ঘর কোন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছে। কোন মিস্ত্রি তা তৈরি করেছে এবং একজন অভিজ্ঞ লোকের তত্ত্বাবধানে তা তৈরি হয়েছে। সে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই তা তৈরি করিয়েছে।

এই মহাবিশ্ব এবং এর বিশালতা, জড় পদার্থ এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাকারীর সামনে এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, এগুলো সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল নিয়ম-কানুনের অধীন। এসব নিয়ম-কানুনের কিছু কিছু পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে মানব জাতির সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। মানুষও জগৎ থেকে সীমাহীন উপকার লাভ করছে। মহাবিশ্বের গোপন রহস্যের যতটুকু এ পর্যন্ত মানুষের সামনে

প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তার যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ মূলোৎপাটিত হয়ে যায়। সে আর কখনো বলতে প্রস্তুত হবে না যে, এক দুর্ঘটনার ফলেই এই জীবন ও জগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটা মোটেই দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি নয়। একটি পরমাণুর মধ্যে যে সূক্ষ্ম ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা কার্যকর রয়েছে সেই একই ব্যবস্থাপনা আসমান, এর অগণিত তারকারাজি এবং সীমাহীন বিশালতার মধ্যেও কার্যকর রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۔ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۔

মহান কল্যাণময় সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলে বুর্জসমূহ স্থাপন করেছেন এবং তাতে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকমণ্ডিত চাঁদ সংস্থাপন করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চায়— তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। —সূরা ফুরকান ঃ ৬১—৬২

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۔

তিনিই তো আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত বানিয়েছেন—যেন তাঁর নির্দেশে এর বুকে নৌকা জাহাজ চলাচল করতে পারে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করতে পার এবং আশা করা যায় তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি আসমান ও যমীনের যাবতীয় জিনিস তোমাদের জন্য অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সব কিছুই

তাঁর নিজের কাছ থেকে। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। —সূরা ঃ জাসিয়া ঃ ১২—১৩

কুরআন শরীফে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে।

তিন তোমরা কি এই দ্রুতগতিসম্পন্ন তারকাগুলোর দিকে লক্ষ্য করেছ, যেগুলো এ বিশাল মহাশূন্যের মাঝে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে ? শুধু কি তাই ? এগুলো সব সময় সমান গতিতে আবর্তন করছে। তার গতিমাত্রায় কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। উপরন্তু এগুলো প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়। কখনো নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে দেখা যায় না।

খেলার মাঠে খেলোয়াড় যখন বলকে লাথি মারে তা দ্রুত উপরের দিকে উঠতে থাকে। পুনরায় তা নাচতে নাচতে চলে আসে। কিন্তু এই বিশাল আকারের তারকা-নক্ষত্রগুলো যার মধ্যে রয়েছে গতি, নীরবতা, আলো, অন্ধকার— তা মহাশূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তা কখনো তো নিচে পড়ে যায় না ? অবিরত ঘূর্ণায়মান, কখনো কোথাও থামছে না। তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে এক বিন্দুও দূরে সরে যায় না। অথচ যমীনের বুকে বিচরণকারী মানুষ চাই তারা পায়ে হেঁটে চলুক অথবা যানবাহনে চলুক— একের সাথে অপরের সংঘর্ষ লেগে যায়। অথচ তাদের বুদ্ধি-বিবেক রয়েছে, দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। কিন্তু এই যে গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারা মহাশূন্য পরিপূর্ণ হয়ে আছে— এদের মধ্যে তো কখনো সংঘর্ষ বাধে না বা এরা তো কখনো বিপথগামী হয় না। অথচ এদেরকে তো মানুষের মত বুদ্ধি-বিবেক দেওয়া হয়নি। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۔ لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۔

আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর চাঁদের জন্যও আমরা কতগুলো মঞ্জিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তা এই নির্দিষ্ট কক্ষপথসমূহে পরিভ্রমণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত খেজুর গাছের শুকনো শাখার মত হয়ে যায়। চাঁদকে ধরে ফেলার ক্ষমতা সূর্যের নেই, আর রাতও দিনকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে যেতে পারে না। সবকিছুই মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে। —সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮—৪০

কে এই বিশাল ও সীমাহীন রাজ্যের কর্ণধার ? কোন্ সে মহান সত্তা এই সুশৃঙ্খল ও অত্যাশ্চর্য নিয়মের তত্ত্বাবধান করছেন ? কে এই বিশাল আয়তনের গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আর কার নির্দেশেইবা এগুলো দ্রুতগতিতে মহাশূন্য পরিক্রম করছে ? নিঃসন্দেহে এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা মহান আল্লাহ্র অসীম কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ। এই সব গ্রহ-নক্ষত্র তাঁর দেওয়া বাহুর সাহায্যেই উড়ে বেড়াচ্ছে। মহান স্রষ্টার বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۰

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই আসমান-যমীনকে ধারণ করে আছেন। তাই এগুলো স্থানচ্যুত হতে পারছে না। যদি এগুলো স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে এগুলোকে ধরে রাখার সাধ্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল।

—সূরা ফাতির ঃ ৪১

এখন বাকি থাকল আকর্ষণ-বিকর্ষণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান! বিজ্ঞান এর যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে তা অস্পষ্ট। জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের সাথে এই ব্যাখ্যার কোন সম্পর্ক নেই ; নিঃসন্দেহে এই বিধান প্রকৃতির এক বিরাট নিদর্শন যা মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু এই কানে খাটো লোকদের একথা কে শুনাবে!

চার একথা নিঃসন্দেহ যে, আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব লাভের একটি সূচনাবিন্দু রয়েছে। তা আমরা সবাই জানি। আমরা জন্মের পূর্বে কিছুই ছিলাম না। আমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমরা কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলাম না। মহান স্রষ্টার বাণী ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـئًا مَّذْكُـوْرًا ۔

মানুষের ওপর কি সীমাহীন কালের একটা সময় এমনও অতিবাহিত হয়েছে—যখন তারা উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না ?

—সূরা দাহর ঃ ১

আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি তার উপাদানগুলোরও এই একই অবস্থা। এরও একটি সূচনাকাল রয়েছে। ভূ-তত্ত্ববিদগণ *(Geologist)* এগুলোর একটি অনুমিত সূচনাকাল নির্ধারণ করে থাকেন। সে সময়টা যত দীর্ঘই হোক না কেন, এর পূর্বে ঐ উপাদানের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

পূর্বে ধারণা করা হত জড় পদার্থের কোন ক্ষয় নেই। এর ভিত্তিতে একদল লোক দাবি করে বসল— এই দুনিয়া চিরস্থায়ী। অতঃপর এই অনুমিত ধারণার ওপর তারা অনেক ভিত্তিহীন কথার ইমারত গড়েছে। কিন্তু অণুর বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে কল্পনার এই প্রাসাদ ধ্বসে পড়েছে। যদি অণুর বিস্ফোরণ নাও হত তাহলেও আমরা এই কাল্পনিক দাবি সমর্থন করতাম না। কেননা মহাবিশ্বের ধ্বংস যে দরজা দিয়ে আসবে তার চাবি আল্লাহ্ তাআলা কখনো বিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না।

যে জিনিস পৃথিবীর উপাদানগুলো ধ্বংস হওয়ার কারণ হবে— লোকেরা যদি তা চিনতে না পারে বা আবিষ্কার করতে না পারে তবে তার অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর উপাদানসমূহ কখনো ধ্বংস হতে পারে না। এও তো হতে পারে যে, মহাবিশ্বের নিরাপত্তার খাতিরে মহান আল্লাহ্ এর ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দিয়েছেন। কেননা এই ধ্বংসাত্মক অস্ত্র মানুষের হাতে পড়ে গেলে তারা নিজের হাতেই আত্মহত্যা করে বসবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অভিনব। কেননা আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতি আমাদেরকে এই হিদায়াতই দান করে। যে

জিনিসের পূর্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না, তা সরাসরি এবং স্বয়ং অস্তিত্ব লাভ করতে পারে— এ ধরনের বক্তব্য বুদ্ধি-বিবেকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কোন একটি নতুন জিনিস তৈরি হল। কিন্তু জানা গেল না যে, এর প্রস্তুতকারক কে ?—এক্ষেত্রে বলা হয় যে, এর প্রস্তুতকারক অজ্ঞাত। কেউ একথা বলে না যে, এর কোন প্রস্তুতকারক নেই। তাহলে বলা যায়, এই মহাবিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই—একথা কেমন করে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে দাবি করা যেতে পারে ? আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, পরে আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি। পরিশেষে কে আমাদেরকে এই অস্তিত্ব দান করল ?

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ٠

বলে দাও— আল্লাহ! অতঃপর তাদেরকে তাদের যুক্তিবাদের খেলায় মত্ত হওয়ার জন্য ছেড়ে দাও। — সূরা আনআম ঃ ৯১

মহাবিশ্বের সৃষ্টি কি আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল

আমাদের জীবন ও দেহের ক্রমোন্নতি এবং এর স্থিতি এমন সব জটিল নিয়ম-কানুনের ওপর নির্ভরশীল, যেগুলো আকস্মিকভাবে হয়ে যাওয়াটা বুদ্ধি-বিবেকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন সূর্যের সম্মুখভাগে পৃথিবী নামক এই গ্রহের অবস্থান ...এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে অবস্থান। যদি এই দূরত্ব কম হয়ে যায় এবং পৃথিবী সূর্যের কিছুটা কাছে এসে যায় তাহলে জীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদি সমস্ত জীবন্ত প্রাণী জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। যমীনের বুকে কোন কিছুই আর বেঁচে থাকত না।

পক্ষান্তরে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানের দূরত্ব যদি নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যেত তাহলে সমস্ত পৃথিবী বরফে ঢেকে যেত। কোথাও সবুজ শ্যামলতা এবং জীবন বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকত না। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে ঠিক এতটুকু দূরত্ব বজায় রয়েছে যে, তার ফলে প্রয়োজন মাফিক গরমও লাভ করা যাচ্ছে, আলোও পাওয়া যাচ্ছে এবং কোন ক্ষতিও হচ্ছে না। তোমাদের কি মত, এটা কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে গেছে, না কোন দুর্ঘটনার ফল ?

তারপর চাঁদের যে এই হ্রাস-বৃদ্ধি! এটা কি সম্ভব ছিল না যে, চাঁদ পৃথিবীর আরো কাছে এসে সাতসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাকে আকর্ষণ করে সমগ্র ভূভাগ পানিতে ভাসিয়ে দেবে ? পানি যখন সরে যাবে তখন দেখা যাবে জীবজন্তু আর প্রাণী বলতে কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাহলে কোন সে মহাবিজ্ঞানী চাঁদকে একটা উপযুক্ত পরিমাণ দূরত্বে স্থাপন করেছেন, ফলে তা থেকে আলোও পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কোন ক্ষতিও হচ্ছে না ?

আমরা এই যমীনের বুকে অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করি। অক্সিজেন ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকাটা মোটেই সম্ভব নয়। আহার গ্রহণ করার ফলে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে যে কার্বনের সৃষ্টি হচ্ছে আমরা নিশ্বাস ছাড়ার মাধ্যমে তা বাইরে বের করে দেই।

অসংখ্য জীব-জন্তুর শ্বাস গ্রহণ করার ফলে বাতাসের এই মহামূল্যবান উপাদানটি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। অহরহ আমাদের অক্সিজেন গ্রহণ করার ফলে কখনো বাতাসে এই অমূল্য উপাদানটির ঘাটতি দেখা দেবে না।

কুদ্‌রাতের কি অসীম লীলা! গাছপালা-তরুলতা মানুষের জন্য ক্ষতিকর কার্বনগুলো শোষণ করে ফেলে এবং তাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নির্গত করে। এই আশ্চর্যজনক বিনিময়ের ফলে বাতাসের এই আচ্ছাদনের মধ্যে ভারসাম্য বিরাজ করছে। বাতাসের এই মনোরম পরিবেশে গাছপালা ও জীবজন্তুগুলো বেঁচে রয়েছে। তুমি কি মনে কর এই সুসমঞ্জস পরিবেশ আপনা-আপনিই তৈরি হয়েছে ?

কখনো কখনো এরূপও হয় যে, আমি একটি ফুল দেখছি। ফুলটিতে দশটি রঙের নিপুণ শিল্পকর্ম খচিত হয়েছে। আমার অগোচরেই ফুলটিকে আমার হাত স্পর্শ করল। অথচ হাজারো ফুল সেই বাগানে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আমি আমার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করলাম—কোন্ শিল্পীর কলম এই রঙগুলোর মধ্যে এত সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ? একটিমাত্র রঙ নয় ; বরং অসংখ্য রঙের মাঝে এক চিত্তাকর্ষক ও যাদুকরী সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। কোন কোন জায়গায় হালকা রঙ আবার কোন কোন জায়গায় রয়েছে গাঢ় রঙের প্রলেপ। কোথাও রয়েছে ডোরাকাটা আবার কোন জায়গায় রয়েছে আঁকাবাঁকা রেখাচিহ্ন।

পুনরায় আমি আমার দৃষ্টি নিচের দিকে একেবারে ধূলো মাটির ওপর নামিয়ে নিলাম। এই মাটি থেকেই তো এই রঙের ছড়াছড়ি! সত্যিই কি এটা মাটির রঙ-বেরঙের খেলা ? রঙের এই বিচ্ছুরণ কি এই মাটিরই চমৎকারিত্ব ? তাহলে মাটির মধ্যে এসব রঙ কোথায় লুকিয়ে আছে ? এটাও কি তাহলে একটা দুর্ঘটনার ফল, না দুর্ঘটনার তেলেছমাতি কারবার ? পরিশেষে এটা কি ধরনের দুর্ঘটনা ? যে ব্যক্তি এই দুর্ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু চিন্তা করে সে বড়ই বোকা এবং স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন....। ফুলের এই রঙের খেলা কুদরাতের এক সামান্য প্রকাশ মাত্র। অন্যথায় এই ঘটনাবহুল জীবনের সাথে এই নগণ্য একটি ফুলের কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে ?

মহাশূন্যের মাঝে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি গ্রহের বুকে জীবনের এই ঢেউখেলা একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার দাবি রেখে। আমরা যদি ধারণা করে বসি যে, কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়াই ক্ষুদ্র একটি পোকার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং এর পরিপাক যন্ত্র ও সূক্ষ্ম কোষগুলো সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে এটা হবে অবিবেচনাসুলভ এবং গায়ের জোরের কথা। তুমি কি মনে কর, এই সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী মানুষ কি নিজে নিজেই স্বয়ং সৃষ্টি হতে পেরেছে ? তুমি কি বলতে পার, এই বিশাল পৃথিবী স্বয়ং সৃষ্টি হয়ে গেছে ?

আমার কাছে এটা কিভাবে আশা করা যেতে পারে যে, আমি যখন উত্তমরূপে সেলাই করা একটি কাপড় দেখতে পাই তখন ধরে নেব যে, সুঁই-এর নাকের মধ্যে সুতাটি আপনা-আপনিই ঢুকে যেতে পেরেছে ? অতঃপর তা কাপড় সেলাই করে চলছে এবং নিজের শক্তিবল ওপরে নিচে উঠানামা করছে ? সেলাই মেশিনটি নিজ প্রচেষ্টায় জামার বুক, হাতা, কলার, আচল তৈরি করে ফেলেছে ? অবশেষে এটা আমাদেরকে একটি সুন্দর জামা উপহার দিয়েছে ? মেশিনের পিছনে একজন কারিগরের নিখুঁত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া কি একাজ সম্ভব ?

এসব কিছুকে দুর্ঘটনার ফল বলে চালিয়ে দেওয়া বিজ্ঞানের একটি বড় ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন সুষ্ঠু বুদ্ধিসম্পন্ন হুঁশিয়ার লোক একথা কখনো মেনে নিতে পারে না।

ধরা যাক, কোন অফিসে একটি টাইপরাইটার মেশিন রয়েছে। এর কাছেই কাগজের একটি পাতা রয়েছে। এর উপর উমর عمر নামটি লেখা রয়েছে। এর তাৎপর্য কি ? দুটো জিনিস হতে পারে। এর মধ্যে বিবেকের কাছাকাছি কথা হচ্ছে— কোন সাঁটলিপিকার এই নামটা কাগজে মুদ্রণ করেছে। দ্বিতীয়ত বলা যেতে পারে যে, এই নামের মধ্যকার অক্ষরগুলো আপনা-আপনি কাগজের ওপর ক্রমানুযায়ী মুদ্রিত হয়ে গেছে। যদি এই শেষোক্ত কথা মেনে নেওয়া হয় তাহলে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর যে ব্যাখ্যা হতে পারে তা হচ্ছে ঃ অচেতন অবস্থায় উদ্দেশ্যহীনভাবে আপনা-আপনি কাগজের ওপর আইন ع অক্ষরটি মুদ্রিত হওয়া এবং অন্যান্য অক্ষর বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ২৮ বারের অধিক নয়। কেননা আরবী বর্ণমালায় মোট ২৮টি অক্ষর রয়েছে।

আইন এবং মীম অক্ষর দুটি একসাথে মুদ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, $\frac{১}{২৮ \times ২৮}$ বার। যদি তিনটি অক্ষর সম্পর্কেই ধরে নেওয়া হয় যে, এগুলো নিজে নিজেই মুদ্রিত হয়েছে, তাহলে এর সম্ভাবনা রয়েছে $\frac{১}{২৮ \times ২৮ \times ২৮}$ বার। অন্যান্য অক্ষরের মধ্যে এর সম্ভাবনা রয়েছে $\frac{১}{২১৯৫২}$ বার। যে ব্যক্তি একটি যুক্তিসঙ্গত ও সুনিশ্চিত কাঠামো পরিত্যাগ করে এমন একটি কাঠামো অনুমান করে নেয়, যা বিশ হাজার বারে মাত্র একবার ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে— চিন্তার জগতে তার মত অবিবেকী এবং স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন আর কেউ নেই। অথৈ সমুদ্রের এক ফোঁটা পানি অথবা সুবিশাল মরুভূমির একটি বালুকণা ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার চাইতে কাগজের ওপর একটি নাম লিখিত হয়ে যাওয়া অধিক যুক্তিসংগত। নাস্তিক্যবাদীদের এই কল্পনার সাথে বুদ্ধি-বিবেকের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে প্রভুত্বের ধারণা

প্রতিটি জিনিসের স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ্‌ আআলার পরিচয় বর্তমান রয়েছে। প্রতিটি ভাষায় এই প্রিয় নামটি সুপরিচিত। ভাষাগত এবং জাতিগত পার্থক্য এর চিরন্তন সত্তা সম্পর্কে চিন্তার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেনি। এই মহান ও একক

সত্তা সম্পর্কে সব জাতির মধ্যেই আবহমানকাল থেকে একটা ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য মানুষ যখন ওহীর উৎস থেকে মহাবিশ্বের প্রতিপালক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে তখনই তার সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পেরেছে এবং তাদের চিন্তায় ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। তারা যখন নবীদের ভাষায় তাঁর পরিচয় জানতে পেরেছে তখনই তারা অলিক চিন্তা-ভাবনা, কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে পবিত্র থাকতে পেরেছে।

কিন্তু যেসব লোক পূর্ববর্তী নবীদের যুগ পায়নি অথবা যাদের কাছে কুরআনের পথনির্দেশ পৌছেনি তারাও নিজস্বভাবে আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা থেকে অল[illegible]কনি। তাদের বিবেক-বুদ্ধি সব সময়ই এ সম্পর্কে আলোচনা ও অনুসন্ধানের মনযিলসমূহ্ অতিক্রম করতে থাকে।

আল্লাহ্ সম্পর্কিত দর্শন এ ধরনের আলোচনায় পরিপূর্ণ। স্বয়ং এই বিশ শতকের শেষ ভাগের বিজ্ঞানীগণ বিশ্বপ্রকৃতি, এর রহস্য ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের পর আল্লাহ্ সম্পর্কে যে সত্য পর্যন্ত পৌছতে পেরেছেন তা তাঁরা অবিরতভাবে ব্যক্ত করছেন। প্রাচীন দর্শন আল্লাহ্ তাআলাকে বিশ্বস্রষ্টা, জ্ঞানের আদি উৎস, আবশ্যিক সত্তা, সমস্ত কারণের আদি কারণ ইত্যাদি নামের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে থাকে।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার মধ্যে হক-বাতিলের সংমিশ্রণ রয়েছে। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। এর কারণ হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ময়দানে নেমে পড়েছে— কিন্তু তার হাতে আসমানী পথনির্দেশের আলোকবর্তিকা নেই। অনুরূপভাবে বুদ্ধিবিবেক আল্লাহকে স্বীকার করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে— কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নিষ্কলুষ পর্যালোচনা ও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুসন্ধান সঠিক পথ ধরে অগ্রসর হলে তা মানুষকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এবং সামনে অগ্রসর করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের সামনে তার মাথা নত করে দেয়।

নির্বোধ লোকেরাই এরূপ ধারণা করতে পারে যে, ঈমান হচ্ছে বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার ফল। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও মানবীয় জ্ঞান যতই ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে ঈমানের ভিত্তিসমূহ ততই নড়বড়ে হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কও ততই দুর্বল হয়ে পড়ে। যেসব লোক এ ধরনের কথা বলে তারা নিজেদের জ্ঞানের দেউলিয়াত্ব, বুদ্ধির দৈন্যতা ও প্রতিভার অধঃপতনেরই ঘোষণা দেয়। এটা তাঁদের ভোঁতা ও স্থূল বুদ্ধির পরিচয় বহন করে।

অষ্টাদশ শতকের সুবিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়াম হারসল *(Sir William Hershel)*[১] বলেন ঃ "জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তৃত হচ্ছে— এক মহাবিজ্ঞানী, বিচক্ষণ ও সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার যুক্তি-প্রমাণের স্তূপ গড়ে উঠেছে। ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং অংকশাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ নিজেদের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এমন সব তথ্য উদঘাটন করেছেন, যা এমন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কায়েমের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের অধীনে কাজ করবে।"

প্লেটো তাঁর শিক্ষক সক্রেটিসের যে চিন্তাধারার উল্লেখ করেছেন তার ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ঃ "এই পৃথিবী আমাদের সামনে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করছে যে, তার কোন জিনিসই আকস্মিক দুর্ঘটনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এর প্রতিটি অংশ একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এই লক্ষ্য তার চেয়ে উচ্চতর লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে। এভাবে এই দুনিয়াও সামনে অগ্রসর হতে থাকবে। অবশেষে তা সেই সর্বশেষ লক্ষ্যে গিয়ে পৌছবে যিনি এক এবং অদ্বিতীয়।"

মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা কিভাবে স্থাপিত হয় ? এটাকে আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল বলে চালিয়ে দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যদি তাই হয়ে থাকে যে, এসব কিছু আপনা-

---

১. হারসেল নিজেই একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনিই ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন (১৭৮১)। টেলিসকোপও তিনিই আবিষ্কার করেন। তিনি সঙ্গীতেরও উস্তাদ ছিলেন। ১৭৩৮ থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত ছিল তাঁর যুগ।— অনুবাদক

আপনি হয়ে গেছে তাহলে এরূপ বলাতেও কোন দোষ নেই যে, নদীর বুকে ভাসমান নৌকার তক্তাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুনিয়ার উপায়-উপাদান এত অসংখ্য যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তা হিসাব করে শেষ করতে পারবে না। এর সবকিছুই আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে— এরূপ ধারণা করা যেতে পারে না। অতএব এক মহাজ্ঞানীর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তিনি হলেন সেই মহান ও একক কারিগর আল্লাহ্।

এই প্রকৃতির সর্বত্র সেই মহান ও একক কারিগরের নিদর্শন বিরাজ করছে। চিন্তা করার সাথে সাথে তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়ে যায়। এর মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার কোন অবকাশ নেই। "তিনি সর্বত্র বিরাজিত এবং বিজয়ী শক্তি হিসেবে ভাস্বর। অর্থাৎ তিনি সর্ববিষয়ে অবগত এবং সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাবান। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টান্ত সূর্যের মত যা সমস্ত দৃষ্টিশক্তিকে স্পর্শ করে। কিন্তু সূর্য নিজেকে দেখার অধিকার কাউকে দেয় না।"

—তারীখুত-তাসাওউফ, শায়খ মুহাম্মদ আলী আইনী বেগ

অনুরূপভাবে ল্যাপ্লেসও *(Laplace)*[২] মহাবিশ্বের গতি সম্পর্কিত দলিল প্রমাণগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। এতে তিনি দেখিয়েছেন— নাস্তিকের পক্ষ থেকে যেসব সন্দেহ সংশয় প্রকাশ কর হয়— এসব প্রমাণের মাধ্যমে তার ভিত্তিমূল কিভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তিনি বলেন ঃ

"সৌর জগতে যতগুলো গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে প্রকৃতির লুক্কায়িত মহাশক্তিমান সত্তা এর সবগুলোর আয়তন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এর কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি এগুলোকে ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে সহজ-সরল কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণ নিয়ম-কানুনের অনুগত করে দিয়েছেন। তিনি সূর্যের চারদিকে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। আবার এসব গ্রহের

২. ল্যাপ্লেস (Laplace. Pierre Simon, Marquis de) ফরাসী অংকশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অংকের অধ্যাপক ছিলেন। তার জীবনকাল ১৭৪৯—১৮২৭। —অনুবাদক

চারপাশে উপগ্রহগুলোর আবর্তনের জন্যও এক অতীব সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করেছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে কখনো কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না এবং যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হবে— এভাবেই এই ব্যবস্থাপনা চলতে থাকবে ......।"

এই সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা এমন সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবমতে চলছে যে, মানবীয় জ্ঞান তা বুঝতে অক্ষম। হাজারো, লাখো দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই নির্ভুল ব্যবস্থাপনা এভাবেই চলতে থাকবে। ল্যাপ্লেসের মতে, এটাকে কোনক্রমেই আকস্মিক দুর্ঘটনার চমৎকারিত্ব বলা যায় না। যদি কেউ এটাকে দুর্ঘটনার ফল বলতেই চায় তবে এর সম্ভাবনা চার ট্রিলিয়নে *(Trillion)* মাত্র একবার। চার ট্রিলিয়ন (৪,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০) কি সে সম্পর্কে তোমার কি কোন ধারণা আছে। এটা তো মাত্র দুটি শব্দের সমন্বয়ে একটি সংখ্যা। কিন্তু কেউ যদি তা গণনা করতে চায় তবে তার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তাকে পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে সারা দিন-রাত অবিরতভাবে গুণে যেতে হবে এবং প্রতি মিনিটে তাকে ১৫০টি সংখ্যা গণনা করতে হবে। অতঃপর সে চার ট্রিলিয়নে পৌঁছতে পারবে।

স্পেনসার *(Spencer)*[৩] বলেন, "আমরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই মহাবিশ্ব আমাদেরকে এমন এক মহাশক্তিমান সত্তার সন্ধান দেয় যাঁকে অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মগুলোই সর্বপ্রথম এই সর্বশক্তিমান সত্তাকে মেনে নেয় এবং মানব জাতিকে তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। কিন্তু প্রথম দিকে এই ধারণার সাথে অলিক কল্প-কাহিনী মিশ্রিত ছিল।" এই স্পেনসার কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন না।

মূলকথা হচ্ছে সুস্থ বুদ্ধি মহাসত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে যায়। অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হচ্ছে বুদ্ধি-বিবেকের একই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলিত হওয়া ততই সহজ হচ্ছে এবং এর সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উনিশ শতকের শেষভাগে এসে একদল বিজ্ঞানীর যখন বস্তুবাদের

---

৩. স্পেনসার (Spencer, Herbert, ১৮২০-১৯০৩) বৃটিশ দার্শনিক। তিনি মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের ওপর বই লেখেন। —অনুবাদক

পরাজয়ের সাথে সাক্ষাত হল তখন সমস্ত বিজ্ঞানী মহাসত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলিত হন। আজ প্রায় সব প্রখ্যাত বিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে একমত যে, যেসব প্রাকৃতিক বিধানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনের পরিপুষ্টি ও পরিবৃদ্ধি হচ্ছে তা সবই আমাদের বলে দিচ্ছে যে, এখানে এক মহা শক্তিশালী সত্তার ইচ্ছা, কৌশল, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা ক্রিয়াশীল রয়েছে। চিন্তাশীল সুষ্ঠু বুদ্ধি-বিবেকের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া মোটেই সম্ভব নয় যে, জীবনের সূচনা, এর স্থিতি এবং উন্নতি একটা অন্ধ দুর্ঘটনার ফল।

প্রখ্যাত ইরেজ বিজ্ঞানী কেলভিন *(Kelvin)*[৪] অকপটভাবে জনসমক্ষে এই সত্যের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন। যেসব লোক এই রহস্যময় জগতকে দুর্ঘটনার ফল মনে করে— তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়েছেন যে, মহাবিশ্বের সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মধ্যেই আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের অকাট্য প্রমাণ বিরাজ করছে। তিনি বলেন, "একজন স্রষ্টা ও পরিবেষ্টনকারীর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে এখানে জীবনের সূচনা ও এর টিকে থাকাটা কল্পনাও করা যায় না। আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, কতিপয় বিজ্ঞানী জীব সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই অকাট্য প্রমাণসমূহ স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে উপক্ষো করছেন। আমাদের চারপাশে হাজারো অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত রয়েছে যা এক মহাশক্তিশালী ও কুশলী ব্যবস্থাপকের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রকৃতির মাঝে বর্তমান এসব দলিল আমাদেরকে এক স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার সন্ধান দেয়। এই প্রমাণগুলো আমাদের বলে দিচ্ছে— প্রতিটি জীবই এক, অদ্বিতীয় এবং চিরস্থায়ী মহান স্রষ্টার সৃষ্টি।"

কেলভিনের পরে আসছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তিনি বলেন, "ধর্মীয় জ্ঞানের দাবি হচ্ছে সেই মহান সত্তা, যাঁর সম্পর্কে আমাদের জানার কোন উপায় নেই— তিনি নিশ্চিতই আপন সত্তায় বিরাজমান এবং তিনিই একমাত্র

---

৪. Kelvin William Thomson, Lord (১৮২৪—১৯০৭) প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী। — অনুবাদক

চিরন্তন সত্তা। তিনি তাঁর কর্মকৌশলের নির্দশনাবলী এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত আলোকমালার অন্তরালে সদা প্রতীয়মান। আমি এমন একজন সত্যপন্থী বিজ্ঞানীর কল্পনাও করতে পারি না যিনি একথা জানেন না যে, এই মহাবিশ্বের সুন্দর ও সুশৃঙ্খল নিয়ম-কানুন এমন নিপুণ কৌশলের ওপর ভিত্তিশীল যা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। যে জ্ঞানের সাথে ঈমানের যোগসূত্র নেই তা হচ্ছে একটি খোঁড়া লোকসদৃশ, যে পা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলে। আর যে ঈমানের সাথে জ্ঞানের যোগসূত্র নেই তা হচ্ছে একটি অন্ধ লোকসদৃশ, যে অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে অগ্রসর হয়।"

চিন্তা করে দেখুন! কুরআন পাকের এই ঘোষণা কত নির্ভুল এবং বাস্তবসম্মত ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ

প্রকৃত কথা হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানবান লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। —সূরা ফাতির ঃ ২৮

এমনও কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখে সত্য কিন্তু তারা অনেক ভুল ধারণার শিকার হয়ে যাচ্ছে। কামিল ফলাম্মারিয়ন *(Camille Flammarion)* তাঁর 'প্রকৃতির মাঝে আল্লাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আমরা যখন এই দৃশ্যমান জগত পেরিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে পা রাখি তখন আমরা দেখতে পাই মহান আল্লাহ হচ্ছেন এক চিরন্তন সত্তা, যিনি প্রতিটি জিনিসের মাঝে সদা বিরাজমান। তিনি কোন বাদশা নন যে, আসমানী জগতে অবস্থান করে রাজত্ব করছেন। তিনি এমনই এক রহস্যময় ব্যবস্থা যা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি পুণ্যবান মানুষ ও ফেরেশতাদের বেহেশতে বসবাস করেন না, বরং সত্য কথা এই যে, এই সীমাহীন মহাবিশ্বের একবিন্দু স্থানও তাঁর উপস্থিতি থেকে খালি নয়। অর্থাৎ তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশে এবং মহাকালের প্রতিটি মূহূর্তেই তিনি বর্তমান। অধিকতর সত্য কথা এই যে, তিনি হচ্ছেন চিরস্থায়ী ও অনন্ত সত্তা। তিনি স্থান ও কালের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।"

"আমরা এ বক্তব্য কোন আধিভৌতিক ধারণা বিশ্বাস নয়, যার সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। বরং এ হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য কথা যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় ভিত্তিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন গতি আপেক্ষিক হওয়া এবং প্রাকৃতিক বিধান আদিম ও চিরন্তন হওয়া। প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বকারী বিশ্বজনীন ব্যবস্থা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। হিকমত ও কৌশলের নিদর্শনসমূহ— যেমন ভোরের আলো এবং সকাল-সন্ধ্যায় দিকচক্রবালে উদ্ভাসিত লালিমা, বিশেষ করে প্রতিনিয়ত আবর্তন-বিবর্তনের নিয়ম-কানুনের মধ্যে যে ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে— তা সবই মহান আল্লাহ্র সার্বভৌম শক্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর অদৃশ্য হাতই এই মহাবিশ্বের সংরক্ষক। তিনিই এর প্রকৃত ব্যবস্থাপক। তিনিই সমস্ত প্রাকৃতিক বিধানের প্রাণকেন্দ্র। তিনিই প্রকৃতির এই নিদর্শনসমূহের উৎস।"

কামিল ফলাম্মারিয়ন একজন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক। তিনি ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইসলামের সাথেও তিনি মোটেই পরিচিত নন। কিন্তু তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং বিশ্বপ্রকৃতির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক ও অদ্বিতীয় মহান সত্তা আল্লাহকে চিনতে পেরেছেন। এ ধরনের অনেক লোকই পাওয়া যাবে। ইলাহ্ সম্পর্কে এই বিজ্ঞানীর যে মত ব্যক্ত হয়েছে তাতে সর্বেশ্বরবাদের (ওয়াহ্দাতুল অজুদ) দর্শন প্রকাশ পেয়েছে।

এটা এমন এক দর্শন, যা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। একদল প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকও এই সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের প্রবক্তা। এমনকি মুসলমানদের তাসাওউফ শাস্ত্রও এ ভ্রান্ত মতবাদ থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে তা সত্যের রাজপথ ও ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে।

এসব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের চিন্তাধারা যদি ওহীর শিক্ষা থেকে আলোক প্রাপ্ত হত এবং ইসলামী শরীআতের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হত, তাহলে কুরআন আল্লাহ্ তাআলার যে গুণাবলী ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছে— তাদের চিন্তাধারাও এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হত। এটাইবা কম কি— যদিও তারা সত্যের সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচিত হতে পারেননি তবুও তাঁদের নযরে হালকাভাবে হলেও যতটুকু সত্য ধরা পড়েছে তা তাঁরা অস্বীকার করেননি, বরং খোলা মনে অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁরা যে সত্যে উপনীত হতে পেরেছেন যদি তাঁরা তা বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে— যদি তাঁদের জন্য সত্যে

পৌঁছার যাবতীয় উপায়-উপকরণ সহজলভ্য হত, যদি তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণীর (ওহী) সাথে পরিচিত হতেন অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে প্রকৃত ইসলামের সাথে পরিচিত হতে পারতেন তাহলে তাঁরা পূর্ণ ঈমানদান হয়ে যেতেন।

এরই পাশাপাশি মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু যদিও ইলাহ্ সম্পর্কিত ধারণার পোষকতা করে, বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে এমন অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যা রাব্বুল আলামীনের দিকে পথ প্রদর্শন করে কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাসত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী এবং আল্লাহ্‌র সামনে অবনত হতে অনিচ্ছুক লোকদের থেকে ধরাপৃষ্ঠ কখনো খালি থাকেনি। আমরা এ ধরনের লোকদের যাবতীয় যুক্তি-প্রমাণের মূল্যায়ন করেছি। তাদের যুক্তির মধ্যে একগুঁয়েমি, হঠকারিতা ও বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই পাইনি।

অতীতের বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের অগ্রদূত ইউখানয বলেন, "মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্রের অস্তিত্ব, এর বিচরণ ও গতিশীলতাকে প্রকৃতির সহজ-সরল নিয়মের খেলা বলা যেতে পারে। এ অবস্থায় একজন শক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা করার কোন অবকাশ থাকে না।" তিনি আরো বলেন, "মানুষ জড় পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। চিন্তার জগতে তার কোন বিশেষত্ব নেই— অধ্যাত্মবাদীরা যার দাবি করে থাকে।" তিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করে বলেন, "যকৃৎ ও মূত্রাশয় থেকে এক প্রকার দৃশ্যমান পদার্থের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটা কিভাবে গড়ে উঠে তা আমাদের জানা নেই। অপরদিকে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে চিন্তার যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা আমাদের ইচ্ছা, সংকল্প ও অনুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর মস্তিষ্ক থেকে শক্তির বিকাশ ঘটে, বাহ্যিক পদার্থের নয়।"

উইলিয়াম ক্রুস বুদ্ধি ও আত্মার এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সমর্থন করে বলেন, "পরিপাক শক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা খাদ্যদ্রব্যকে যেভাবে মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রবহমান রক্তে পরিণত করে দেয়, অনুরূপভাবে স্নায়বিক ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে অনুভূতি, বোধশক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা জাগ্রত করে দেয়।"

একটি চিকিৎসা সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "চিন্তা হচ্ছে একটি যৌগিক। এটা ফরমিক এসিডের সাথে তুল্য। আর

চিন্তাশক্তি ফসফরাসের অধীন। বদান্যতা, সত্যবাদিতা, বীরত্ব প্রভৃতি মানব দেহের অভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

এই হচ্ছে মানবতা ও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র, যা জড়বাদীরা পেশ করে থাকেন। তারা নিজেদের এই যুক্তির মাধ্যমে অতিবস্তুর অস্বীকৃতি এবং মহামহিম আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছেন। আমরা যদিও লৌকিকতার খাতিরে এর নাম দিয়েছি যুক্তি, অন্যথায় এই হাস্যস্পদ ও কুশ্রী বক্তব্যের অন্তরালে সত্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি? সংশয়, সন্দেহ, অনুমান ও ধারণা-কল্পনাকে কখনো বিবেচনাযোগ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে একথা সর্বসম্মত যে, নাস্তি কখনো স্বেচ্ছায় অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং তা কোন কিছুকে অস্তিত্বে রূপদান করতেও সক্ষম নয় অর্থাৎ নাস্তি কখনো স্রষ্টা হতে পারে না।

অতএব যখন বলা হয় এই মহাবিশ্ব অস্তিত্বের জন্য এক মহান সত্তার মুখাপেক্ষী এবং এই সৃষ্টিকুলের অস্তিত্বের পেছনেও রয়েছে এক মহান স্রষ্টা— তখন বলা হয় না এ সব কিছুর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব।

যেকোন শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একদল পুলিশের প্রয়োজন। অন্যথায় সারা শহরে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে। তাহলে মহাশূন্যের মাঝে যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গ্রহ-উপগ্রহ অবিরত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে— এদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কি এক সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই?

"এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা একটি দুর্ঘটনা মাত্র"— এটা একটা হাস্যস্পদ কথা, নির্লজ্জের নির্বোধ উক্তি। "বদান্যতা, সুকৃতি, দুষ্কৃতি ইত্যাদি হচ্ছে দৈহিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক প্রবাহেরই ফল। কেননা তাদের মতে রূহ বা আত্মা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।" এটাও একটা বাজে কথা এবং উদ্ভট গালগল্প। কামিল ফলাম্মারিয়ন পরিহাস করে এর জবাবে বলছেন, "শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধির অর্থ কি? মস্তিষ্ক মাইল বা কিলোমিটারের মত বৃদ্ধি হয় না কেন?

ফিল্ড মার্শাল আহমদ ইজ্জাত পাশা বলেন, "রূহ ও বাকশক্তিসম্পন্ন সত্তা বলতে যদি কোন কিছুর অস্তিত্বই না থেকে থাকে তাহলে বুদ্ধি ও অনুভূতির আধার *(Brain)* যে জিনিসটা হৃদয়ঙ্গম করে— তার অনুভূতি কি করে হয়ে থাকে এবং কি করে হতে পারে না ? আর এই 'আমরা' শব্দেরই বা তাহলে অর্থ কি, যা তিনি (ইউখানয) ব্যবহার করে থাকেন ?"

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দার্শনিক তাঁর অজান্তে নিজের মুখ দিয়ে প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করে বসেছেন। একদিকে তিনি 'আমি'-কে অস্বীকার করছেন, অন্যদিকে তাকে এটা স্বীকারও করতে হচ্ছে।[৫]

এসব লোক আরো বলেন, "শক্তি বা অনুপ্রেরণা বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না।" তাহলে মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত এই শক্তি বা অনুপ্রেরণার জড় পদার্থটা কোথায় ? বাস্তব কথা হচ্ছে, যে জড়বাদ ও নাস্তিকতা এসব 'অতি বুদ্ধিমানদের' বেষ্টন করে রেখেছে— সত্য ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত

নিউইয়র্কের একটি সংবাদ সংস্থা 'কলেরিজ' নামে একটি বিখ্যাত সাময়িকী প্রকাশ করে থাকে। তারা এই পত্রিকার মাধ্যমে একদল প্রখ্যাত অণুবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী ও অংকশাস্ত্রবিদের কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন রাখেন। তাঁরা একবাক্যে জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁদের কাছে অনেক যুক্তি-প্রমাণ মওজুদ রয়েছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এই মহাবিশ্বের একজন মহান পরিচালক রয়েছেন। তিনি অপরিসীম দরদ ও অনুগ্রহ সহকারে অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের তত্ত্বাবধান করছেন।

ডকটর রয়েন *(Royen)* বলেন, গবেষণাগারে তার অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব দেহে একটি আত্মা অথবা আরো একটি দেহ রয়েছে, যা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না।

---

৫. অর্থাৎ, তিনি অবচেতনভাবে এখানে রূহ বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন। স্বয়ং তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে— এখানে এমন কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে যা মস্তিষ্কের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এ সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করছে। —গ্রন্থকার

অপর এক বিজ্ঞানী বলেছেন, "একথা সন্দেহাতীত যে, এক মহান সত্তার অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে— আসমানী ধর্মগুলো যাঁর নাম দিয়েছে 'আল্লাহ্'! তিনি আণবিক শক্তি, প্রাকৃতিক শক্তি ও মানব-বুদ্ধিকে হতভম্বকারী এই মহাবিশ্বের যাবতীয় শক্তির নিয়ামক।"

সংবাদ সংস্থার (রিপোর্টার) মাধ্যমে এই খবর সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'আল-মিসরী' নামক সাময়িকীও এই তথ্য প্রচার করে। অন্যদের মত আমারও তা পাঠ করার সুযোগ হয়েছিল। এই খবর পাঠ করে আমার দেহে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। কারণ যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীরা এই মহান সত্তার নিদর্শনসমূহ, আমি বলছি না তাঁরা চিনতে পেরেছেন, বরং স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা বস্তুবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আন্তরিক অনুভূতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে শুরু করেছেন।

তুমি কি জান নাস্তিকতা কি ? নিজেকে বেকুব বানানো, চিন্তার দরজায় তালা লাগানো, চারপাশ থেকে চক্ষু বন্ধ করে রাখা, ভিত্তিহীন কথা বলা, যুক্তি ও সুস্থ চিন্তার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

যখন কুরআন এল মানুষকে হাত ধরে সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথে টেনে নিয়ে এল। সে তাদেরকে কাঠিন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেনি। সে তাদের কাছে কিছুই দাবি করেনি, কেবল নিজেদের চোখ খুলে সুউচ্চ আকাশের দিকে, প্রশস্ত যমীনের বুকে এবং সৃষ্টি জগতের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহবান জানিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

তাদের বল, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা একটু চোখ খুলে দেখ। —সূরা ইউনূস ঃ ১০১

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۔

এসব লোক কি আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেনি ? আল্লাহ্ যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তারা কি দু'চোখ খুলে তা দেখতে পায়নি ? —সূরা আরাফ ঃ ১৮৫

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۔

তারা কি কখনো নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেনি ? আল্লাহ্ আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সবকিছুই সত্যতা সহকারে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। —সূরা রূম ঃ ৮

অতএব মানুষ যখন মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও জীবনের রহস্য উদঘাটনের জন্য নিজের সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন সামান্য অগ্রসর হতেই সে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় মহাসত্যের সন্ধান লাভ করে ফিরে আসে। সেই মহাসত্য সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াতে সংক্ষেপে অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۔ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ۔

আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের রক্ষক। আসমান-যমীনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁরই কাছে রক্ষিত। আর যারা আল্লাহ আয়াতসমূহ অমান্য করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (হে নবী! এই লোকদের) বলঃ হে জাহিল লোকেরা! তাহলে তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো ইবাদত করার কথা বলছ ?

—সূরা যুমার ঃ ৬২-৬৪

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের সমাজের একদল যুবক বিকৃত চিন্তার শিকার হয়ে নাস্তিক্যবাদের পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের কাছে জ্ঞানের শূন্য ঝুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা অনুমানে পথ চলে। জ্ঞানবান লোকদের কাছে তাদের এ ধারণা-অনুমানের কোন ওযন নেই। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে তারা যখন ইলাহ্, দীন, ওহী ইত্যাদি সম্পর্কে মুখ খোলে তখন তাদের

বক্তব্যের মধ্যে ধোঁকা, প্রতারণা ও অলিক দাবি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। তাদের বক্তব্যের ধরনটা নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لاَ هُدًى وَّلاَ كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۔ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔

> এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা কোনরূপ ইলম, হিদায়াত ও আলোক দানকারী কিতাব ছাড়াই মস্তক উদ্ধত করে আল্লাহ্র ব্যাপারে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত করাই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য। —সূরা হজ্জ ঃ ৮-৯

এই যেসব যুবক মনে করছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকেই পথ দেখায়— আমরা তাদের সামনে জীবন ও জগতের রহস্য সম্পর্কে তাদের মুরব্বীদের গবেষণালব্ধ তথ্য উপস্থাপন করছি।

অস্বীকার করার কারণ

ইমাম গাযালী (রহ) তাঁর 'ইহ্য়া উলুমিদ-দীন' গ্রন্থে বলেন, এই মহাবিশ্বের সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্বের সাথে সর্বপ্রথম পরিচিত হওয়াটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তার সম্পূর্ণ উল্টো। অতএব এর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা একান্ত জরুরী। আমরা প্রথমেই বলেছি, এ বিশ্বের সুস্পষ্ট এবং সমুজ্জ্বল বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব। তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে।

আমরা যখন দেখি, কোন ব্যক্তি কিছু লিখছে অথবা কিছু সেলাই করছে, এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, সে একটি জীবন্ত সত্তা। তার জীবন, তার অবস্থিতি, তার শক্তি-সামর্থ্য এবং তার সেলাই করার ইচ্ছা— এ সব আমাদের কাছে তার বাহ্যিক অথবা অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অধিক সুস্পষ্ট। কেননা তার ভিতরগত অবস্থা যেমন, রোগ-শোক, ক্রোধ, মেজাজ প্রকৃতি, কামনা-বাসনা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা খুব কমই অবহিত। আর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে কতগুলো সম্পর্কে আমরা অবহিত আর কতগুলো সম্পর্কে সংশয়ী। যেমন সে কতটা লম্বা, তার সারা শরীরের রং একই রকম না ভিন্ন রকম ইত্যাদি।

তার জীবন, তার শক্তি-সামর্থ্য, তার ইচ্ছা-সংকল্প, তার অভিজ্ঞতা এবং তার জীবন্ত থাকা ইত্যাদি ব্যাপার আমাদের কাছে পরিষ্কার, যদিও আমরা স্বচক্ষে তার জীবন, শক্তি-সামর্থ্য ও ইচ্ছা-সংকল্প দেখতে পাচ্ছি না। কেননা বৈশিষ্ট্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না। তার জীবন্ত থাকা, তার শক্তি-সামর্থ্য এবং তার ইচ্ছা সম্পর্কে আমরা তার সেলাইকর্ম থেকে অনুমান করতে পারি। তার সেলাইকর্মের ভিত্তিতে আমরা তার জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

অতএব আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কি বলতে পারে, যাঁর সপক্ষে রয়েছে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ ? যে সত্তার মহানত্ব সম্পর্কে প্রতিটি জিনিস সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে মানুষ কি বলবে ? আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর কুদরত, তাঁর জ্ঞান ও তাঁর যাবতীয় গুণের সপক্ষে প্রতিটি জিনিসই সাক্ষ্য দিচ্ছে, যা আমরা বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে সব সময় প্রত্যক্ষ করছি। এর কতগুলো আমরা বাহ্যিকভাবেই দেখতে পাচ্ছি। আর কতগুলো আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে অনুভব করছি।

যেসব জিনিস আমরা পর্যবেক্ষণ করছি, চাই তা ইট-পাথর গাছপালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, আসমান-যমীন, চাঁদ-সুরুজ, জলভাগ-স্থলভাগ, আগুন, বাতাস, দেহ-প্রাণ যাই হোক— তা সবই তাঁর গুণাবলীর সাক্ষ্য বহন-করছে। সর্বপ্রথমেই আমাদের দেহ-প্রাণ, আমাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য, আমাদের অবস্থার পরিবর্তন, আমাদের হৃদকম্পন এবং আমাদের গতি-স্থিতির সবই তাঁর মহান গুণের সাক্ষ্য বহন করছে।

আমাদের সামনে সবচেয়ে প্রামাণ্য জিনিস হচ্ছে আমাদের নিজেদের সত্তা, অতঃপর যেসব জিনিস আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করতে পারি, অতঃপর যেসব জিনিস সম্পর্কে আমরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি ও অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে জানতে পারি। এই বিশ্বে আমরা যেসব জিনিস দেখতে পাচ্ছি তাকে জানার একটিমাত্র উপায়ই আছে, তার সপক্ষে একটিমাত্র প্রমাণই আছে এবং তার অনুকূলে একমাত্র সাক্ষ্যই আছে। কিন্তু এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার অবস্থা এই যে, এর প্রতিটি জিনিস তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং তাঁর শক্তি ও দয়া-অনুগ্রহের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর সৃষ্টিজগতের অবস্থা এই যে, তার কোন সীমাসংখ্যা নেই।

অতএব লেখকের জীবন্ত থাকাটা যখন আমাদের সামনে পরিষ্কার, অথচ তার প্রমাণমাত্র একটি—তা তার হাতের গতিবিধি—যা আমরা অনুভব করতে পারি, তাহলে সেই মহান সত্তা আমাদের কাছে সুপরিচিত নন কোন্ দিক থেকে? অথচ মহাবিশ্বের প্রতিটি জিনিস তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে এবং তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও মহিমা ঘোষণা করছে।

আমাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু ঘোষণা করছে যে, তা স্বয়ং অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনি এবং তা নিজ নিজ শক্তিবলে নড়াচড়া করছে না। এর পেছনে রয়েছে এক মহান সত্তার কারিগরি। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন, আমাদের হাড়গোড় ও গোশতের বিন্যাস, আমাদের স্নায়বিক ব্যবস্থা, আমাদের চেতনা-অনুভূতি, আমাদের সৌন্দর্য এবং আমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য প্রতিটি অঙ্গই তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আমরা জানি যে, এই দৈহিক ব্যবস্থাপনা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেমন আমরা জানি যে, লেখকের হাত নিজে নিজে নড়াচড়া করছে না।

কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণের আধিক্যের কারণে সেই মহান সত্তার পরিচয় এতটা প্রতিভাত হয়ে আছে যে, জ্ঞান-বুদ্ধি বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েছে এবং তার পরিচয় লাভে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

ইমাম গাযালী (রহ) এই অক্ষমতা ও বিস্ময়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের জ্ঞান তাঁকে উপলব্ধি করতে গিয়ে যে অক্ষম হয়ে পড়ল তার দুটি কারণ রয়েছে।

এক—তাঁর সত্তার দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে থাকা। এ ব্যাপারটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজনে নেই।

দুই— তাঁর সীমাতিরিক্ত প্রকাশিত থাকা।

বাদুড় রাতের বেলা দেখতে পায়, দিনের বেলা দেখতে পায় না। কারণ এই নয় যে, দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন। বরং তার কারণ হচ্ছে দিন অত্যধিক পরিমাণে উজ্জ্বল। বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, দুর্বল। সূর্যের আলোক তার দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। তার দুর্বল দৃষ্টিশক্তির সাথে যখন সূর্যের প্রখর আলো এসে মিলিত হয়, তখন তা তার দৃষ্টিশক্তিকে অক্ষম করে দেয়। সে তখনই কিছু দেখতে পায় যখন অন্ধকারের সাথে সামান্য আলোও থাকে।

অনুরূপভাবে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত দুর্বল। আর সেই মহান পবিত্র সত্তার সৌন্দর্য অতি উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। তা প্রতিটি স্থানে ও প্রতিটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। আসমান-যমীনের এই রাজত্বের মধ্যে এমন কোন স্থান খালি নেই যেখানে তাঁর নূরের তাজাল্লী অনুপস্থিত। এভাবে তাঁর প্রতীয়মান হওয়াটা আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর সামনে অদৃশ্য থাকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে জিনিস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, কোথাও তার বৈপরীত্য নেই তা অনুধাবন করা কষ্টকর হয়ে থাকে।

বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু সব জিনিসই যদি একই প্রকৃতির হয়, তাহলে এর মধ্যে পার্থক্য করাটা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

সূর্যের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। যদি তা সব সময় সর্বত্র উদীয়মান থাকত তাহলে সূর্যকে অস্বীকার করার অনেক লোকই পাওয়া যেত। কিন্তু সূর্যের আলোকের অবস্থাটা তদ্রূপ নয়। আমরা জানি, তা একটি অস্থায়ী জিনিস, পৃথিবীর বুকে তা ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সূর্যাস্তের সাথে সাথে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। যদি সূর্য সব সময় উদীয়মান থাকত, কখনো অস্ত না যেত, তাহলে আমরা মনে করতাম— দেহের মধ্যে এই ধরনের রঙই হয়ে থাকে— সাদা কালো বা অন্য কোন রঙ। কালো রঙ-এর মধ্যে অন্ধকার এবং সাদা রংয়ের মধ্যে শুভ্রতা দেখা যায়।

আমরা আলোকে স্বতন্ত্রভাবে অনুভব করতে পারি না। কিন্তু যখন সূর্য অস্ত যায়, অন্ধকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন আমরা উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। আমরা তখন জানতে পারি আলোকের কারণে প্রতিটি জিনিস আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটা সাময়িক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল যা সূর্যাস্তের সাথে সাথে বিলীন হয়ে গেছে। আমরা আলোর অস্তিত্ব তা শেষ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই অনুভব করে থাকি। আলো যদি শেষ না হত তাহলে তা অনুভব করা আমাদের জন্য কষ্টকর হত। কেননা তখন আলো ও আঁধার আমাদের কাছে সমান হয়ে ধরা দিত। এর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হতাম না।

অনুভবযোগ্য জিনিসের মধ্যে আলো অধিক পরিমাণে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। আলোর সাহায্যে যাবতীয় অনুভব যোগ্য জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

আলো শুধু নিজেই পরিস্ফুট হয় না বরং অন্যান্য জিনিসকেও পরিস্ফুটিত করে তোলে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আলোর অবস্থা এই যে, যদি তার ওপর অন্ধকার ছেয়ে না যেত, তাহলে তা নিজের ঔজ্জ্বল্যের কারণেই অজ্ঞাত থেকে যেত।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বচরাচরের মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রতীয়মান হয়ে আছেন। গোটা সৃষ্টিজগৎ তাঁর অনুগ্রহেই প্রতিভাত হয়ে আছে। যদি তিনি কখনো অস্তিত্বহীন হয়ে যেতেন অথবা লুকিয়ে যেতেন, তাহলে আসমান-যমীনের এই গোটা ব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খল হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। খোদায়ী ব্যবস্থাপনা বিলীন হয়ে যেত। এ সময় স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যেত।

যদি এমন হত যে, কতগুলো জিনিস আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন আর কতগুলো জিনিস অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে, তাহলেও উভয়ের মাঝে পার্থক্য অনুভব করা যেত। কিন্তু গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নূরের তাজাল্লীই বিরাজমান। তিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। নিমেষের জন্যও তাঁর অস্তিত্ব বিলীন হতে পারে না।

সম্যকভাবে তাঁর বিদ্যমান থাকাটাই তাঁর গোপন থাকার কারণে পরিণত হয়েছে এবং অসংখ্য জ্ঞান তাঁকে অনুভব করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।"

অনাদিকাল থেকেই আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব বিরাজমান। তাঁর পূর্বে কারো অস্তিত্ব কখনো কল্পনা করা যায় না। তাঁর থেকেই সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর আগে থেকেই বর্তমান। কোন জিনিস সর্বপ্রথম অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা আমরা জানি না। কেননা আমরা জন্মলাভ করার পরই অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছি। উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলল, আপনার প্রভুর বংশ-তালিকা বর্ণনা করুন। তখন নাযিল হল ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

বল, আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেউ তাঁর ঔরসজাত নয় এবং তিনিও কারো ঔরসজাত নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

—সূরা ইখলাস ঃ ১-৪

অর্থাৎ যেকোন জিনিসই জন্মলাভ করে, তা অচিরেই মৃত্যুবরণ করবে। যে জিনিসই মৃত্যুমুখে পতিত হবে কেউ না কেউ তার উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার মৃত্যু নেই এবং তাঁর ওয়ারিশও নেই। তাঁর সমতুল্যও নেই এবং তাঁর বিকল্পও নেই। আল্লাহ্র সাথে তুলনীয় হতে পারে এমন কিছুই নেই।

মুশরিকরা আল্লাহ্ তাআলাকে নিজেদের স্থূল জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেছে। তারা তাঁর অস্তিত্বকে নিজেদের সীমিত জীবনের ওপর অনুমান করছে। এভাবে তারা ভ্রান্ত ধারণার শিকার হল যে, আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বেরও বুঝি একটা সূচনাবিন্দু আছে। কিন্তু তারা যেরূপ অনুমান করেছে আসল ব্যাপারটা তদ্রূপ নয়। নিঃসন্দেহে আমাদের জড়দেহের একটা সূচনাকাল রয়েছে। কেননা আমরা এটা অনুভব করতে পারি এবং নিঃসন্দেহে আমরা তা জানি। অবশ্য আল্লাহ্র অস্তিত্ব চিরন্তন, তাঁর সূচনাবিন্দু নেই।

কখনো কখনো আমাদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যে, শেষ পর্যন্ত এই অনন্তকাল কি ? এর গূঢ় রহস্য কি ? এটা কেমন জিনিস, যা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারে না ? এটা জ্ঞান ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য যে, তা যে জিনিস বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়ে তার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য অস্থির থাকে। এতে ঈমানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَئَلُوْهُ: اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهٖ . قَالَ اَوَجَدْتُمُوْهُ ؟ قَالُوْا نَعَمْ . قَالَ ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ .

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মনে এমন সব জিনিসের উদয় হয় যে, তা আমাদের যে কেউ মুখের ভাষায় প্রকাশ করাকে বিরাট অপরাধ মনে করে। তিনি বলেন ঃ এই তো হচ্ছে ঈমানের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।—মুসলিম

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ كَيْدَهُ الشَّيْطَانِ اِلَى الْوَسْوَسَةِ .

সেই মহান আল্লাহ্র শপথ, যিনি শয়তানের ষড়যন্ত্রকে কুমন্ত্রণার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। —আবু দাউদ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَنَا لَيَجِدُ فِيْ نَفْسِهٖ مَا لَاَنْ يَّحْتَرِقَ حَتّٰى يَصِيْرَ حُمَمَةً اَوْ يَخِرُّ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ ۔ قَالَ ذٰلِكَ مَحْضُ الْاِيْمَانِ ۔

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের কারো মনে এমন কথার উদয় হয় যে, তা মুখে আনার চেয়ে সে জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া অথবা আসমান থেকে যমীনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক ভাল মনে করে। নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ এতো পাক্কা ঈমানের আলামত।

জীবন, বিশ্বচরাচর ও মানব জাতির ইতিহাস শুরু হওয়ার পূর্বে নাস্তির একটা যুগ অতীত হয়েছে। এর সীমা-সংখ্যা কেউই জানে না। মানুষ তার সীমাবদ্ধ পরিসরে অবস্থান করে বর্তমান, নিকট অতীত অথবা নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় লাভ করতে পারে। তার এই লাভ করা বস্তুর মাধ্যমে কিছুটা জ্ঞান ও দাঁড় করাতে পারে কিন্তু তারপর তার দৃষ্টিশক্তি এক পর্যায়ে স্থির হয়ে যায়, তখন তার নড়াচড়া করারও শক্তি থাকে না এবং অবলোকন করারও শক্তি থাকে না। এই বাহ্যিক জগতেই যখন তার শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার এই করুণ অবস্থা, তখন অদৃশ্যমান জগতের ক্ষেত্রে তার বুদ্ধিবৃত্তির দৈন্যদশা এবং চিন্তার অকৃতকার্যতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অজড় জগতের ব্যাপারসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে সে একেবারেই অপারগ।

নৌকার আরোহী নৌকার ওপর চক্কর দিতে পারে, কিন্তু সে যদি নিজেকে সমুদ্রের অথৈ জলে নিক্ষেপ করে তাহলে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কম। আমাদের সীমিত শক্তির কারণে আমাদের জ্ঞানের অবস্থাও তাই যা আমাদের দৃষ্টিশক্তির অবস্থা। আমাদের দৃষ্টিশক্তিসমূহ দূর পর্যন্ত কিছু পড়তে সক্ষম। কিন্তু এই দূরত্বের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তাহলে তা একটি অক্ষরও চিনতে সক্ষম হবে না। এভাবে জ্ঞানেরও একটা সীমিত পরিসর আছে। এই পরিসরের সীমার মধ্যেই তা কোন কিছুর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম।

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۔

তোমাদেরকে জ্ঞানের খুব সামান্য অংশই দেওয়া হয়েছে। —সূরা ইসরা ঃ ৮৫

এজন্যই আমরা সেই মহান সত্তার অনাদি অনন্ত হওয়ার ওপর ঈমান রাখি। আমাদর দৃঢ় প্রত্যয় হচ্ছে তিনি অনন্তকাল থেকেই বিরাজমান। এ নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। অতএব একটি অভিনব সত্তার সাথেই কেবল শুরু ও শেষ কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু যিনি নিজস্ব সত্তায় চির বিরাজমান তাঁর সাথে শুরু ও শেষের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? তাঁর আগে অথবা পরে নাস্তির কল্পনা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

তিনিই অনন্ত

মহান আল্লাহ্ তাআলা চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব ও অবিলীয়মান। তাঁর কোন দেহ নেই, সুতরাং তাঁর মৃত্যুর প্রশ্নই অবান্তর। তিনি কোন জড় পদার্থও নন, অতএব তাঁর কোন অবচয়ও নেই এবং ক্ষয়ও নেই। তিনি চিরস্থায়ী ও সর্বব্যাপী। প্রতিটি জিনিস তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ ط لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ·

> তাঁর সত্তা ছাড়া আর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তাঁরই। তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। —সূরা কাসাস ঃ ৮৮

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفٰى بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا ·

> সেই আল্লাহ্র ওপরই ভরসা কর যিনি চিরঞ্জীব, কখনই মরবেন না। তাঁর হাম্দ সহকারে তাঁর তসবীহ্ করা। তাঁর বান্দাদের গুনাহ্ সম্পর্কে কেবল তাঁরই ওয়াকিফহাল হওয়া যথেষ্ট। —সূরা ফুরকান ঃ ৫৮

তিনি চিরস্থায়ী সত্তা, তাঁর কোন ধ্বংস নেই। তিনি তাঁর নেক বান্দাদের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ বেহেশতে চিরকালের জন্য স্থান দেবেন। আল্লাহ্র এই নিয়ামতের অর্থ এই নয় যে, কোন মানুষকেও চিরস্থায়ী বলা যাবে। আমরা যেমন পূর্বে বলেছি, মহান আল্লাহ্ অত্যাবশ্যকীয় সত্তা। তিনি কখনো এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর এই চির বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তিনি ছাড়া এ মহাবিশ্বে যত জিনিস রয়েছে, যদি তাঁর পক্ষ থেকে তা অস্তিত্ববান না করা হতো তাহলে কোথাও এর নামগন্ধ পাওয়া যেত না।

মহাবিশ্ব আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী

আমরা প্রতিনিয়ত দেখে আসছি যে, প্রকৌশলী ও রাজমিস্ত্রী আকাশচুম্বী দালান-কোঠা নির্মাণ করছে, অতঃপর তা থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নিচ্ছে অথবা মৃত্যুবরণ করছে, আর সেই ইমারত তারপরও দীর্ঘদিন ধরে কালের বুকে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এর দেওয়াল ও খুঁটিগুলো নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে থাকে। এই ইমারত নাস্তি থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি। রাজমিস্ত্রি কেবল ইটের সাথে ইট বসিয়ে তার কাজ শেষ করেছে। সে নতুন কিছু সৃষ্টি করেনি, বরং সৃষ্ট বস্তুর কাঠামোতে রদবদল করে এর উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে মাত্র। কিন্তু এই সীমাহীন বিশ্ব, আসমান এবং এর ছাদ, এই সমতল পৃথিবী এবং তার বুকে বসবাসকারী অসংখ্য সৃষ্টির অস্তিত্বের ব্যাপারটি কিন্তু ভিন্ন জিনিস যেগুলোকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের রূপ দেওয়া হয়েছে।

অতএব এ মহাবিশ্ব যেভাবে নিজের অস্তিত্বের জন্য তার প্রতিপালকের মুখাপেক্ষী, অনুরূপভাবে নিজের স্থায়িত্বের জন্যও তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এটা মুহূর্তকালেও টিকে থাকতে পারে না। আসমান ও যমীনে মাঝে এমন কোন জিনিস নেই, যা আপন সত্তায় বিরাজমান এবং কখনো তার মুখাপেক্ষী নয়। পক্ষান্তরে এই যে আমাদের সত্তা, আমাদের দেহ সৌষ্ঠব, এর মাঝে যে গতিশীল বস্তুটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যখন তার দাতা ইচ্ছা করবেন এটা বিলীন হয়ে যাবে—যেভাবে মানুষ চলে যাওয়ার সাথে সাথে তার ছায়া বিলীন হয়ে যায়।

সূর্যের অস্তিত্ব ছাড়া দিনের কল্পনা করা যায় না এবং আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছাড়া এই বিশ্ব জাহানের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى .

আর আল্লাহ্র জন্য সবচেয়ে উত্তম ও উন্নতগুণাবলী শোভনীয়।

—সূরা নহল ঃ ৬০

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللَّهِ ج وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ .

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ . وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزٍ .

হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তো ঐশ্বর্যময় এবং প্রশংসিত। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করে

নতুন কোন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন। এরূপ করা আল্লাহ্‌র জন্য কিছুমাত্র কঠিন নয়। —সূরা ফাতির ঃ ১৫, ১৬, ১৭

জ্ঞানের উৎস এবং তার মধ্যে সৃষ্ট চিন্তা-কল্পনা, অন্তর এবং তার মধ্যে উৎসারিত অনুভূতি, শিরা-উপশিরা এবং এর মধ্যে প্রবহমান রক্তধারা, শরীর এবং এর গতিশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এ সব কিছুই আল্লাহ্ তাআলার তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন বহন করে। এটা কোন একটি ক্ষুদ্র পল্লী অথবা একটি শহর অথবা একটি দেশের কথা নয়, বরং গোটা বিশ্বেরই এই অবস্থা। আজ থেকে নয়, বরং সৃষ্টির সূচনা থেকেই তাঁর তত্ত্বাবধান চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। আমাদের জানা অজানা সব কিছুই তাঁর দয়ায় অস্তিত্ববান এবং বিরাজমান। তিনি যদি মুহূর্তের জন্যও তাঁর তত্ত্বাবধান উঠিয়ে নিতেন তাহলে আমরা নিমেষেই বিলীন হয়ে যেতাম এবং তা কল্পনা করার অবকাশটুকুও পেতাম না। কেননা আমরা অচিরেই কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

যে যমীনের বুকে তোমরা বিচরণ করছ তা নিজে থেকে তোমাদের পায়ের তলায় স্থির হয়ে নেই। কেননা তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর অনুভূতিও নেই। যে ফলমূল ও শস্য দিয়ে তোমরা নিজেদের গোলা ভর্তি করছ তা উৎপাদন করার শক্তিও এর নেই। এর তো নড়াচড়া করার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। এর বোধশক্তি বা অনুভূতি শক্তি বলতে কিছুই নেই। এতো এক প্রাণহীন জড় পদার্থমাত্র। সুতরাং তার আবার সৃষ্টি ও আবিষ্কারের সাথে কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

নিঃসন্দেহে এটা মহান আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানই ফলশ্রুতি। তাঁর অনুগ্রহেই সমগ্র সৃষ্টিকুল স্বস্থানে বিরাজমান। মুহূর্তের জন্যও তিনি আমাদের থেকে অন্যমনস্ক হন না এবং আমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহের ধারাও বন্ধ হয় না। যদি তাই হত তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম এবং বিশ্বের এই সামগ্রিক ব্যবস্থাও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। আমাদের অস্তিত্ব এবং মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তিনি নিজ সত্তায় বর্তমান, আর আমাদের অস্তিত্ব তাঁর অনুগ্রহেরই ফল। তিনিই আমাদের অস্তিত্ববান করেছেন, যত দিন তাঁর ইচ্ছা হবে আমরা ততদিনই বর্তমান থাকব এবং তিনি যখন আমাদের অস্তিত্বের এই দান ফেরত নেবেন কোন শক্তিই আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এ থেকেই জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য গুণ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাঁর পূর্ণত্বের বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এর যৎসামান্যই আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

তাঁর অনুরূপ কিছু নেই

মহান আল্লাহ্র সত্তা সমগ্র সৃষ্টিকুল থেকে স্বতন্ত্র হওয়াটা একটি ব্যাপার। বিবেক-বুদ্ধিরও দাবি হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে ব্যবধান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এতটা ব্যবধান যার অনুমান করা সম্ভব নয়। স্রষ্টা কখনো সৃষ্টির অনুরূপ হতে পারে না—ব্যক্তিসত্তার দিক থেকেও নয়, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও নয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসংখ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এর তাৎপর্য অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা নিজেদের দৈনন্দিন ব্যাপারগুলো যেভাবে সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম এভাবে তাঁর গুণবৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা শুধু কষ্টসাধ্যই নয় বরং অসম্ভবও। কোন দুর্বল বান্দা কি করে সেই মহান সত্তার নিগূঢ় তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হতে পারে!

একটি ক্ষুদ্র পিপঁড়ার পক্ষে কি মানুষের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করা সম্ভব ? তাহলে মানুষ কি করে এই প্রশস্ত জগতের রহস্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, যেখানে তারা বসবাস করছে ? একটি শিশু জীবনের প্রাথমিক স্তরে কখনো জানতে পারে না যে, যৌবন কি জিনিস। আর এ বয়সে বুদ্ধি জ্ঞানের ব্যাপকতা ও পরিপক্কতাইবা কতটুকু হয়ে থাকে! বরং মানুষ যে জড় জগতে বাস করছে তার নিগূঢ় রহস্য বুঝতেই সে অক্ষম। সে অদৃশ্য লোকের তথ্য কি করেইবা জানতে পার ?

যখন বলা হয়, আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুই শুনতে পান, তখন তার অর্থ এই নয় যে, শুনার জন্য আমাদের মত তাঁরও কান রয়েছে। যখন বলা হয়, তিনি সব কিছুই দেখতে পান, তখন তার অর্থও এই নয় যে, আমাদের মতই তাঁর চোখ রয়েছে। যখন বলা হয়, তিনিই আসমানী জগত তৈরি করেছেন, তখন তার অর্থ এই নয় যে, তিনি আমাদের মত প্রকৌশলী ও রাজমিস্ত্রী ডেকে এনে যাবতীয় নির্মাণ সামগ্রী একত্র করেছেন। যখন বলা হয়, আমাদের হাতের ওপরে তাঁর হাত রয়েছে, তখন এর তাৎপর্য এই নয় যে, আমাদের হাতের মতই তাঁর হাত রয়েছে। আমাদের মৌলিক বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টির মধ্যে যে গুণ বৈশিষ্ট্য এবং দুর্বলতা বিরাজমান রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে সেগুলোকে সম্পৃক্ত করা মোটেই জায়েয নয়। কেননা সেই মহান সত্তা সৃষ্টিগত দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অপূর্ণাঙ্গ বুদ্ধির মধ্যে মহান আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা বর্তমান রয়েছে, তিনি তার চেয়ে অনেক বড় এবং অসীম।

কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন—চেহারা, হাত, চোখ, আরশের ওপর অবস্থান করা, আসমানে নেমে

আসা, বান্দার নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি। অনেক মুসলমান যুক্তির মাধ্যমে এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে এবং এর নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করতে যতই চেষ্টা করেছে ততই হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এসেছে। এটা কোন দুশ্চিন্তার কথা নয়। কেননা মানুষের কাছে যে সত্য পর্যন্ত পৌছার কোন উপায় উপকরণ নেই, তার অনুসন্ধানের মত্ত হওয়াই অনর্থক।

কোন রসায়নবিদ একটি তরল পদার্থ অথবা গ্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত। সে এটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত হয় এবং এর আরো কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হয়। কিন্তু বান্দার জন্য এটা কি করে বৈধ হতে পারে যে, সে মহান আল্লাহর প্রভুত্ব সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনায় লিপ্ত হবে এবং যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করবে আর যেটা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করবে। অথচ মহান আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের নিগূঢ় তত্ত্বে পৌছা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে তাঁর সত্তা এবং গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ ج وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ م وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٠

সেই মহান আল্লাহ্ তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে দুই প্রকারের আয়াত রয়েছে ঃ মুহকাম—এটা কিতাবের মূল ভিত্তি এবং মুতাশাবিহাত। যাদের মনে কুটিলতা রয়েছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবিহ্ আয়াতের পেছনে লেগে থাকে এবং এর অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে প্রতিভাবান লোক তারা বলে, আমরা এর ওপর ঈমান আনলাম, এ সবই আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এসেছে। আর সত্য কথা এই যে, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকেরাই কেবল কোন জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে থাকে। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭

এজন্য আল্লাহ তাআলা নিজের যে গুণাবলী উল্লেখ করেছেন এবং নিজের সত্তার দিকে যেসব জিনিসের সম্পর্ক ব্যক্ত করেছেন তার সত্যতা সম্পর্কে যদি আমাদের মনে নিশ্চিন্ততা এসে যায় এবং আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের দ্বারা তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে আমরা চক্ষু বন্ধ করে নতশিরে তা কবুল করব। আমরা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাব না, তাঁর কোন দৈহিক গঠন বা সাদৃশ্য কল্পনা করব না। এ বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে।

যুগ-যুগান্তরের পরিক্রমায় মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে ভাষা তৈরি করে নিয়েছে। যেমন আমাদের মুখমণ্ডলের উভয় পার্শ্বে শব্দ শোনার জন্য এবং কথা বোঝা জন্য যে দুটি ছিদ্র হয়েছে আমরা (আরবী ভাষায়) তার জন্য (কান) পরিভাষা প্রবর্তন করে নিয়েছি। অন্যান্য ভাষায় এর জন্য ভিন্ন শব্দ প্রবর্তন করা হয়েছে, যা আমাদের পরিভাষাটি থেকে ভিন্নতর। মোটকথা লোকেরা পরবর্তীকালে এসব শব্দ আবিষ্কার করে নিয়েছে। এর সাহায্যে তারা জড় পদার্থ, পরিচিত জিনিস এবং আরো অনেক মৌলিক বস্তুকে বোঝার চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে অদৃশ্যমান ও অজড় বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার জন্য যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব জিনিসকে মানুষের বোধশক্তির কাছাকাছি নিয়ে আসা। অন্যথায় যেসব জিনিস আমরা অনুভব করতে পারি, তার জন্য এবং জগতের সুপরিচিত জিনিসগুলোর জন্য যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার মাধ্যমে জড় জগতের বাইরে অজড় জগতে এসব কিছুর যে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে তা তুলে ধরা কখনো সম্ভব নয়।

অতএব আমরা যে ভাষাতেই অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করি না কেন আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও তাঁর গুণবৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই সত্যটি আমাদের সামনে রাখতে হবে। যেকোন ভাষায়ই আমরা অধ্যয়ন করি না কেন, সত্যকে আমাদের সীমিত জ্ঞানের কিছুটা নিকটতর করে দেওয়ার জন্যই এই প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। ভাষার সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে আল্লাহ্ তাআলার যতটুকু পরিচয় ফুটে উঠে, তিনি তার চেয়ে অনেক ব্যাপক, অনেক মহান। আমাদের সীমিত জ্ঞান তা আয়ত্ত করতে অক্ষম এবং আমরা তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণতা অনুমান করতেও অক্ষম।

দুনিয়ার মানুষের মধ্যে যতগুলো ভাষা প্রচলিত আছে তা হয়ত মানুষের কথাবার্তার সঠিক অবয়ব হতে পারে অথবা তাদের যাবতীয় আচার-আচরণের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, কিন্তু তা মহান আল্লাহ্র সত্তা এবং তাঁর যাবতীয়

গুণের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সব মুসলমান এ ব্যাপারে একমত। অবশ্য তাঁর পবিত্রতা ব্যাখ্যা ও প্রশংসা করার ক্ষেত্রে তাদের পন্থার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

একদল লোক আয়াতের প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তাঁরা বলেছেন, এসব জিনিসের যে বাহ্যিক অর্থের সাথে আমরা পরিচিত এখানে তা উদ্দেশ্য নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে শব্দগুলোর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা এবং এটা . . . . . . । উভয় দলের উদ্দেশ্য প্রায় একই! কুরআন পাকে এসেছে وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (যেন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে তৈরি হতে পারে—ত্বাহ ঃ ৩৯)। এখানে প্রথম দলটি বলেন, আল্লাহ্ তাআলার চোখ আছে, কিন্তু তা আমাদের চোখের মত নয়। আর দ্বিতীয় দলের মতে, চোখ বলতে এখানে তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা বোঝানো হয়েছে। উভয় দলই আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করার ব্যাপারে একমত। তাদের কেউই সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্র সাদৃশ্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে তাঁর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনার ধরনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আমাদের প্রাচীন মুসলিম বিশেষজ্ঞরা যদি এই বিষয়ের ওপর আলোচনা ও বিতর্কের যুদ্ধক্ষেত্র উত্তপ্ত না করতেন এবং একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন তাহলে কতইনা ভাল হত। আমি ব্যক্তিগতভাবে পূর্ববর্তীদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আমি কখনো এটা পছন্দ করি না যে, যেসব জিনিস বস্তুজগতের সীমার বাইরে রয়েছে মুসলমানরা তার অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে পড়ুক এবং অকারণ নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে এর পিছনে লাগিয়ে দিয়ে পরিশ্রান্ত করুক। যেসব আয়াত ও হাদীসে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লিপ্ত না হওয়াই আমার কাছে উত্তম ও পছন্দনীয় মনে হয়। যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে হুবহু সেভাবেই তা মেনে নেওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে এটাই হচ্ছে আমার অভিমত। কিন্তু মহান আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রে যেসব লোক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ অনুসরণ করেছে এবং কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করার পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করেছে তাদেরকে কুফরীর ফতোয়া দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়। কেননা যারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ অনুসরণ করেছে তারা কেবল এই আশংকায় তা করেছে যে, ইহুদী-খৃস্টানরা যেভাবে

আল্লাহ্‌র দৈহিক গঠন ও সাদৃশ্য কল্পনা করেছে এবং তাঁর সাথে যে হাস্যকর কথাবার্তা জুড়ে দিয়েছে, মুসলমানদের মধ্যেও যেন এই ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ না ঘটে।

বাইবেলের আদি পুস্তকে (তাওরাত) বর্ণিত আছে যে, সদাপ্রভু এবং ইয়াকুবের (জ্যাকব) মধ্যে মল্লযুদ্ধ বেঁধে যায়। সদাপ্রভু ইয়াকুবকে প্রসিদ্ধ উপাধি 'ইসরাঈল' উপঢৌকন দিয়ে তার হাত থেকে নিজেকে অতি কষ্টে মুক্ত করে নেন। আল্লাহ্ সম্পর্কে বাইবেলের নতুন নিয়মের বর্ণনা হচ্ছে—যেন মাতা-পুত্রের সমন্বয়ে একটি পরিবার এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন এই পরিবারের কর্তা বা পৃষ্ঠপোষক।

আমাদের ধারণা মতে এই দৃশ্য যদি সামনে রাখা হয় তাহলে যেসব লোক ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার পথ বেছে নিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ বিষয়কে পরোক্ষ হিসেবে গণ্য করেছেন, তাঁদের জন্য একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশ্য আমরা দেখেছি এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বাস্তবতার পরিবর্তে কল্পনার পথ বেছে নেওয়ার ঝোঁক সাধারণ মুসলমানদের ঈমানের ক্ষতিসাধন করেছে। আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট রয়ে গেছে যে, তিনি আসমানেও নেই এবং যমীনেও নেই, তাঁর হাত-পাও নেই, চোখও নেই এবং তাঁর কোন অবয়বও নেই। আনন্দিত হওয়া, হাসা, অনুগ্রহ করা, এটা ওটা কোনটাই তার বৈশিষ্ট্য নয়। অথচ এই বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন।

এক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, শরীআতে যা কিছু এসেছে তা আমরা মেনে নেব এবং যে সূক্ষ্ম বিষয় জানার জন্য আমাদের বাধ্য করা হয়নি তা জানার পণ্ডশ্রম করব না। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। যেমন—

এক, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি কোন কিছুর বিদ্যমান থাকাটা অসম্ভব বলে ফয়সালা করল।

দুই, এই জ্ঞানবুদ্ধি কোন জিনিস অনুধাবন করার ক্ষেত্রে নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিল।

এই দুটি কথার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বুদ্ধিবিবেক সিদ্ধান্ত নিল যে, দুই বিপরীত জিনিসের একই সময় বিদ্যমান থাকা অসম্ভব। অর্থাৎ একই আলোর বর্তমান থাকা এবং না থাকা অসম্ভব। কিন্তু যে জ্ঞানবুদ্ধি এটাকে অসম্ভব বলেছে সেই জ্ঞানবুদ্ধিই আলোর গূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম যে, এই আলোটা কি ? এর মধ্যে কি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে ? এমন বিস্ময়কর গতিতে কিভাবে তা এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে ?

মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির এই অক্ষমতার কারণে আলোর বৈশিষ্ট্য, এর তাৎপর্য ও এর অস্তিত্বের ওপর কি কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ? কোন জিনিস সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার অর্থ তো এই হতে পারে না যে, 'মূলত তার কোন অস্তিত্বই নেই'। এই বিষয়ের ওপর উস্তাদ আবদুল করীম আল-খতীবের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ্ কোন অস্পষ্ট বা অপরিচিত সত্তা নন। তিনি কোন সীমাবদ্ধ বা দেহসর্বস্ব সত্তাও নন। তিনি এমন এক 'সত্তা' যা এমন কোন সত্তার সাথে তুলনীয় নয়—মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যার অবয়ব কল্পনা করতে পার, অথবা তার চোখ তা অবলোকন করতে পারে। কেননা তাঁকে যদি ধারণা কল্পনার আওতায় আনা যায়, তাহলে তো তিনি একটি সীমাবদ্ধ সত্তাই হবেন। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির সীমা যতই বিস্তৃত হোক না কেন পরিশেষে তা সীমিতই। কিন্তু আল্লাহ্ এমন এক মহান সত্তা, যাঁর ব্যাপকতা মানুষের বোধশক্তি কল্পনা করতেও অক্ষম এবং তার সীমা নির্দিষ্ট করাও অসম্ভব। কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলার জন্য অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ রয়েছে। যেমন— ইরাদা (ইচ্ছাশক্তি), ইলম (জ্ঞান) কুদরাত (শক্তি) ইত্যাদি। এই গুণাবলী তাঁর পরিপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার পূর্ণতার কোন সীমা নেই। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হচ্ছে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই দ্বিবিধ ব্যবহারের মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার জন্য তা সীমাহীন ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা সীমিত ও ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন করীমে এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহ্ তাআলার জন্য উল্লিখিত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং যা এই জগতে কার্যকর রয়েছে। যেমন সর্বপ্রথম নাযিলকৃত ওহীতে বলা হয়েছে ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۔ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۔ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۔

পড় (হে নবী!) তোমার প্রভুর নাম সহকারে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানত না। —সূরা আলাক ঃ ১-৫

উল্লেখিত আয়াত কটিতে আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় তুলে ধরে বলা হয়েছে, তিনি স্রষ্টা এবং জ্ঞানের আধার। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .

আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোনরূপ কঠোরতা আরোপ করা তাঁর ইচ্ছা নয়। —সূরা বাকারা ঃ ১৮৫

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইরাদা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণ এবং তাঁর এই ইরাদার সাথে যাবতীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ج

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ . عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ .

আল্লাহ্ প্রতিটি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভ সম্পর্কে অবহিত। যা কিছু তার গর্ভে জন্ম নেয় এবং যা কিছু তাতে কম-বেশি হয় তা তিনি জানেন প্রতিটি জিনিসের জন্য তাঁর কাছে একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে। গোপন প্রকাশ্য সবই তাঁর জানা আছে। তিনি মহান ও সর্বোচ্চ। —সূরা রা'দ ঃ ৮-৯

উল্লেখিত আয়াত দুটি থেকে জানা যায়, তিনি ইল্‌ম (জ্ঞান) রাখেন, তিনি মহান . . . . . .তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি মহামহিম। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ .

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। তিনি যাকে যা দিতে চান তাই দান করেন। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান এবং মহাপরাক্রমশালী —সূরা শূরা ঃ ১৯

এ আয়াত থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু, শক্তিশালী এবং পরাক্রমশালী। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ اِلَى اللّٰهِ

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ .

আল্লাহ্ শুনতে পেয়েছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করছে এবং আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের কথাই শুনেছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। —সূরা মুজাদালা ঃ ১

এই আয়াত পরিষ্কার বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা প্রতিটি কথা শুনেন এবং প্রতিটি জিনিস দেখেন। অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ ـ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

আসমান-যমীনের কান জিনিসই আল্লাহ্র কাছে গোপন নয়। তিনি তোমাদের মায়েদের গর্ভে তোমাদের আকার-আকৃতি নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে থাকেন। বাস্তবিকই এই মহান জ্ঞানবুদ্ধির মালিক ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। —সূরা আলে ইমরান ঃ ৫-৬

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আলোচনা আল্লাহ্ তাআলার কোন না কোন সিফাতের (গুণ বৈশিষ্ট্য) মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। কোথাও কোথাও দুই দুইটি সিফাতও একত্রে উল্লেখিত হয়েছে। একটি সিফাত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا ـ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।
—সূরা নিসা ঃ ৩২ ; সূরা আহযাব ঃ ৫৪

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ مُّحِيْطًا ـ

আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। —সূরা নিসা ঃ ১২৬

একত্রে দুটি সিফাত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। —সূরা নিসা ঃ ৯৬, ৯৯ ১০০, ১৫২, সূরা ফুরকান ঃ ৭০ ; সূরা আহযাব ৫, ৫০, ৫৯, ৭৩ ; সূরা ফাতাহ ঃ ১৪

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۔

আল্লাহ্ বিশাল দৃষ্টিসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ। —সূরা বাকারা ঃ ২৭৪, ২৬১, ২৬৮ ; সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৩ ; মাইদা ৫৪ ; সূরা নূর ঃ ৩২

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

বাস্তবিকই এই মহান বুদ্ধিজ্ঞানের মালিক ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।
—সূরা আলে ইমরান ঃ ৬, ১৮

اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۔

তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তাদেরকে দেখেন।
—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩০, ৯৬

একথা নিঃসন্দেহ যে, ঐ সিফাত বা গুণাবলী যখন উল্লেখিত হয় তার সাথে সাথে এমন এক মহান সত্তার কথাও উল্লেখ করা হয়, যিনি এই বিশ্বজাহানের নিয়ামক। এই সিফাতগুলো এমনই এক সত্তার সাথে যুক্ত হতে পারে, যিনি তার একান্ত উপযোগী। শুধু তাই নয়, কুরআন মজীদে এরূপ কতক আয়াতও রয়েছে যাতে এই মহান সত্তার এক হাত, এক চোখ এবং দুই হাত, দুই চোখ ইত্যাদি উল্লেখ আছে। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ۔

যেন তুমি আমারই চোখের সামনে লালিত-পালিত হতে পারো।
—সূরা ত্বাহা ঃ ৯

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۔

তাদের হাতের উপরে রয়েছে আল্লাহ্র হাত। —সূরা ফাত্হ ঃ ১০

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۔ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۔

ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে। বাঁধা হয়েছে তাদেরই হাত। তাদের এসব অশোভন বক্তব্যের কারণে তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। বরং আল্লাহ্র হাত উদার, উন্মুক্ত। তিনি যেভাবে চান ব্যয় করেন। —সূরা মাইদা ঃ ৬৪

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا ·

আমার চোখের সামনে নৌকা তৈরি কর। —সূরা হূদ ঃ ৩৭

অনন্তর হাদীসের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের অসংখ্য হাদীস বর্তমান রয়েছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

خُلِقَ اٰدَمُ عَلٰى صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ ·

আদমকে মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬]

لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فِيْهَا فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ فَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ ·

জাহান্নাম অবিরত বলতে থাকবে, 'আরো' আছে কি ? অবশেষে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ এর মধ্যে নিজের পা রাখবেন। তখন সে বলবে, তোমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর এর বিভিন্ন অংশ সংকুচিত হয়ে যাবে।

—তিরমিযী ও বুখারী ঃ সূরা কাফ-এর তফসীর অনুচ্ছেদ

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ·

মুমিনের অন্তর মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র দুই আংগুলের মাঝখানে রয়েছে। তিনি যেভাবে চান তা উলট-পালট করেন।[৭]

উল্লেখিত আয়াত এবং এই ধরনের আরো অসংখ্য আয়াত বর্তমান রয়েছে। কোন পাঠক তা পাঠ করবে আর কান শ্রোতা তা শুনবে এবং তার চিন্তার রাজ্যে উল্লেখিত সিফাতগুলো কোন আলোড়ন সৃষ্টি করবে না তা মোটেই সম্ভব নয়। যে সত্তার সাথে এই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাঁর সাথে তার সম্পর্কে সৃষ্টি

---

৬. এ হাদীসটি ' আমি 'মুজা-'এ (হাদীসের বিস্তারিত সূচী সম্বলিত গ্রন্থ) খুঁজে পাইনি। তবে প্রায় একই অর্থবোধক হাদীস তিরমিযীর মানবিক অধ্যায়ের ৭৪ অনুচ্ছেদে এবং মুসলিমের যুহদ অধ্যায়ের ৬০ অনুচ্ছেদে বর্তমান আছে। —অনুবাদক

৭. এ হাদীসটিও মু'জামে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মুসনাদে আহ্‌মেদ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠায় বর্তমান রয়েছে। - অনুবাদক

না হওয়াটাও অসম্ভব। আমাদের এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাদীসে আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর যে বর্ণনা এসেছে—তা কি এতটা সুস্পষ্ট যে, এ সম্পর্কে কোন সংশয় জাগতে পারে না ? আমরা এর জবাবে পরিষ্কার বলতে চাই, "হাঁ। কেননা মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে জানার সঠিক রাস্তা পেয়ে যায়, আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে তাঁকে কবুল করে নেয় এবং নিজের স্বভাব প্রকৃতির মাঝে তাঁর জন্য স্থায়ী আসন করে দেয়, তখন আল্লাহর ধারণা চূড়ান্তভাবে তার সামনে পরিস্ফূটিত হয়ে উঠে। উলুহিয়াতের অর্থ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তা যিনি মানুষকে তাঁর সম্পর্কে উচ্চ থেকে উচ্চতর চিন্তাভাবনা করার স্বাধীনতা দান করেন। এই চিন্তার ক্ষেত্র এত ব্যাপক ও এত উচ্চ যে, মানুষ যখনই তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করতে একটি স্তরে পৌঁছে যায় তখন এর চেয়েও উন্নত ও ব্যাপক স্তর তার চোখের সামনে হাযির হয়ে যায়। অনবরত এ অবস্থাই বিরাজ করছে। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٠

তাঁর সদৃশের মত কেউ নেই, তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

—সূরা শূরাঃ ১১

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনের মন-মগজে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং তারা কখনও এই প্রশ্ন তোলেনি যে, আল্লাহ্‌র হাত বলতে কি বোঝায়, তাঁর চোখ, শক্তি বা ইল্‌ম (জ্ঞান) বলতেইবা আমরা কি বুঝি। তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতিই তাঁদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। যদি এর কোন জবাব কোথাও থেকে থাকে তাহলে মুমিন ব্যক্তির অন্তরে তাঁর মহানত্ব ও বুযর্গীর যে ভাবধারা ও অনুভূতি বিরাজ করছে—তার মধ্যেই এর জবাব নিহিত রয়েছে। সে দেখতে পায় তার অন্তর এবং তার সমগ্র সত্তা এই মহান রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, গৌরব ও মহিমার সামনে অবনত হয়ে আছে। সে এক বাক্যে সাক্ষ্য দেয়, তিনি সবদিক থেকেই পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদের স্বভাব-প্রকৃতি তাদেরকে আরো শিখিয়েছে যে, মানব বুদ্ধি তাঁর কোন একটি গুণ বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতেও সক্ষম নয় এবং তাঁর কোন আকৃতি নির্ধারণেও সক্ষম নয়। কেননা কোন আকৃতিই তাঁর মাধ্যমের আকৃতি নয়। তিনি হচ্ছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা।

সেই 'আল্লাহ'—যাঁর সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং যাঁর দিকে পথ দেখানোর জন্য কুরআন এসেছে এবং একনিষ্ঠভাবে যাঁর ইবাদত করার জন্য কুরআন আহ্বান জানাচ্ছে—মানুষের চিন্তায় ও মননে তাঁর সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা বিরাজিত থাকা জরুরী ছিল। ফলে মানুষ তাঁকে সহজেই চিনতে পারত, তাঁর সাথে পরিচিত হতে পারত এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারত। এটাও জরুরী ছিল যে, ইসলামী শরীআত মানুষের মনমগজে 'ইলাহ' সম্পর্কে একটা ধারণা বদ্ধমূল করে দিত, তাহলে আল্লাহ্ একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হতেন, যাঁর ওপর মানুষ ঈমান এনে থাকে এবং নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। তাহলে কুরআন যে ধারণাটা পেশ করেছে তা কি ? তিনি কি জড় না অজড় ? তিনি কি সীমাবদ্ধ সত্তা না অসীম সত্তা ?

এই নাযুক প্রশ্নে ইসলামের ভূমিকা একটি অন্যতম মহান নিদর্শন এবং একটি অলৌকিক মু'জিযা হয়ে বিরাজ করছে, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও নবুয়াতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। তা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি মানব জাতির সামনে যে পথনির্দেশ রেখেছেন তা মহান রাব্বুল আলামীন এবং আহকামুল হাকিমীনেরই শেখানো। আমরা এ সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখতে পাই এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে নিগূঢ় রহস্য, পরিপূর্ণ হিকমত ও কৌশল।

এক, ইসলামে আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা কোন জড়বাদী ধারণা নয়। যদি তাই হত তাহলে আল্লাহ্ অনুভবযোগ্য দেহসর্বস্ব সত্তা হতেন। তিনি দেহসর্বস্ব হলে সীমিত হতেন এবং সীমিত হলে অনুভূতি ও দৃষ্টির সীমায় এসে যেতেন, অন্যান্য বস্তুর মত একটি বস্তুতে পরিণত হতেন, নির্দিষ্ট একটি জায়গায় তাঁর অবস্থান সীমিত থাকত এবং অবশিষ্ট জায়গায় তাঁর উপস্থিতি থাকত না, কেউ তাঁকে দেখতে পেত এবং কেউ দেখতে পেত না, এতে তাঁর গৌরব ও মহিমা হ্রাস পেতে থাকত, তাঁর সম্মান ও মর্যাদা কমতে থাকত এবং তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি লোপ পেতে থাকত।

আমরা সবচেয়ে বড় যে বস্তুটি চোখে দেখতে পাচ্ছি এবং এই জগতের উপর যার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করছি তা হচ্ছে সূর্য। এ কারণে কোন এক যুগে এটাকে প্রভুদের প্রভু জ্ঞানে পূজা করা হত।

কিন্তু কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এটা কখনো সমর্থন করতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র কোন একটি নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থল থাকতে হবে, কখনো তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং কখনো অনুপস্থিত। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারটিই লক্ষ্য করুন। তিনি একবার তারকারাজির দিকে তাকালেন, অতঃপর চাঁদের দিকে। যখন উভয়টিই অস্তমিত হল তিনি বললেন ঃ

لَا أُحِبُّ الْآفِلِيْنَ ۝

(অস্ত যাওয়া জিনিসের প্রতি আমি মোটেই অনুরাগী নই)। অতঃপর তিনি সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কিন্তু যখন তাও ডুবে গেল, তিনি এসব কিছু বাদ দিয়ে এক মহান সত্তার সন্ধানে লেগে গেলেন ঃ

فَلَمَّا رَاَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَا اَكْبَرُ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

সে যখন সূর্যকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত দেখতে পেল তখন বলল, এটাই আমার প্রভু। এটা সর্বাপেক্ষা বড়। কিন্তু যখন তাও ডুবে গেল তখন সে বলল, হে আমার স্বজাতি! তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বানাচ্ছ— তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করেছি যিনি যমীন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। —সূরা আন্‌আম ঃ ৭৮, ৭৯

দুই, ইসলাম এও পছন্দ করেনি যে, আল্লাহ্ একটি অজড় বস্তু এবং স্রেফ একটি কল্পনার উৎস হয়েই থাকবেন, তাঁর কোন গুণবৈশিষ্ট্য থাকবে না এবং সৃষ্টির অন্তরালে তাঁর কোন ভূমিকা থাকবে না, যার মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ ঘটতে পারে। বাস্তবিকই যদি তাই হত, তাহলে জ্ঞান-বুদ্ধির কাছে তিনি অনুধাবনযোগ্য হতেন না। কোন অন্তরও তাঁর প্রতি আশ্বস্ত হত না এবং মানুষের অস্তিত্ব ও তার কর্মকাণ্ডে তাঁর কোন প্রভাবও থাকত না।

ইসলামে ইলাহ্ সম্পর্কিত ধারণা এটাও নয় এবং ওটাও নয়। তিনি জড়ও নন এবং শুধু কল্পনার বস্তুও নন। ইসলাম মানুষের মন-মগজে ইলাহ্ সম্পর্কে যে

ধারণা বদ্ধমূল করতে চায় তা কল্পনার বস্তু হিসেবেও নয় এবং দেহসর্বস্ব সত্তা হিসেবেও নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে চাইলে সে আল্লাহ্‌র এমন পরিচয় লাভ করবে যে, তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন, তিনি জ্ঞানের আধার, তিনি অসাধারণ শক্তি এবং হিকমত ও কৌশলের অধিকারী, সবকিছুই তাঁর ইচ্ছাধীন, তিনি জীবন দান করেন এবং তা হরণ করেন। তিনি যেকোন জিনিসের ওপর শক্তিমান, এই মহাবিশ্বের তিনিই মালিক এবং রাজাধিরাজ, তিনি আরশে আযীমে সমাসীন, আরশের চারপাশে রয়েছে ফেরেশতাদের ভীড়। তারা তাঁর কোন নির্দেশ লংঘন করেন না, যে নির্দেশই তাদের দেওয়া হয়, তাই তারা পালন করে। এই গুণবৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের মন-মগজে আল্লাহ্ তাআলার সত্তা সম্পর্কে একটি প্রতিচ্ছবির জন্ম দেয়।

এই ব্যক্তি পুনরায় যখন কুরআনের ওপর নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে সে দেখতে পাবে যে, তাঁর সদৃশের মত কিছুই নেই ( )। এই জিনিসটি তার চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং ইতিপূর্বে তার মনে আল্লাহ্ সম্পর্কে যে জড়বাদী ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে বরফ গলার ন্যায় বিগলিত হতে থাকবে।

যতদূর আমি অনুধাবন করতে পেরেছি, ইসলাম মানুষের মনে 'ইলাহ' সম্পর্কে এ ধারণাই বদ্ধমূল করতে চায়। এই ধারণাটি খুবই জরুরী ছিল যাতে আমরা তাঁকে নিজেদের অন্তরে বসিয়ে দিতে পারি, নিজেদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বানাতে পারি এবং নিজেদের দোয়া ও ইবাদত তাঁর জন্য নিবেদন করতে পারি।

এই মহান সত্তার রহস্য অনুধাবন করা আমাদের ক্ষমতার অতীত। তিনি এতই সুমহান ও সমুন্নত যে, সে পর্যন্ত আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি পৌছতে পারে না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ধারণা লাভ করাও অত্যন্ত জরুরী ছিল। তাই কুরআন তাঁর এতটা নিদর্শন প্রকাশ করে দিয়েছে যা আমাদের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হতে পারে এবং এ পথে আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে। কুরআন আমাদের এতটা বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন দেহসর্বস্ব সত্তা নন। তিনি এমন এক সত্তা, যাঁর মধ্যে শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। এগুলো রাব্বুল আলামীনের উপযুক্ত সিফাত বা বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ হচ্ছেন একটি সত্তা, কিন্তু তাঁর সত্তার সদৃশ কিছুই নেই।

আমরা কি জানি এবং কি জানি না

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একদিন তাঁর পাঠাগারের নিচের তলায় একটি ছোট আলমিরার কাছে দাঁড়ালন। অতঃপর বললেন, "অজানার তুলনায় আমার জানার পরিধিটা এতই ক্ষুদ্র যেমন এই বিরাট পাঠাগারের মধ্যে এই ছোট্ট আলমিরাটি।"

আইনস্টান তাঁর এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ইনসাফ করেননি। যদি তিনি ইনসাফের সাথে কথা বলতেন তাহলে এভাবে বলতেন, " আমার জ্ঞানের পরিধি এর চেয়েও ক্ষুদ্র।" কেননা আমরা কোন একটি জিনিস সম্পর্কেও সঠিক জানি না যে, তা কি ? আমরা এমন এক জগতে বাস করি যা তত্ত্ব ও শক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমরা তার কতটুকু জানি ? এতো হল এমন এক জগতের কথা, যেখানে আমরা বাস করছি, যাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারছি এবং যেখানে আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম করে যাচ্ছি। কিন্তু যেসব গ্রহ আমাদের নাগালের অনেক দূরে তার সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে ?

আমরা বলছি এই পৃথিবী অণুর *(Atom)* দ্বারা গঠিত এবং অণু ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে অথবা ইলেকট্রন *(Electron),* প্রোটন ও নিউট্রন *(Neutron)* দ্বারা গঠিত। কিন্তু অণু সম্পর্কে প্রায় প্রতি চার বছর অন্তর আমাদের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। আমরা অণু থেকে আণবিক বোমা তৈরি করছি কিন্তু আমাদের জানা নেই অণু কি জিনিস, এর তাৎপর্যইবা কি ? আমরা বলে থাকি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই যেকোন জিনিস উপর থেকে নিচের দিকে পতিত হচ্ছে। প্রদীপের আলো বিদ্যুতেরই সমাহার। আমরা বিদ্যুতকে আয়ত্ত করে তার সাহায্যে গরম, ঠাণ্ডা এবং গতির সৃষ্টি করছি। কিন্তু বিদ্যুৎ কি জিনিস ? এর রহস্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আমরা শুধু এতটুকুই জানি যে, তা কিভাবে ব্যবহার করা যায়।

স্বয়ং জীবন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতে পারিনি। অথচ তা আমাদের নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের আশেপাশে যত জিনিসই রয়েছে এর গূঢ় রহস্য আমরা কিছুই জানি না। আমরা কেবল এর ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখি। অন্য কথায় আমরা এতো জানি যে, জিনিসটি কি রকম, কিন্তু মূলত তা কি এবং কেন ? এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

প্রেম ও ভালবাসা কি জিনিস ? সৌন্দর্য কি জিনিস ? স্বাধীনতা কি ? যত অজড় বস্তু রয়েছে তা কি ? এসব জিনিসের রহস্য আমরা কিছুই জানি না। জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে আমরা কেবল এর ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে পারি। ধর্ম কি ? আশা, ভয়, আকাংখা, বীরত্ব, পাপ পুণ্য কি জিনিস ? এগুলো কতগুলো বৈশিষ্ট্যমাত্র।

আমরা জানি দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। এর ভগ্নাংশ বা এর সমন্বয়ে গঠিত সংখ্যা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা আছে। কিন্তু অন্যান্য জিনিসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই আমরা জানি, মূল জিনিসটি সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি এতই দুর্বল এবং সীমিত যে, আমরা কোন বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছতে পারি না।

প্রয়োগবাদে *(Pragmatism)* বিশ্বাসী লোকদের ঐ কথা অনেকটা ইনসাফের কাছাকাছি যে, মানববুদ্ধি নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনে সক্ষম নয়। তা কেবল একটা সীমা পর্যন্ত পৌছার জন্য কিছুটা উপায়-উপকরণ খুঁজে বের করতে পারে মাত্র। যাঁরা বিজ্ঞানের গবেষণায় নিয়োজিত আছেন তাঁরা বলেন যে, তাঁরা কতগুলো বিধান প্রবর্তন করে নিয়েছেন, যেমন মাধ্যাকর্ষণবিধি, প্রাকৃতিক বিধান ও অপরসায়ন প্রণালী ইত্যাদি। তাঁরা এই দাবি করছেন না যে, এগুলো বস্তুর অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা, বরং তা এর বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা। তাও আবার আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা নয়, বরং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা।

তুমি বলে থাক যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে ভালবাসে এবং অমুক ব্যক্তি তোমাকে অপছন্দ করে। কিন্তু এই পছন্দ ও অপছন্দের রহস্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। তত্ত্বের চেয়ে বাস্তব প্রয়োগ অনুধাবন করা সহজ। অন্য কথায় বাস্তব প্রয়োগের সাথে পরিচিত হওয়া তত্ত্বের পরিচয় লাভ করার তুলনায় অনেক সহজ। কেননা বাস্তব প্রয়োগের সম্পর্ক রয়েছে কাজের সাথে আর জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে অনুধাবন শক্তির সাথে। আর আমরা তত্ত্ব অনুধাবন করার তুলনায় বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করার অধিক শক্তি রাখি। এজন্যই জীবন ধারণটা সহজ। কেননা এর সম্পর্কে রয়েছে বাস্তবতার সাথে। কিন্তু তত্ত্ব অনুধাবন করা কঠিন, কেননা তার সম্পর্ক হচ্ছে জ্ঞানের সাথে।

তুমি এটা সহজেই বুঝতে পার যে, তুমি নির্ভুলভাবে রেলগাড়ি তৈরি করতে পারলে তা কোনরূপ সংঘর্ষের সৃষ্টি করবে না, এর চাকাও খসে পড়বে না এবং যতদূর সম্ভব তুমি দুর্ঘটনা থেকেও নিরাপদ থাকতে পারবে। কোন কাজে তুমি যদি সঠিক পন্থা অনুসরণ কর তাহলে তাতে সফলকাম হওয়ার আশা রাখতে পার। কেননা এসব কিছুর সম্পর্ক বাস্তব প্রয়োগের সাথে, তত্ত্বের সাথে নয়। তোমার ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কেননা তুমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যেতে পার, যা তুমি কখনো ধারণা করনি। রেলগাড়ি কখনো লাইনচ্যুত হয়ে যায়, কখনো এর সামনে মহিষ বা অন্য প্রাণী পড়ে যেতে পারে এবং এর সাথে ধাক্কা লাগতে পারে। কখনো তোমার মোটর গাড়ির এমন জিনিসের সাথে ধাক্কা লাগতে পারে, তুমি যার কল্পনাও করনি। এই অবস্থায় অজানা রহস্য সম্পর্কে আমরা আর কি বলতে পারি।

বাস্তব অবস্থা যখন এই, তখন আমরা কি করে আশা করতে পারি যে, বুদ্ধি আত্মা, অনুভূতি এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিসের নিগূঢ় রহস্য আমরা আয়ত্ত করতে পারব ? আমরা শুধু এর বাহ্যিক দিকটার উপরই মন্তব্য করতে পারি, এর উৎসমূলে পৌঁছার শক্তি আমাদের নেই। যাঁরা অভিধান লিখেছেন অথবা যাঁরা পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তাঁরা যদি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন তাহলে এদিকে অগ্রসর হতেন না। কেননা এসব বিষয়ের গভীরে পৌঁছার শক্তি তাঁদের নেই। তাঁর শুধু নিজেদের ধারণা-কল্পনার চৌহদ্দির মধ্যে ডিগবাজি খাচ্ছেন।

এসব সংজ্ঞার সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সংজ্ঞাগুলি নির্ণয় করা হয়েছে, নিগূঢ় রহস্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। অধিকাংশ লোকের জীবনে দেখা যায় ঝোঁকপ্রবণতা অলীক কল্পনাপ্রবণতাই তাদের পরিচালনা করেছে। সেখানে জ্ঞানের আলোকবর্তিকার কোন দখল নেই। সেখানে কুসংস্কার ও অলীক ধারণা অনুমানেরই প্রাধান্য দেখা যায়, বুদ্ধি বিবেকের কোন ভূমিকা নেই। যে জ্ঞান তার সবচেয়ে কাছের পারিপার্শ্বিকের খবর রাখতে পারে না, তার কাছে দূরের এবং আরো দূরের খবরের ব্যাপারে আর কি

আশা করা যায়! একথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে মানুষের জ্ঞান কেন আল্লাহ্ তাআলার প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় ? ব্যাপারটাকে ঠিক এভাবে বলা যায়, যে পৃথিবীর বুকে মানুষ বসবাস করছে, তার সম্পর্কেই সে অবহিত নয় অথচ সে মঙ্গল গ্রহের অনুসন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে। নিজের চোখের সামনে উপস্থিত জিনিসের সাথেই সে পরিচিত নয় অথচ উর্ধ্ব জগতের রহস্য সন্ধানে ব্যাকুল।

ইসলাম মানুষকে চিন্তার যে স্বাধীনতা দান করেছে, একদল লোক তার অপব্যবহার করে এর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করেছে। তারা এই সীমার বাইরে চলে গেছে এবং নিষ্ফল ও অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে কূটতর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং প্রশ্ন তুলেছে—তাঁর গুণাবলী তাঁর সত্তার অন্তর্ভুক্ত কি না ? ফলে তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয়নি। আর যে বিষয়টি তাদের চিন্তা ও কল্পনার আওতাবহির্ভূত সে সম্পর্কে তারা কি করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে ? এমনকি এই বিতর্ক যদি স্বয়ং মানুষের সত্তাকে কেন্দ্র করে হত, তবুও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা কষ্টকর হয়ে যেত। তাহলে আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়াটা কত দুঃসাহসিক ব্যাপার।

যেসব মুসলিম বিশেষজ্ঞ আলেম আকাইদ সম্পর্কে বই-পুস্তক লিখেছেন তাঁরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কলম ধরেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে কেউই ইসলামের দুর্নাম করার বা নিজেদের মধ্য থেকে ইসলামের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আকাইদ শাস্ত্রের আলোচনা করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিতর্ক তাদেরকে এমন এক পর্যায়ে পৌছে দিয়েছে যে, তারা পরস্পরের উপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেন এবং অত্যন্ত জঘন্য পন্থায় পরস্পরের মস্তক ছিন্ন করেন।

বর্তমান যুগেও এ ধরনের লোকের মোটেই অভাব হয়নি। যারা সাধারণ মুসলমানদের এমন সমস্যায় জড়াতে চায়, যার সমাধান তারা করতে সক্ষম নয়, এর পরিণামে গোটা জাতি বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে পড়ে। অথচ এ সময় প্রয়োজন ছিল সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে এবং বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোকে একত্র করে জড়বাদী সভ্যতার মোকাবেলা করা। কেননা এই সভ্যতা ইসলামের

শিকড় কাটতে এবং তৌহীদের সমুন্নত পতাকাকে ভুলুণ্ঠিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

আমাদের কিছু সংখ্যক লোক যদিও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ অবলম্বন করেছেন তার অর্থ এই হতে পারে না যে, আমরা তাদেরকে নিজেদের মনগড়া অপবাদ আরোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করব এবং তাদেরকে মুসলিম উম্মাহ্ থেকে বহিষ্কার করে দেব। এটা নির্বোধের নীতি হতে পারে। আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা সঠিক বক্তব্য তুলে ধরব, জনগণকে সত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব এবং বিভেদে জড়িয়ে পড়া থেকে দূরে থাকব।

তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ

মহান আল্লাহ্ সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষীহীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী হওয়ার তাত্ত্বিক অর্থ এই নয় যে, তিনি এই বিশ্ব, এই আসমান, এই যমীন এবং এর অভ্যন্তরভাগে লুক্কায়িত মূল্যবান ধাতু ও খনিজ সম্পদের মালিক।

তাঁর পরনির্ভরশীল না হওয়ার কারণ এই নয় যে, তিনি অসংখ্য জিন, ইনসান ও ফেরেশতার মালিক। আল্লাহ্ তাআলার স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার নিগূঢ় রহস্য তা নয়। তিনি এসব কিছুর অনেক উর্ধ্বে এবং তিনি সম্মানিত ও গৌরবান্বিত সত্তা।

আমরা কোন ব্যক্তিকে অগাধ সম্পদের মালিক বলে ধারণা করি। কেননা তার মালিকানায় রয়েছে সোনা-রূপার স্তূপ, অথবা সে লাখো জনতার ওপর কর্তৃত্বের লাঠি ঘুরায়। কিন্তু যখন তার হাত থেকে এসব কিছুই চলে যায়, তখন সম্পদশালী হওয়ার কি অর্থ দাঁড়ায় ? যে স্তম্ভের ওপর তার ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত ছিল, তাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই, সীমাহীন বিশ্বের সামান্য অংশ সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা আছে, কিন্তু এর বিরাট অংশ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এটাকেও মহান আল্লাহ্র ঐশ্বর্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার নিদর্শন বলা যেতে পারে। কিন্তু তারপরও তার স্বয়ং সম্পূর্ণতার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসবে না। তিনি পূর্বের মতই বিরাজমান থাকবেন, সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী হবেন না, পবিত্রতা ও গৌরবে ভূষিত থাকবেন। তিনি বিজয়ী হয়ে থাকবেন, তাঁর ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না।

আরশ এবং এ ছাড়া যা কিছু আছে—এই মহামহিম সত্তার সামনে এর কোন অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত অনুগত বান্দাদের ইবাদত বন্দেগী তসবীহ-তাহ্‌লীল ও গুণগান আল্লাহ্ তাআলার গৌরব ও মর্যাদা না বৃদ্ধি করতে পেরেছে, আর না কখনো বৃদ্ধি করতে পারবে। অনুরূপভাবে যত পাপাত্মার জন্ম হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে—তাদের বিদ্রোহ ও নাফরমানী তাঁর গৌরব ও মর্যাদা বিন্দু পরিমাণ না কমাতে পেরেছে আর না কমাতে পারবে। হাদীসে কুদসীতে এসেছে ঃ

يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ مَّا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا . يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَّا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُّلْكِيْ شَيْئًا .

> হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ, সমস্ত মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তির মত হয়ে যায়—তাতে আমার রাজত্ব সামান্যও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যারা এসে গেছে এবং যারা আসবে, সমস্ত মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় আল্লাহ্‌দ্রোহী ব্যক্তির মত হয়ে যায়—তাতে আমার রাজত্ব মোটেই সঙ্কুচিত হবে না।[৮]

ছোটবড় সমস্ত মাখলুক আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহেই টিকে আছে। আর আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বিরাজমান, কোন সৃষ্টিরই তিনি মুখাপেক্ষী নন।

---

৮. সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লেখ আছে।

নির্ভেজাল তৌহীদ

আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়

এই গোটা বিশ্বের ইলাহ মাত্র একজন। সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর অসীম ক্ষমতা, গৌরব ও মহত্বের সামনে নতশিরে দণ্ডায়মান। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۔ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۔

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই দয়াময় রহমানের কাছে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে। তিনি তাদের ভাল করেই জানেন এবং তিনি তাদের সঠিকভাবে গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন সকলেই তাঁর সামনে এককভাবে হাযির হবে। —সূরা মরিয়ম ঃ ৯৩ ঃ ৯৫

একদল লোক যেসব জিনিসকে আল্লাহ্র সাথে শরীক বলে ধারণা করে নিয়েছে, আমরা সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, এগুলোর অবস্থা এমন যে, বিশ্বজগতে অথবা এর ব্যবস্থাপনায় এগুলোর কোন স্থান নেই। প্রচীনকালে লোকেরা পাথরের পূজা করত। সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী কোন ব্যক্তি কি এ কথা সমর্থন করতে পারে যে, মাটির কোন পাথর, এমনকি গোটা পৃথিবী ইলাহ (উপাস্য) হওয়ার যোগ্যতা রাখে ? তারা কোন পশুর পূজা শুরু করে দিল এবং এর গোটা প্রজাতিকেই পবিত্র মনে করে নিল। হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্তও এই মহামারী দেখা যাচ্ছে। কোন পশুর বাচ্চা—তা যতই মোটাতাজা ও হৃষ্টপুষ্ট হোক না কেন— উপাস্য হওয়ার মর্যাদায় আসীন হতে পারে কি ?

নিঃসন্দেহে মূর্তিপূজা করা নিজেদের মর্যাদা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যই তারা এত নিচে নেমে গেছে। কোন কোন ব্যক্তি নিজেই ইলাহ্ হওয়ার দাবি করেছিল। যেমন মিসরের রাজা ফিরাউন এবং সেই নমরূদ, যে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তাঁর রব সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰـهُ اللّٰـهُ الْمُلْكَ ۔ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ۔

> তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে ইবরাহীমের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল এই কথা নিয়ে যে, রব কে ? সে এই দুঃসাহস এজন্য করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। ইবরাহীম যখন বলল, আমার রব তিনি—যাঁর এখতিয়ারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। তখন সে বলল, জীবন ও মৃত্যু তো আমারই এখতিয়ারে।
>
> —সূরা বাকারা ঃ ২৫৮

এই নির্বোধ মনে করে বসল, যে রাজত্বের সে একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসেছে এবং যার ভিত্তিতে সে প্রজাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হত্যা করেছে এবং যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখছে—তা তাকে উপাস্য হওয়ার পদমর্যাদায়ও অভিষিক্ত করতে পারে। একদল লোকের মগজে আজো এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু জনগণ প্রতিটি যুগেই এদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে আসছে।

ইহুদী-খৃস্টানরাও তাদের নবী-রাসূলদের মর্যাদা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা তাদেরকে ইলাহ্ হওয়ার পদমর্যাদায় উন্নীত করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অথচ তাঁরা আল্লাহ্র বান্দা ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। নবুয়াতের পদমর্যাদা তাঁদের দান করা হয়েছিল মাত্র। এ ব্যাপারে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেরাই প্রতারিত হয়েছে। কোন মানুষ—সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন—আমরা যদি তার সম্পর্কে ধারণা করি যে, সে কোন একটি তারকা সৃষ্টি করেছে—তবে এটা কত বড় নির্বুদ্ধিতা।

আমরা দূরে কেন যাচ্ছি ? এদের কেউই তো একটি মাছি, এমনকি এর চেয়েও ক্ষুদ্র কোন জীব সৃষ্টি করতে কখনো সক্ষম হয়নি। অতএব যারা ক্ষুদ্র

থেকে ক্ষুদ্রতর একটি প্রাণী সৃষ্টি করতেও সক্ষম নয়, তারা আবার উপাস্য হয় কেমন করে ? সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, একটি মাত্র মৌমাছির পেটে যে হাজার হাজার জীবাণু (Germs) রয়েছে তার একটি জীবাণূ যদি এদের কারো স্বাস্থ্যের উপর আক্রমণ করে বসে, তাহলে সে তার প্রতিরোধ করতেও সক্ষম নয়। এরপর আর কিসের ভিত্তিতে তাদের কাউকে উপাস্যের আসনে বসানো যেতে পারে ?

ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)

ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-কে এই জগতের প্রভু অথবা এক্ষেত্রে তাঁকে আল্লাহ্র অংশীদার বানিয়ে যে নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে দুনিয়াতে আর কোন নিকৃষ্ট কাজ এতটা প্রচার পায়নি। চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির অনুপাত অনুযায়ী এই মূর্খতার ক্ষেত্র প্রশস্তও হতে থাকে এবং সংকীর্ণও হতে থাকে। কখনো বলা হয়, আল্লাহ্ ঈসা, তাঁর মা ও পবিত্র আত্মা মিলে গঠিত হয়েছে একটি যৌথ মালিকানা। এই বিশ্বজগৎ উল্লেখিত কোম্পানীর তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হচ্ছে। আবার কখনো বলা হয়, এই অংশীদারগণ একই সত্তার বিভিন্ন অংশ অথবা বিভিন্ন রূপ—যা অনুধাবন করা মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

এই সবই হচ্ছে মহাসত্য থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং চরম ভ্রান্তি। মহান আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ·

যারা বলেছে, মসীহ ইব্ন মরিয়মই হচ্ছে খোদা, তারা নিশ্চয়ই কুফরী করেছে। —সূরা মাইদা : ৭২

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ·

যারা একথা বলেছে যে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন —তারা নিশ্চয়ই কুফরী করেছে। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। —সূরা মাইদা : ৭৩

ঈসা (আঃ) ছিলেন একজন মানুষ। তিনি পানাহার করতেন এবং দেহ থেকে উচ্ছিষ্ট ও মলমূত্র নির্গত করতেন। অতএব তাঁর মানব বৈশিষ্ট্য কি করে অস্বীকার করা যেতে পারে ? অথবা কি করে তাঁর জন্য অতিমানবীয় মর্যাদা দাবি করা যেতে পারে ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُوْلٌ ۔ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ كَانَ يَاْكُلاَنِ الطَّعَامَ ۔

মরিয়মের পুত্র মসীহ্ একজন রসুল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার পূর্বে আরো অনেক রসুল অতীত হয়েছে। তার মা ছিল এক পবিত্রতম ও সত্যপন্থী মহিলা। তারা উভয়েই খাদ্যগ্রহণ করত।—সূরা মাইদা ঃ ৭৫

তিনি ছিলেন একজন বান্দা মাত্র। মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে তাঁর মাথা অবনত হয়ে যেত। তিনি পূর্ণ নীরবতা সহকারে, নিজেকে ধন্য মনে করে এবং স্বীকৃতিসুলভ ভঙ্গীতে এই ঘোষণা শুনছেন ঃ

[illegible]

[illegible]

হে মুহাম্মদ! তাদের বল, আল্লাহ্ যদি মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌কে এবং তার মা ও সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করে দিতে চান, তাহলে তাঁর ইচ্ছা থেকে তাঁকে বিরত রাখার মত শক্তি কার আছে ? সূরা মাইদা ঃ ১৭

ঈসা (আ) ও তাঁর মা আল্লাহ্ তাআলার মুখাপেক্ষী দুইজন বান্দাহ। তাঁরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। হাশরের দিন তাঁরা অকপটে তা স্বীকার করবেন এবং তাঁদেরকে কেন্দ্র করে যারা বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করেছে—তাঁরা উভয়ে তাদের সাথে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করবেন। কুরআন মজীদের ভাষায় ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَاعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۔ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَالَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ ۔ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ۔ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ۔ مَاقُلْتُ لَهُمْ اِلاَّ مَا اَمَرْتَنِىْ بِهِ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۔

আল্লাহ্ যখন বলবেন, হে ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে—তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে খোদা বানিয়ে নাও? তখন সে উত্তরে বলবে, মহান পবিত্র তোমার সত্তা, এমন কথা বলা আমার কাজ নয়, যা বলার কোনই অধিকার আমার ছিল না। যদি আমি এরূপ কোন কথা বলেই থাকতাম তাহলে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আমার মনের সবকিছুই আপনি জানেন, কিন্তু আপনার মনের কিছুই আমি জানি না। আপনি তো সকল গোপন তত্ত্বকথাই জানেন। আপনি আমাকে যা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি কেবল তাই তাদের কাছে বলছি। আর তা হচ্ছে— তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর—যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব।

—সূরা মাইদা ঃ ১১৬-১৭

বাস্তবতার নিরিখেও ঈসা (আঃ)-কে খোদা হিসেবে মেনে নেওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা করাও সম্পূর্ণ অসঙ্গত যে, তিনি সৃষ্টি করেন, রিযিকের ব্যবস্থা করেন, মৃত্যু দেন, জীবন দেন, বিশ্ববাসীর প্রয়োজন পূরণ করেন, এই বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করেন ইত্যাদি। কেননা জীবনে তিনি একজন দুর্বল বান্দা হিসেবেই ছিলেন। যেসব লোক ঈসাকে প্রভু বলে দাবি করে, তারাও এসব কিছু ভালভাবেই জানে এবং বুঝে, তাই তারা তাঁর মধ্যে খোদায়িত্ব প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সম্পর্ক জুড়ে দেয়। তারা বলে, ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র। এভাবে যেন তিনি তাঁর উত্তরসুরি হলেন। তাদের এই বাজে কথার ভিত্তি এই যে, ঈসা (আঃ) (বিনা বাপে) মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

সত্য কথা এই যে, একজন আবিষ্কর্তা ও তার আবিষ্কার অথবা স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান, আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সৃষ্টিই সমান। আল্লাহ্ তায়ালা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই একে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং এর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেছেন। এ বিশ্বের কোন সৃষ্টিই নিজের উপকার বা অপকার করার শক্তি রাখে না, সে নিজের জীবন-মৃত্যুরও মালিক নয়। জীবিত ও নির্জীব সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র সামনে অবনত হয়ে পড়ে আছে, তাঁর প্রশংসা ও গুণগানে লিপ্ত আছে এবং তাঁর প্রভুত্বের সামনে সিজদারত আছে।

আল্লাহ্ তাআলাই নিজের সৃষ্টির কোনটিকে যমীন, কোনটিকে আসমান, কোনটিকে মাটি, কোনটিকে সোনা, কোনটিকে গাছ, কোনটিকে পশু, কোনটিকে জিন ও 'কোনটিকে মানুষ বানিয়েছেন। এখন যদি তিনি তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকেন তাহলে এটা তাঁর অনুগ্রহই বলতে হবে। তিনি যদি কোন মাখলুককে কম মর্যাদাসম্পন্ন করে থাকেন তাহলে এটাকে তার দূরদর্শিতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই বলতে হবে।

কিছু সংখ্যক ফেরেশ্তা এবং কিছু সংখ্যক মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ যোগ্যতা দান করেছেন, অন্যদের তুলনায় তিনি তাঁদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তিনি নিজের রিসালাত ও দৌত্যকার্যের জন্য তাদের মনোনীত করেছেন। মহান প্রতিপালক প্রভু তাঁর সৃষ্টির সাথে যে কর্মপ্রন্থাই অবলম্বন করুন তাতে বিশ্বজগৎ ও তার ধারকের মধ্যকার সম্পর্কের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। যদি কোন প্রকৌশলী কিছু পাথর ভিত গড়ার জন্য মাটির নিচে স্থাপন করেন এবং কিছু পাথর দিয়ে সুউচ্চ মিনার তৈরি করেন, তাহলে উপরের এই পাথরগুলো কি দাবি করতে পারে যে, তারা স্বয়ং প্রকৌশলী হয়ে গেছে অথবা তার সমান মর্যাদার অধিকারী হয়েছে ?

এটা কত বড় নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত উক্তি যে, কতিপয় সৃষ্টি আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতায় শরীক আছে। এই ধারণা কেমন করে সৃষ্টি হল ? শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ্ করেছিলেন আর তারা এই সুযোগে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছে। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা সম্পর্কে কেমন করে এরূপ ধারণা করা যেতে পারে যে, যেসব কাঠামো তিনিই সৃষ্টি করেছেন—এখন তিনি তার পিতা হয়ে যাবেন ? অধিকন্তু এই বিশাল বিশ্বজগৎ এবং এই বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের কি তুলনা হতে পারে ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۔ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۔

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۔

এরা বলে, রহমানের সন্তান আছে। একথা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তারা তো বান্দা মাত্র, তাদের সম্মানিত করা হয়েছে। তারা তাঁর সামনে

অগ্রসর হয়ে কথা বলে না, কেবল তাঁর নির্দেশমত করে যায়।

—সূরা আম্বিয়া ঃ ২৬-২৭

এই নাদান-মূর্খরা জন্ম ও বংশধারা, নবুয়ত, রিসালাত ইত্যাদি সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে তা খোদায়িত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। খোদায়িত্বের মর্যাদা এর অনেক উর্ধ্বে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٠

> আল্লাহ্ যদি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে চাইতেন, তাহলে নিজের সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতে পারতেন। তিনি এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি তো আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়। তিনি সকলের উপর বিজয়ী। —সূরা যুমার ঃ ৪

(পিতার ঔরস ছাড়া) কেবল মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটাই যদি খোদার বেটা হওয়ার ক্ষেত্রে ঈসার জন্য যথেষ্ট হত এবং এভাবে তিনি উপাস্য হওয়ার অধিকারী হয়ে যেতেন, তাহলে আদম (আঃ) তো তাঁর চেয়েও অধিক হকদার। কেননা তাঁর তো বাপও ছিল না এবং মাও ছিল না। বরং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা তো আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে ঐ মর্যাদার অধিকারী হত। কেননা অতি উর্ধ্ব জগতেই তাদের অবস্থান, এই মাটির জগতে নয়।

একটি ভ্রান্তি

ডঃ শিবল শ্যামুয়েলের ডায়রীতে এক স্বদেশী খৃস্টানের কিছু বক্তব্য পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি একটি মুসলিম নাম নিজের ছদ্মনাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) সম্পর্কে মুসলমান ও খৃস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। এই লেখকের মৌলিক বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম ও খৃস্টান উভয় ধর্মের মধ্যে কতিপয় গূঢ় রহস্য রয়েছে।

একদিকে খৃস্ট ধর্মে ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য এবং রাব্বুল আলামীনের সাথে তাঁর সম্পর্কের ধরনের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে, অপরদিকে ইসলামেও

এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যার মধ্যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। সুতরাং এক্ষেত্রে দু'টি ধর্মের অবস্থাই এক। অতএব ত্রিত্ববাদকে এমন কোন গ্রন্থি মনে করার কোন কারণ নেই, যা আল্লাহ্‌র একত্বের পরিপন্থী হতে পারে।

এই লেখক আরো বলেন, এক আল্লাহ্ যিনি কোন জড়-বস্তু নন—তাঁর সম্পর্কে খৃস্টানদের যে আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে, সে সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতই অবহিত নন-যেভাবে অধিকাংশ খৃস্টান পণ্ডিত মুসলমানদের আকীদা—বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত নন। খৃস্টানদের আকীদাগত দর্শনে কিছুটা কাঠিন্য অনুভূত হওয়ার ভিত্তিতে খৃস্টানরা বলে যে, ধর্মের মধ্যে এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা জ্ঞানবুদ্ধির সীমার উর্ধ্বে। তারা এগুলোকে নিজেদের ধর্মের গৌরবের বিষয় মনে করে। মুসলমানরা মনে করে 'জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা-বহির্ভূত' অর্থ 'জ্ঞানবুদ্ধির পরিপন্থী'। মূলত তা নয়, এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান তার পরিচয় লাভ করতে বা তা অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। এ ধরনের কথা মুসলমানদের মধ্যেও প্রসিদ্ধ।

কিন্তু বর্তমান যুগে তাদেরই একদল লেখক ঘোষণা করছেন যে, একমাত্র ইসলামই বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্ম। তারা একথা ব্যাখ্যায় বলেন, ইসলামের প্রতিটি বিষয়ই মানুষের জ্ঞান অনুধাবন করতে সক্ষম।

কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে, মানুষের জ্ঞান কি করে অদৃশ্য জগতের বিষয়সমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হতে পার ? যেমন বেহেশতের মধ্যকার দুধ ও মধুর প্রস্রবণ, আত্মার জগৎ, ফেরেশতাদের জগৎ ইত্যাদিকে মানুষের জ্ঞান কিভাবে অনুধাবন করতে পার ? তাছাড়া মূসা (আঃ) যে আগুন দেখেছিলেন—তারা এরইবা কি ব্যাখা করবেন ?

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى .

সেখানে পৌঁছলে ডাক দিয়ে বলা হল, হে মূসা! আমিই তোমার রব। তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি তো তুয়া নামক পবিত্র প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছ। —সূরা ত্বাহা ঃ ১১, ১২

আছে কি এমন কোন জ্ঞান এই ডাকের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম—যা মূসা (আঃ) শুনেছিলেন এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন ? আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে মরিয়মের লজ্জাস্থানে ফুঁ দিয়েছিলেন—তা হৃদয়ঙ্গম করার মত কোন জ্ঞানবুদ্ধি বর্তমান আছে কি ? যেমন কুরআন মজীদে এসেছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا ·

আর ইমরান কন্যা মরিয়ম—যে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল, আমরা তার ভেতরে নিজের পক্ষ থেকে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম। —সূরা তাহরীম ঃ ১২

খৃস্টানরা বলে, আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়— যেমন মুসলমানরা বলে থাকে। তারা আরো বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র কলেমা এবং তাঁর রূহ্। মুসলমানরাও একথা বলে। খৃস্টানরা আরো বলে, ঈসা (আঃ) যে আল্লাহ্র রূহ্ এবং তাঁর কলেমা এবং কুমারী মরিয়মের পেটে তা অন্তঃসত্তা হিসেবে স্থান পেয়েছিল, কোন মানুষ তাঁর সতীত্বে হাত লাগাতে পারেনি—মুসলমানরাও এই একই কথা বলে থাকে।

আমি আমার মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তাঁরা যেন সর্বপ্রথম এ সব ব্যাখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নির্ণয় করেন। তাঁরা এ কথাগুলো ভালভাবে বুঝে নেবেন, অতঃপর পিতা-পুত্র, পবিত্র আত্মার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খৃস্টানদের ত্রুটি নির্দেশ করবেন অথবা যে দর্শনের ভিত্তিতে এই তিনটি শব্দ একই তত্ত্ব নির্দেশ করে অথবা একই তত্ত্বের তিনটি রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়— সেই দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন। মূসার আগুনের দৃষ্টান্ত পাঠকদের সামনেই রয়েছে।

এই কথার মধ্যে সুস্পষ্ট ভ্রান্তি রয়েছে। আমরা পূর্বেকার অনুচ্ছেদে আলোচনা করে এসেছি যে, (১) জ্ঞান কোন জিনিসের অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং (২) কোন জিনিসের হৃদয়ঙ্গম করা জ্ঞানের পক্ষে কষ্টকর—এ দুটি কথার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

এই পৃথিবী এবং এর বাইরের অদৃশ্য জগতে এমন অনেক রহস্য লুকায়িত আছে, যার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এর তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা

অবহিত নই। আমরা যদি এর তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষমও হই তাতে এগুলোর অস্তিত্বের ওপর কোন আঘাত আসতে পারে না। অনন্তর এই দৃশ্যমান জগত এবং অদৃশ্যমান জগত—উভয়ের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে— যে সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, এর কোন অস্তিত্ব নেই। এটা গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী নয়। যা সম্ভব কিন্তু কঠিন, আর যা মূলতই অসম্ভব এবং অস্তিত্বহীন—এ দু'টো ব্যাপার কখনো এক হতে পারে না।

তিনকে এক (১) বলা দুই বিপরীত জিনিসের সমন্বয় হওয়ার মতই ব্যাপার। অর্থাৎ এমন দুই বিপরীত জিনিসের একাকার হয়ে যাওয়ার মত, যা কখনো সম্ভব নয়। এটা কোন কঠিন কথা নয়, বরং এমন একটি দাবি যার কোন ভিত্তি নেই।

বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত

ইতিহাস পাঠে আমরা দেখতে পাই, যে ব্যক্তিই খোদায়ী দাবি করেছে তার সমর্থনে কোন দলিল নেই। যাদের সাথে খোদায়ীর দাবি সংযুক্ত করা হয় তারা নিজেরা হয় এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, কিন্তু তাদের ওপর জোরপূর্বক এটা চাপানো হয়েছে, যেমন নবী-রাসূল, ফেরেশতা ইত্যাদি ; অথবা তারা এমন মাখলুকাত, যার কোন অনুভূতি শক্তি নেই, কোন জ্ঞানবুদ্ধিও নেই ; যেমন—পাথর, গরু ইত্যাদি ; অথবা নিকৃষ্ট চরিত্রের শাসক—যেমন মিসরের ফিরাউন বা এ ধরনের মাতাল যারা সরাসরি খোদায়ী দাবি করেছে।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। বাস্তব অবস্থাও তাই। যদি থাকত তাহলে সে আমাদের সামনে তার দাবি পেশ করত। আমাদের এই বস্তুজগতে দ্বিতীয় কোন খোদার অস্তিত্ব থাকত তাহলে সে আমাদের সামনে তাঁর পরিচয় তুলে ধরত। যত নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে তাঁরা সবাই জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা এক লা শারীক আল্লাহ্র তরফ থেকে এসেছেন, যিনি সারা জাহানের রব, প্রতিপালক, পরিচালক। তাঁদের কেউই এমন কথা বলেননি যে, তিনি অন্য কারো কাছ থেকে এসেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰـــهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ‎.

আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাকে এই ওহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব কর। —সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫

যদি দ্বিতীয় কোন ইলাহ্ থাকত তাহলে কে তাঁর বাকশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে যে, সে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ শুনতে পাচ্ছে অথচ নিজের অধিকারহারা হয়ে যাওয়ার অভিযোগটুকুও উত্থাপন করছে না ? সত্য কথা এই যে, গোটা বিশ্বের রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ্। অন্য যত কল্পিত খোদা রয়েছে সেগুলো রুগ্ন চিন্তার অস্থির কল্পনা মাত্র। এগুলো এমন কতগুলো নাম যা অলীক কল্পনার আবিষ্কার মাত্র। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلاَ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ وَ مَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ‎.

জেনে রাখ! আসমানের অধিবাসী হোক কি যমীনের সকলেই এবং সবকিছুই আল্লাহ্র মালিকানাভুক্ত। যারা আল্লাহ্কে ছাড়া নিজেদের মনগড়া শরীকদের ডাকে তারা নিছক ধারণা ও অনুমানের অনুসারী, তারা শুধু কল্পনাই করে। —সূরা ইউনুস ঃ ৬৬

শিরক এবং একাধিক খোদার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা এমন সব তাত্ত্বিক বিষয় যে সম্পর্কে আলোচনা করার কোন অবকাশ নেই। যাকে খোদা বলে মেনে নেওয়া হবে তার মধ্যে এসব গুণ বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। যদি এই বিশ্ব চরাচরে আরো কোন উপাস্য থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ্র তুলনায় তার মর্যাদা কি ? যদি তার মর্যাদা আল্লাহ্র চেয়ে কম হয়ে থাকে তাহলে সে খোদা হতে পারে না। আর যদি তাঁর মর্যাদা আল্লাহ্র চেয়ে অধিক হয়ে থাকে তাহলে সে-ই খোদা

হওয়ার যোগ্য। কিন্তু মর্যাদা যদি সমান সমান হয় তাহলে তাদের দুজনের রাজত্বের সীমা কতদূর ? প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত ? জীবন ও মৃত্যু, ধ্বংস ও কল্যাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের নির্দেশ একই সময় কিভাবে কার্যকর হয় ? এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের ঘোষণা ঃ

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰـهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰـهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔

আল্লাহ্ কাউকেও নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি। আর দ্বিতীয় কোন খোদাও তাঁর সাথে শরীক নেই। যদি তাই হত তাহলে প্রত্যেক খোদা নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত। অতঃপর একজন অপরজনের ওপর চড়াও হয়ে বসত। লোকেরা যা মনগড়াভাবে বলে মহান আল্লাহ্ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। —সূরা মুমিনুন ঃ ৯১

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَـةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۔ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔

যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ্ ছাড়া আরো বহু খোঁদা থাকত তাহলে (আসমান-যমীন) উভয়টির শৃংখলা ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব আরশের মালিক আল্লাহ্ তায়ালা পাক ও পবিত্র সেসব কথা থেকে, যা এই লোকেরা বলে বেড়ায়। —সূরা আম্বিয়া ঃ ২২

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনায় কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে না, কোন রকম ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এই মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক বিধান ঘোষণা করছে যে, তারা একজন স্রষ্টারই সৃষ্টি—যার কোন অংশীদার নেই, যিনি সব কিছুরই মালিক এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔

তোমাদের খোদা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি মেহেরবান এবং দয়ালু। —সূরা বাকারা ঃ ১৫৩

খালেস তৌহীদ

জোরপূর্বক যাদেরকে খোদার আসনে নিয়ে বসানো হয়েছে ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় সেগুলোর মূল্যায়ন করার পর আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমরা আত্মবিশ্বাস সহকারে বলতে পারি যে, এ বিশ্বে এমন কোন জিনিস নেই যা মহান ও পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র সামনে একটি নগণ্য বান্দা ছাড়া আর কিছু হতে পারে।

কিন্তু মানুষ এক অদ্ভুদ জীব। সে মনের গভীরে এটা অনুভব করে, সে প্রকৃতির ডাক শুনতে পায়, তার স্বভাব-প্রকৃতি তাকে বারবার ডেকে সেই এক ও অদ্বিতীয় মহান সত্তার তৌহীদের ঘোষণা দিচ্ছে, কিন্তু তবুও সে হকের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছে। সে এই তৌহীদের মধ্যে এমন ভেজাল আমদানি করছে যার ফলে তার স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, তার ভিত্তিমূল ফাঁপা হয়ে পড়ছে।

ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সব মানুষই একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ তাআলাই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। যেসব খৃস্টান ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্র সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছে তারা দাবি করছে না যে, ঈসা (আঃ) আসমানের কোন অংশ নির্মাণ করেছেন, অথবা যমীনের বুকে কোন পাহাড় দাঁড় করে দিয়েছেন, অথবা একদল মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, অথবা কোন ক্ষেতের শস্যবীজের অংকুরোদগম করে দিয়েছেন অথবা কোন ফলের বাগান সৃষ্টি করেছেন। কখনো নয়, কখনো নয়, একমাত্র আল্লাহ্ই এসব কিছুর স্রষ্টা মালিক ও মনিব।

এই স্বীকৃতির পরও তারা একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্র ইবাদত করছে না, একাগ্র মনে তাঁর আনুগত্য করছে না। তারা নিজেদের ফিতরাতের এই সাক্ষ্য শুনছে, কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করছে না। তারা নিজেদের মানত ও আনুগত্য গায়রুল্লাহর্ খিদমতে পেশ করছে। এই গায়রুল্লাহ্ কে ? এসব লোকের চেহারা তার দিকে ঝুঁকে কেন ? মুশরিকরা এর ব্যাখ্যায় বলে যে, তারা খোদা থেকে দূরে সরে যায়নি, বরং তারা যাদের দিকে নিজেদের মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দিয়েছে তারা মূলত

সেই মহান উপাস্যের মহিমামণ্ডিত প্রাসাদেরই চাবি। তারা এদের কাছে শুধু এই উদ্দেশ্যেই গিয়েছে যে, এরা তাদেরকেই সেই মহান প্রভুর কাছে পৌঁছে দেবে।

তারা বলে, কোন পাথর অথবা মানুষকে সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিকদাতা হিসেবে মেনে নেব এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করব—এতটা দুঃসাহস আমাদের নেই। আমরা তাঁর পুত্র-কন্যাদের তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ লাভের উসিলা বানিয়েছি মাত্র। কুরআনের ভাষায় ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ‐

> আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে (এবং নিজেদের এ কাজের ব্যাখ্যা দেয় এই বলে যে,) আমরা তো এদের ইবাদত করি কেবল এইজন্য যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। —সূরা যুমার ঃ ৩

তাদের এই ভূমিকা কত অবাঞ্ছিত এবং লজ্জাকর। আল্লাহ্‌র পুত্র-কন্যা বলতে কিছুই নেই। আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোন মাধ্যম, কোন সুপারিশকারী বা কোন মধ্যস্বত্বভোগী নেই। প্রতিটি মানুষেরই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে নিজের আবেদন পেশ করার অধিকার রয়েছে। সে কোন অপরাধ করে বসলে সরাসরি নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু অপর কোন ব্যক্তির এরূপ শক্তি নেই যে, সে অন্যের গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে অথবা ক্ষমা করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সৃষ্টির সূচনা থেকে আল্লাহ্ তাঁর নবী-রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর মনোনীত দীন পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর ও বান্দাদের মধ্যকার সরাসরি সম্পর্কের কথাও বলে দিয়েছেন। সত্যিই যদি আল্লাহ্‌র পুত্র-কন্যা থাকত—যদিও তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র —তাহলে এদের উপাসনা করতে আমাদের কি ক্ষতি ছিল ? কুরআনের বাণী ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ ‐

বল (হে মুহাম্মদ) ! দয়াময় রহমানের যদি কোন পুত্র-সন্তান থাকত তাহলে আমিই সর্বাগ্রে তার ইবাদত করতাম।

—সূরা যুখরুফ ঃ ৮১

স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস একটা ভ্রান্তি, প্রতারণা এবং তাঁর প্রতি অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আবর্জনার মধ্যে আমরা নিজেদের কি করে নিক্ষেপ করতে পারি ? দুঃখের বিষয়, মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার ওপর এই অপবাদ চাপাল এবং তাঁর অংশীদার ও তাঁর দরবারে সুপারিশকারী নির্দিষ্ট করে নিল তখন এই ভ্রান্তির পরিণতিতে তারা অনবরত অন্ধকার ও অধঃপতনের অতল গহবরে তলিয়ে গেল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌কেই ভুলে গেল এবং তাঁকে বাদ দিয়ে যেসব নবী, ওলী-দরবেশ অথবা মূর্তিকে উসিলা বানিয়ে নিয়েছিল তাদের স্মরণেই তারা এখন আনন্দ পেতে লাগল। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ·

যখন একাকী আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, তখন আখেরাতের প্রতি বেঈমান লোকদের দিল ছটফট করতে থাকে। আর যখন তাঁকে ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করা হয় তখন সহসা তারা আনন্দে হেসে উঠে।

—সূরা যুমার ঃ ৪৫

এভাবে তাদের মনগড়া মূর্তি ও দালালগুলো সিংহের মত তাদের ইবাদত, ন্যায়নিষ্ঠা, নযর-নিয়াজ, প্রার্থনা, ভালবাসা, বন্ধুত্ব সবকিছুতেই ভাগ বসাল এবং আল্লাহ্‌র জন্য এর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ · سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ·

এই লোকেরা আল্লাহর জন্য তাঁর নিজেরই সৃষ্টি করা ক্ষেত-খামারের ফসল এবং গৃহপালিত পশু থেকে একটা অংশ নির্দিষ্ট করেছে। অতএব তারা বলে, এটা আল্লাহ্র জন্য—এটা তাদের নিজস্ব ধারণা অনুমান মাত্র—আর এটা আমাদের বানানো শরীকদের জন্য। কিন্তু যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য তা আল্লাহ্র কাছে পৌছায় না। অথচ যা আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের পর্যন্ত পৌছে যায়। কতইনা খারাপ এই লোকদের ফয়সালা।

—সূরা আনআম ঃ ১৩৬

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنِّىْ وَالْاِنْسَ وَالْجِنَّ فِىْ نَبَاءٍ عَجِيْبٍ اَخْلُقُ وَيُعْبَدُ غَيْرِىْ وَاَرْزُقُ وَيُشْكَرُ سِوَاىَ ·

আমার এবং মানুষ ও জিনের ব্যাপারটি কি কম আশ্চর্যজনক! সৃষ্টি করছি আমি আর ইবাদত করা হচ্ছে অন্যের। রিযিক দিচ্ছি আমি আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে অন্যের কাছে।

আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে এই আবর্জনা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, তা মানুষের জীবনযাত্রা ও যাবতীয় কার্যকলাপকে পুতিগন্ধময় করে দিয়েছে। এই বিশ্ব চরাচরে তৌহীদের আলোকপ্রভা দৃষ্টিগোচর হবে না—এর চেয়ে বড় অন্ধত্ব আর কি হতে পারে! আমরা যখন দেখি দুনিয়ার বুকে কত শত জাতি এই শক্তি-সামর্থ্যহীন মূর্তিগুলোর পূজায় ফেঁসে গেছে তখন আমাদের খুবই দুঃখ হয়। অনুরূপভাবে এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে এই অংশীবাদী খৃস্টবাদ মজবুতভাবে নিজের শিকড় গেড়ে আছে এবং মানুষ অত্যন্ত নিকৃষ্ট পন্থায় অলীক ধারণা অনুমান ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ·

তাদের অধিকাংশ লোকই আল্লাহ্র ওপর ঈমান রাখে না, বরং তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে আছে। —সূরা ইউসূফ ঃ ১০৬

একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, এই শিরকের রাজত্বই অথবা এর প্রাধান্যই দুনিয়ার বুকে নাস্তিক্যবাদের জন্ম দিয়েছে। এরই কারণে আল্লাহ্কে অস্বীকার করার এবং ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার দরজা খুলে গেছে।

মূর্তি ও মূর্তিপূজক

মহামহিম আল্লাহ্ নাদান মুশরিকদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার ইচ্ছা করলেন যে, তারা যেগুলোর উপাসনা করে তার মর্যাদা কি ? অতএব এই কল্পিত মূর্তি বা উপাস্যগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

এক. পাথরের মূর্তি। এ ক্ষেত্রে উপসনাকারীরাই তাদের কল্পিত উপাস্যদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কেননা তাদের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবকিছুই আছে। এর সাহায্যে তারা যেকোন কাজ করতে পারে। কিন্তু এই পূজ্য দেবতা ? এর কাছে কি আছে ?

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؟

এদের কি পা আছে, যাতে ভর করে এরা চলতে পারে ? এদের কি হাত আছে, যার সাহায্যে এরা ধরতে পারে ? অথবা এদের কি চোখ আছে, যার সাহায্যে এরা দেখতে পারে ? অথবা এদের কি কান আছে, যার সাহায্যে এরা শুনতে পারে ?—এদের কাছে এগুলোর কিছুই নেই। —সূরা আরাফ ঃ ১৯৫

দুই. অথবা মনে করা যাক এই মনগড়া দেবতাগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিশক্তি আছে। এক্ষেত্রে উপাসনাকারী ও উপাস্য উভয়ই সমান শক্তিশালী। তাহলে এই দেব-দেবীর প্রাধান্য কোথায় ? পূজারী ও পূজ্য দেবতা শক্তি-সামর্থ্য ও মর্যাদার দিক থেকে যদি সমকক্ষ হয়ে যায় তাহলে এই খোদায়ীর অবস্থাটা কি হতে পারে ?

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ·

আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাক তারা তোমাদের মতই বান্দামাত্র। তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্যই হয় তাহলে

তাদের ডেকে দেখ না তারা তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে প্রমাণ করুক। —সূরা আরাফ ঃ ১৯৪

এটা মানব স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যে, সে এমন খোদার সামনে মাথা নত করবে—যে তাঁর তুলনায় কম অথবা সমান যোগ্যতাসম্পন্ন। যদি এগুলোকে ডাকা হয় তাহলে শুনবার শক্তি রাখে না, যদি শুনেও থাকে তাহলে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।

انْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَائَكُمْ . وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ . وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ . وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ .

যদি তোমরা এদের ডাক তাহলে এরা তোমাদের দোয়া শুনতে পায় না, শুনলেও তোমাদেরকে এরা কোন জবাব দিতে পারে না। কিয়ামতের দিন এরা তোমাদের শিরকী কাজকে প্রত্যাখ্যান করবে। প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে এমন নির্ভুল খবর একজন ওয়াকিফহাল সত্তা ছাড়া আর কেউই তোমাদের দিতে পারে না। —সূরা ফাতির ঃ ১৪

এজন্য মানব-স্বভাব এ ধরনের ভ্রান্তি এবং অলীক কল্পনা ও কুসংস্কারের মাঝে ঘুরপাক খেতে পারে না। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যাপার। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করা হয়েছে, মানুষের অনুভূতিকে খোঁচা দিয়ে সজাগ করা হয়েছে—যেন সে শিরকের অন্ধকার কূপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। শিরকের পরিণতি সম্পর্কে কুরআন মজীদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ যদি তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি শিরকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। কুরআন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও তার আবেগ-অনুভূতিকে সম্বোধন করেছে ঃ

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

একাধিক প্রভু উত্তম অথবা একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ? —সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ۔

আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক ব্যক্তি তো সেই (গোলাম) যার মালিকানায় বহু সংখ্যক বাঁকা স্বভাবের মনিব শরীক আছে। এরা তাকে স্ব স্ব দিকে টানছে। আর অপর ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে একই মনিবের গোলাম। এই দুজনের অবস্থা কি কখনো এক রকম হতে পারে ? যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে আছে। —সূরা যুমার ঃ ২৯

সত্যকথা এই যে, তৌহীদই হচ্ছে ইসলামের প্রাণ, এর আকীদা-বিশ্বাসের অলংকার এবং এর ইবাদতের মেরুদণ্ড। এই তৌহিদী প্রাণ ইসলামের গোটা শিক্ষার মধ্যে এমনভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে যেমন গাছপালা ও লতা-পাতার মধ্যে পানি প্রবহমান রয়েছে এবং দেহের মধ্যে শিরা-উপশিরা ছড়িয়ে আছে।

কুরআন মজীদ তৌহীদের ওপর ব্যাপক আলোচনা করেছে, এর প্রতিটি দিক পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং যেসব জিনিস তৌহীদের জন্য ক্ষতিকর অথবা তৌহীদের পরিপন্থী, তাও চিহ্নিত করে দিয়েছে। বলতে গেলে ইসলামের শিক্ষায় তৌহীদকে যেভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে—দুনিয়ার আর কোন ধর্মেই তা দেখা যায় না। ইসলাম গোটা বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদতে মগ্ন করার চেষ্টা করেছে এবং এমন সব দৃষ্টিভঙ্গী ও ঝোঁক প্রবণতার মূলোচ্ছেদ করেছে যা মানুষকে অন্য জিনিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। এটা ইসলামের মৌলিক ও প্রধান শিক্ষা। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ ۔ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۔

বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন। তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। কেউই এসব জালিমের সাহায্যকারী হবে না। —সূরা মাইদা ঃ ৭২

একমাত্র আল্লাহ্‌ই ক্ষতি বা উপকার করার মালিক। অপমানিত বা মর্যাদাবান করার মালিকও তিনি। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন, যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। আসমানের ফেরেশতাই হোক অথবা কোন নবী—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার অধিকার নেই। তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়। আল্লাহ্‌র ওলীই হোক অথবা তাঁর দুশমন—কারো ইচ্ছা-বাসনাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকেই পরাভূত করতে পারে না। এজন্য আমাদের সামর্থ্যের বাইরের ব্যাপারসমূহেও কেবল আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখাও নির্ভেজাল তৌহীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকেই ভয় করতে হবে, তাঁর কাছেই কোন কিছু পাওয়ার আশা রাখতে হবে।

لَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ؟

আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন ? —সূরা যুমার ঃ ৩৬

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۔

তাদের বল ! তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ্ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তাহলে তোমাদের এই দেবীরা—যাদের তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ডাকছ—আমাকে তাঁর ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে ? অথবা আল্লাহ্ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তাহলে এরা কি তাঁর রহমতকে প্রতিরোধ করে রাখতে পারবে ? বল, আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট। ভরসাকারী লোকেরা তার ওপরই ভরসা করে।

—সূরা যুমার ঃ ৩৮

মুমিন ব্যক্তির একটি মাত্র কিবলা, সেদিকেই সে নিজের চেহারা ফিরিয়ে রাখে। এটাই তার আকীদা-বিশ্বাস ও ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু। সেদিকে ফিরেই সে মুনাজাত করে, জীবনের অন্ধকারে এখান থেকেই আলো গ্রহণ করে।

মুমিনের আসল সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে। এর ভিত্তিতেই সে লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। যে কোন মুমিনের মধ্যে আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, ভালবাসা-ঘৃণা এবং পশুত্ব ও মুনষ্যত্বের আবেগ জাগ্রত হয়। এই আবেগ তার মনে যতই উত্তেজনা সৃষ্টি করুক—সে সর্বদা আত্মবিশ্বাসের ভিত্তির ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মারিফাতে ইলাহীর আলোকে এই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা শক্তিশালী করে। ইমামুল আম্বিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর তাহাজ্জুদের নামাযে নিম্নের দোয়া পাঠ করতেন এবং মুমিনদের মনে এর ভাব-গম্ভীরতা প্রবিষ্ট করাতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ٠

হে আল্লাহ্! আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, তোমারই ওপর ঈমান আনলাম, তোমার ওপরই আমার ভরসা, তুমিই আমার প্রত্যাবর্তন স্থল। তোমার জন্যই ঝগড়ায় লিপ্ত হই, তোমারই হাতে আমার ফয়সালা। আমি আগে ও পরে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে যে অপরাধ করে ফেলেছি তুমি তা মাফ করে দাও। এ সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক অবগত। সম্মান ও অপমান এবং উন্নতি ও অবনতি তোমারই হাতে। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

এই অনুনয়-বিনয়, আনন্দ ও ভালবাসার এই অস্থিরতা পরিপূর্ণ তৌহীদের নিদর্শন। দেহের শিরা-উপশিরায় যখন তা প্রবাহিত হয় তখন কলব ও আত্মার জগতে জীবনের বসন্ত এসে যায়। মন যদি আবেগশূন্য হয়ে যায়, তাহলে আত্মার অপমৃত্যু ঘটে এবং তা এমনভাবে অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে, এরপর আর অধিক অন্ধকারের ধারণাই করা যায় না।

আমরা এ জগতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের মূল্য ও আমাদের বিশেষত্ব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। যেমন পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য ও তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের সামনে ভেসে উঠে। এ বিশ্বের অলৌকিক নিদর্শনগুলো সদাসর্বদা আমাদের যেসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করছে তার মাধ্যমে আমরা ঈমান ও কুফর, নিষ্ঠা ও নিফাক (কপটতা) এবং খাঁটি ও ভেজালের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ·

আর আমরা ভাল ও মন্দ অবস্থায় নিক্ষেপ করে তোমাদের সকলের পরীক্ষা করছি। অবশেষে তোমাদের সবাইকে আমাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে। —সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৫

যখন তুমি দেখতে পাও, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র চেয়ে গায়রুল্লাহ্‌কেই অধিক ভালবাসে, তার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ের তুলনায় মানুষের ভয়ই অধিক প্রবল, তার অন্তর মানুষের প্রতিপালকের তুলনায় মানুষের প্রতিই অধিক আকর্ষণ বোধ করে, তার কার্যকলাপের লক্ষ্য থাকে মানুষকে সন্তুষ্ট করা, আখেরাতের সওয়াব অর্জন করা নয়, তার ওপর কোন বিপদ এসে পড়লে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ লোককে স্মরণ করে, সে যদি কোন ব্যাপারে সফলকাম হতে পারে তাহলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়— তখন বুঝে নেবে যে, এই ব্যক্তি প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত রয়েছে।

যদিও একদল আলেমের বক্তব্য হচ্ছে, আকীদাগত শিরকের মত কর্মগত শিরক অতটা মারাত্মক নয়—আকীদাগত শিরক যতটা মারাত্মক, কার্যকলাপের মধ্যে সংঘটিত শিরক তার চেয়ে অনেক হালকা প্রকৃতির। কিন্তু ব্যাপারটা তারা যত সহজ মনে করেছেন আসলে তা এত সহজ নয়।

মূলত শিরক হচ্ছে আবর্জনায় পরিপূর্ণ চরম দুর্গন্ধময় একটি কূপ বিশেষ। যখন তা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় তখন তা প্লাবনের চেয়েও দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয় এবং ঈমানের যাবতীয় সৌন্দর্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর ঈমানের নামগন্ধও অবশিষ্ট থাকে না। তাঁরা যেটাকে হালকা শিরক বলে

ব্যাখ্যা করেন তা মারাত্মক শিরকের রূপ ধারণ করে নেয়। ইসলাম এই শিরককে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। কবি বলেন ঃ

ছোট ছোট বিষয়গুলো
জন্ম দেয় বড় বড় বিষয়ের ....।

ইসলাম এক যুগে লাত, মানাত ও উয্যা নামক দেব-দেবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এই যুদ্ধের সম্পর্ক এগুলোর দৈহিক সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। এর সাথে ইসলামের কোন ব্যক্তিগত দুশমনী ছিল না। এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, এই মূর্তিগুলো নিজেদের অনুসারীদের মনে যে মর্যাদার আসন গেড়ে নিয়েছিল তা কেবল অধীনস্থ গোলামরাই তাদের মনিবের জন্য কল্পনা করতে পারে।

অতএব এমন প্রতিটি জিনিস যা মানুষকে খোদার স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয় তা এক একটি প্রতিমা হিসেবে গণ্য হতে পারে। মুশরিকদের অন্তরে প্রাচীন কালের এই মূর্তিগুলোর যে মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল বর্তমানেও কোন জিনিস যদি কোন ব্যক্তির অন্তরে অনুরূপ মর্যাদার আসন পায় তাহলে সেও উল্লিখিত হুকুমের আওতায় পড়বে। এসব লোক তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদেরই সাথে এদের হাশর হবে। এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয় যে, কেবল শরাবই হারাম করা হয়নি, বরং নেশা উদ্রেককারী যেকোন ধরনের পানীয়ই হারাম করা হয়েছে। ঈমানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় না, যদিও যুগে যুগে ঈমান বিধ্বংসী ফিতনার রূপ পরিবর্তন হয়েছে।

তৌহীদের ত্রুটিপূর্ণ আকীদা

আত্মসমর্পণ, ইখলাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শের দিক থেকে মুসলিম উম্মাহর একটি দৃষ্টান্তমূলক জাতি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করছি যে, মুসলমানদের সর্বাধিক সংখ্যক লোক এমন কাজে লিপ্ত রয়েছে যার ফলে চিন্তার জগতে তাদের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মীয় অধঃপতন ঘটেছে, আকীদা-বিশ্বাস বিকৃত হয়ে গেছে এবং কর্মক্ষেত্রে সীরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে ।

এসব কারণ নির্ণয় করতে আমরা কখনো গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে চাই না। কেননা তৌহীদের ভিত্তিমূলের কোথাও ফাটল সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এই সত্যনিষ্ঠ দীনের মধ্যে চিন্তাগত নেতৃত্বের যে মূল কেন্দ্র রয়েছে তা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থেকে যাওয়া। নিঃসন্দেহে তৌহীদই হচ্ছে ইসলামের রূহ ও প্রাণসত্তা, এর আঙ্গিনা ও স্তম্ভ, এর পথপ্রদর্শক ও গন্তব্যস্থল এবং এর শুরু ও শেষ।

মানুষকে অপবাদ দেওয়ার আমাদের কোন আগ্রহ নেই অথবা কুফরী ফতোয়া দেওয়াও আমাদের অভ্যাস নয়। অবৈধ পন্থায় অপরের অধিকার খর্ব করা আমাদের নীতি নয়। কিন্তু আমাদের সামনে এমন কতগুলো জিনিস রয়েছে যার দাবি এই যে, আমরা একটু থেমে যেন এর মূল্যায়ন করি। এ ব্যাপারে সুদপদেশ দেওয়ার হকটুকু যেন আদায় করি এবং কিতাব ও সুন্নাহর পথ থেকে বিচ্যুতি দেখতে পেলে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মিসরের দিকে যখন সমাজতন্ত্রের সয়লাব আসতে শুরু করল, তখন বৃটিশ সরকারের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল এবং সে এদেশের ধর্মীয় অবস্থা যাচাই করতে চাইল। সে যখন দেখল, এ বছর তিরিশ লাখ লোক আহ্মাদ বাদাবীর কবর যিয়ারত করতে তানতা গেছে, তখন সে আশ্বস্ত হল। যেসব লোক তাঁর কবর যিয়ারত করতে গেছে, আমি (লেখক) তাদের সম্পর্কে অনবহিত নই। কয়েকবার আমি তাদের সেখানে ওয়াজ-নসিহত করেছি। এ সময় আমি সেখানে এমন সব জঘন্য কাজ হতে দেখেছি যার প্রতিরোধের জন্য কোন হুমকি, তিরস্কার ও মৌখিক সতর্কীকরণই যথেষ্ট ছিল না, বরং বেত্রাঘাতের প্রয়োজনও অনুভূত হয়। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলামের মর্যাদা, ধর্মীয় শিষ্টাচার ও শরীআতের আইন-কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এদের বাস্তব অবস্থা এই যে, তাদেরকে যদি সঠিক দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান করা হয়, তাহলে তারা দ্রুত পলায়ন করবে। কিন্তু তাদেরকে যদি বিদআতের দিকে আহবান করা হয়, তাহলে এরা পঙ্গপালের চেয়েও দ্রুতগতিতে সেদিকে ছুটে আসবে। তাদের অবস্থা এই যে, তারা নিজেদের মানত পুরা করার জন্য এবং নিজেদের আবেদন-নিবেদন পেশ করার জন্য এই কবরের কাছে সমবেত হয়। এই মানত ও আরাধনা কার উদ্দেশ্যে ছিল ? প্রথম নম্বরেই সায়্যিদ বাদাবীর জন্য ছিল। তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে তারা বলে,

সায়্যিদ বাদাবীর মাধ্যমে তারা এই নযর-নিয়ায মূলত আল্লাহ্‌র কাছেই পেশ করছে। এই বিভ্রান্তের মধ্যে যারা অধিক মাত্রায় পথভ্রষ্ট তারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌কে ভাল করেই চিনি এবং আমরা এও জানি যে, আওলিয়াগণ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র বান্দা। তাঁরা আমাদের তুলনায় অধিক পাক-পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য তাদেরকে উসিলা হিসেবে গ্রহণ করি মাত্র।

ইসলামের দৃষ্টিতে এটা ভ্রান্ত কথা তাতে সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কাছে কখনো এরূপ দাবি করেননি যে, তোমাদের সাথে আরো কিছু লোক নিয়ে আমার কাছে আস। তারা আমার কাছে তোমাদের সৎ কাজগুলো জমা দেবে এবং পাপ কাজগুলো মাফ করিয়ে নেবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ .

এরা কি খোদার এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে, যারা এদের জন্য দীনের মধ্যে কোন আইন-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে—আল্লাহ্ যার কোন অনুমতি দেননি? —সূরা শূরা ঃ ২১

বরং এটা তো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক এবং বুনিয়াদী কথার অন্তর্ভুক্ত যে, চাওয়া-পাওয়ার জন্য, নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি আল্লাহর কাছে আবেদন করতে হবে, মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজন নেই।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ .

আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমার কাছেই সাহায্য চাই। —সূরা ফাতিহা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِذَا سَئَلْتَ فَسْئَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ .

যখন কিছু চাও—সরাসরি আল্লাহর কাছে চাও, আর যখন সাহায্যের প্রয়োজন তখন সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও।

এটা কি হাস্যকর কথা নয় যে, আমরা এমন লোকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব যারা নিজেরাই সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং এমন লোকদের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করব যারা নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করানোর জন্য এবং কল্যাণ লাভের আশায় স্বয়ং উসিলা করে বেড়ায়? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ .

এরা যাদের ডাকে তারা নিজেরাই তাদের খোদার কাছে পৌছবার উসিলা তালাশ করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং তারা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী ও তাঁর শাস্তিকে ভয়কারী।

— সূরা ইসরা ঃ ৫৭

মুসলমানদের ওপর দিয়ে এমন একটি কাল অতীত হয়েছে যে, তারা মহাসত্যকে ভুলে গেছে। কোন ব্যক্তি যদি কোন সামান্য জিনিস সম্পর্কে অনবহিত থাকে বা কোন মামুলী জিনিসের অনুসরণ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার ওজর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু সে যদি তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলে এবং ঈমানের মহামূল্য সম্পদ সম্পর্কেই বেখবর থাকে, তাহলে এটাই তো কিয়ামত। কুরআনে হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তৌহীদ সম্পর্কিত এই ভ্রান্তির প্রতিবাদ করেছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰؤُلَاۤءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ . قَالُوْا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاۤءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا .

সেদিন (তোমাদের প্রতিপালক) তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করেছে—তাদেরকে একত্র করবেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার এই বান্দাদের গোমরাহ

করেছ না এরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে ? তারা বলবে, পবিত্র মহান আপনার সত্তা! আমরা আপনাকে ছাড়া অপর কাউকে আমাদের অভিভাবক প্রভু, বানাবো—সেই সাধ্য আমাদের ছিল না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আপনি এদেরকে এবং এদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছিলেন। ফলে তারা আসল শিক্ষা ভুলে গেছে এবং ভাগ্যাহত হয়ে পড়েছে। — সূরা ফুরকান ঃ ১৭, ১৮

হাঁ আসলেই তারা যিকির ভুলে গেছে এবং এদের তারা যিকিরের ভিত্তি তৌহীদকেও ভুলে গেছে। মনে রাখতে হবে এখন প্রতিরোধের জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, তারা আল্লাহ্কে জানে। তারা আরো জানে যে, কেবল আল্লাহ্ তাআলাই দোয়া কবুল করার ক্ষমতা রাখেন, তিনিই নিয়ামত দানকারী এবং তিনি ছাড়া অন্য যারা রয়েছে তাদের এ ধরনের কোন ক্ষমতা বা এখতিয়ার নেই। তাদের এই জানাটা মোটেই বিবেচনাযোগ্য হবে না যতক্ষণ তারা আল্লাহ্কে নিজেদের অভিনিবেশের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে না নেবে, একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করবে এবং দোয়া ও মুনাজাত তাঁরই কাছে না করবে। কেননা প্রাচীনকালের মুশরিকরাও আল্লাহ্ তাআলাকে এ পরিচয়ে জানত। যেমন কুরআনের বাণী ঃ

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ .

তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের কে রিযিক দান করে ? এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার মালিকানাধীন ? নির্জীব নিষ্প্রাণ থেকে কে জীবন্তকে বের করে এবং সজীব থেকে কে নির্জীবকে বের করে ? এই বিশ্বের ব্যবস্থাপনা কে পরিচালনা করছে ? জবাবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। —সূরা ইউনূস ঃ ৩১

লক্ষ্য করার বিষয়, তারা পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ্র নাম নিচ্ছে, কিন্তু এই মৌখিক বক্তব্যের ভিত্তিতে তাদেরকে মুমিনদের মধ্যে গণ্য করা হচ্ছে না।

এজন্য যে, তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্কে জানত তাহলে যেসব বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট-সে ব্যাপারে তাদের মনে অন্যের ধারণা কেন আসবে ? এতটুকু বলেই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি, বরং আরো প্রশ্ন রাখছে ঃ

فَقُلْ اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ ۔ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۔ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا اَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ۔

বল, তাহলে তোমরা (এই মহাসত্যের বিপরীত আচরণ থেকে) কেন বিরত থাক না ? এই আল্লাহ্ই তোমাদের প্রকৃত খোদা। তাহলে মহান সত্যের পর সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে ? তোমাদেরকে কোথায় এবং কোন দিকে ঘোরাফেরা করতে বাধ্য করা হচ্ছে ? এরূপ নাফরমানীর নীতি অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য প্রমাণিত হল যে, তারা মোটেই ঈমান আনবে না। —সূরা ইউনূস ঃ ৩১-৩৩

আমাদের জনসাধারণ রীতিমত সফর করে এমন সব কবরের দিকে ছুটে যায়, যার মধ্যে বিগলিত হাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা এসব কবরের বাসিন্দাদের আল্লাহ্র রাজপ্রাসাদের দরজা মনে করে এবং নিজেদের নযর-নিয়ায, আবেদন-নিবেদন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। নিঃসন্দেহে তারা ইসলামের নামে এসব কাজ করে চরম অপরাধ করে যাচ্ছে। আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের এসব কাণ্ড-কারখানা দেখি না কেন, তার মধ্যে এমন কোন দিক নেই যার ওপর কোন মুমিন ব্যক্তির অন্তর সান্ত্বনা লাভ করতে পারে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেক কাজের প্রতি আকর্ষণ এবং পাপ কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ ইসলামের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আকর্ষণ ও ঘৃণার ধরনটা কিরূপ হয়ে থাকে তা কারো গোপন নয়। নেক কাজের প্রতি আকর্ষণের অর্থ হচ্ছে যদি এসব বুযুর্গ লোক জীবিত থেকে থাকেন তাহলে তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখতে হবে, আর যদি মরে গিয়ে থাকেন তাহলে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণার অর্থ হচ্ছে- নিকৃষ্ট

প্রকৃতির লোকেরা যদি জীবিত থেকে থাকে তাহলে এদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং যদি এরা মরে যায় তাহলে এদের প্রতি অভিসম্পাত করতে হবে। আজকাল মুসলমানরা যা করছে —আকর্ষণ ও ঘৃণার অনুভূতির সাথে এর কি কোন সম্পর্ক আছে ?

তাদের কারো কারো অবস্থা এই যে, তারা দুষ্কর্মের মধ্যে ডুবে আছে, পিতামাতার জীবিত থাকা অবস্থায়ই তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছে এবং নিকৃষ্ট লোকেরাই এদের বন্ধু। কিন্তু এরাই যখন নেককার লোকদের কবরের কাছে যায়, তখন এদেরকে খুবই সক্রিয় দেখা যায়। তারা কবরবাসীদের দোয়া করার উদ্দেশ্যে সেখানে যায় না, বরং তাদের কাছে এমন সব পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভ করার জন্যে প্রার্থনা করতে যায় যে, তারা নিজেরাই যার মুখাপেক্ষী। এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট গোমরাহী ।

নেককার লোকদের কবরের ওপর ইবাদতখানা নির্মাণের এই প্রথা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। কুরআন মজীদ থেকে জানা যায়, পূর্বেকার জাতিসমূহের মধ্যে এই মারাত্মক ব্যাধি সাধারণভাবেই প্রচলিত ছিল। গুহাবাসীদের ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا . رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ . قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا .

> তারা বলল, এদের ওপর একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দাও। এদের প্রতিপালকই এদের ব্যাপারটি ভাল জানেন। কিন্তু যেসব লোক কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল তারা বলল, আমরা এদের ওপর একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করব। —সূরা কাহ্ফ : ২১

সে যুগে সম্ভবত প্রতিকৃতি নির্মাণের মতই কবরের ওপর ইবাদতখানা নির্মাণ করাও জায়েয ছিল। কেননা তার সাথে তখনো শেরেকী আবেগ সংযুক্ত হয়নি। পরবর্তীকালে লোকেরা গোমরাহীর পথ অনুসরণ করল। যেসব পাথর তারা নিজেদের বুযুর্গ লোকদের নামে খোদাই করেছিল, পরবর্তীকালে সেগুলোই তাদের খোদা হয়ে বসল এবং রীতিমত এগুলোর পূজা উপাসনা হতে লাগল অথবা তাদের ভাষায় এরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়ে গেল।

নেককার লোকদের কবরের ওপর তারা যেসব ইবাদতখানা নির্মাণ করেছিল, এর সাথে সম্মান ও পবিত্রতার এমন সব রীতিনীতি সংযুক্ত হল যে, এগুলোও শেষ পর্যন্ত মূর্তির মর্যাদায় উন্নীত হল।

এজন্যই ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে সে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং শিরকের যাবতীয় নিদর্শন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্য জোর তৎপরতা চালায়। কে না জানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উচ্চ কবর সমতল করে দেওয়ার জন্য এবং মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার জন্য এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি উচ্চ কবরগুলো এবং বেদীতে স্থাপিত মূর্তিগুলোকে গোমরাহীর দৃষ্টিতে সমান বিবেচনা করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের এসব আহাম্মকী কাজের উল্লেখপূর্বক নিজের উম্মাতকে তাদের রাস্তা অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ۰ اَلاَ لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ هٰذَا ۰

য়াহূদী-খৃষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা নিজেদের নবীদের কবরসমূহ সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত কর না। আমি তোমাদের তা করতে নিষেধ করছি। —মুসলিম

মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত অবস্থায় তিনি নিজের মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরাতেন আর বারবার এ সম্পর্কে সতর্ক করতেন। পরবর্তীকালে যেসব বিপর্যয় ও বিশৃংখলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে খুব সম্ভব তিনি অনুমান করছিলেন। সুতরাং মৃত্যুসয্যায় সেই মুমূর্ষ অবস্থায় তিনি এ দোয়াও করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِىْ مِنْ بَعْدِىْ وَثَنًا يُّعْبَدُ ۰

হে আল্লাহ্ ! আমার মৃত্যুর পরে আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করো না যে, তার পূজা করা হবে।

এই পাপ কাজের বিরুদ্ধে ইসলামে এত অধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্তমান রয়েছে যে, আমাদের সতর্ক করার জন্য তা যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা বুযুর্গ লোকদের কবরের ওপর মসজিদ ও মাযার নির্মাণ করতে লাগল। মাযার নির্মাণে তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হল। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, এখন কাল্পনিক মাযার নির্মিত হতে লাগল। এমন কত মাযার রয়েছে যা গাছ-পাথর ও জীব-জন্তুর লাশের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে। এখন সেগুলো এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, রোগমুক্তির জন্য, মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য এসব কল্পিত মাযারের ওপর মানত ও নযর-নিয়ায চড়াচ্ছে। আমি এসব মাযার ধ্বংসের অভিযান চালিয়ে আরেকটি বিশৃংখলার জন্ম দিতে চাই না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা ছিল কাবা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে তা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করাবেন। কিন্তু আরবের লোকেরা এইমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, এজন্য শান্তি-শৃংখলার স্বার্থে নিজের পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন। মুসলিম জনগণকে সর্বপ্রথম একান্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা অত্যাবশ্যক। ক্রমান্বয়ে তাদেরকে এমনভাবে ইসলামের বিষয়বস্তুর কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই এইসব কবরের কাছে যাওয়া বা এ উদ্দেশ্যে সফর করা পরিত্যাগ করে।

শিক্ষকদের নিষ্ঠা এবং প্রচারকদের বুদ্ধিমত্তা আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন ও চিন্তার পরিশুদ্ধি আনয়নের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ভূমিকা রাখতে পারে এবং রেখে আসছেও। কোন কোন লোকের তাওয়াস্সূলের (উসিলা) তাৎপর্য অনুধাবনে কিছুটা পেরেশানী আসতে পারে। আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করব, আল্লাহ্র দীনে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের সাহায্যে তাওয়াস্সূল লাভ করা যেতে পারে, অথবা নেক কাজের মাধ্যমে। হাদীসে এসেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ .

হে আল্লাহ্ ! তোমার কাছেই প্রার্থনা করছি। কেননা তুমিই একমাত্র ইলাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই ; যিনি এক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

তিনি কারো পুত্র নন এবং তাঁরও কেউ পুত্র নয়, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

এটা হল ঈমানের মাধ্যমে উসিলা। নেক কাজের মাধ্যমে উসিলা অন্বেষণের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই হাদীস যাতে তিন ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ আছে। হাদীসটির মর্মার্থ নিম্নরূপ ঃ

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন্ উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা তিন ব্যক্তি একত্রে কোথাও যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদেরকে বৃষ্টিতে পেয়ে বসল। অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ একটি পাথর গুহার মুখে পতিত হল। ফলে তারা গুহার অভ্যন্তরে আটকে গেল। তারা পরস্পর বলতে লাগল, আমরা নিজেদের জীবনের কৃতকর্মের হিসাব নেই এবং আমাদের প্রত্যেকে যে ভাল কাজ করেছে তার উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি। আশা করা যায় আল্লাহ্ তাআলা এর উসিলায় আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

অতএব তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ্! আমার পিতামাতা জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন খুবই বৃদ্ধ। আমার কয়েকটি ছোট ছোট সন্তানও ছিল। আমি কয়েকটি পশুরও মালিক ছিলাম। দিনের বেলা এগুলো মাঠে চরাতাম, এবং সন্ধাবেলা ফিরিয়ে নিয়ে এসে দুধ দোহন করতাম। আমি প্রথমে পিতামাতাকে দুধ পান করাতাম, অতঃপর নিজের সন্তানদের পান করাতাম। একদিন ঘাসের সন্ধানে পশুগুলো নিয়ে অনেক দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। তখন পিতামাতা ঘুমিয়ে গেছেন। আমি দুধ দোহন করে তাদের শিয়রে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদের ঘুম থেকে তুলে দুধ পান করানোটা ভাল মনে করলাম না এবং আমার সন্তানদের তাদের আগে দুধ পান করানোটাও পছন্দ করলাম না। আমার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেতে থাকে। আমি দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম এবং এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! এটা যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি তাহলে গুহার মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে দাও, যাতে আসমান দেখা যায়। অতএব আল্লাহ্ তাআলা পাথরটি এতখানি সরিয়ে দিলেন যে, আসমান দেখা গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্ ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। আমি তার প্রেম পিপাসু ছিলাম। আমি তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার প্রস্তাব দিলাম। সে একশ স্বর্ণমুদ্রা দাবি করল। আমি অনেক চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করে তার কাছে গেলাম। আমি যখন তার দুই উরুর মাঝখানে অবস্থান নিলাম তখন সে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার সতীত্ব নষ্ট কর না। আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ্! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই পাপ কাজ থেকে বিরত হয়ে থাকি তাহলে আমাদের জন্য গুহার মুখ খুলে দাও। অতএব গুহার মুখ কিছুটা খুলে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্ ! আমি নির্দিষ্ট মজুরীর বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করি। সে কাজ শেষ করে মজুরী চাইল। আমি তা হাযির করি। কিন্তু সে তা নিল না। আমি এই মজুরী বিনিয়োগ করে তা বাড়াতে থাকি। তা বৃদ্ধি পেতে পেতে অনেক গরু জমা হল। পরে সে আমার কাছে আবার ফিরে আসে এবং তার পাওনা দাবি করে। আমি তাকে গরুর পাল দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ্ ! আমি যদি তোমার সন্তোষ লাভের আশায় এটা করে থাকি তাহলে আমাদের জন্য গুহার মুখ খুলে দাও। অতএব আল্লাহ্ তাআলা পাথর সরিয়ে দিলেন এবং তাদের জন্য গুহার মুখ খুলে গেল।

—বুখারী ও মুসলিম থেকে সংক্ষেপিত

কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করার অর্থেও 'তাওয়াস্‌সূল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের দোয়া সব সময়ই কাম্য। ব্যক্তি বিশেষকে উসিলা বানানোর কোন সুযোগ কুরআনেও নেই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নাতেও নেই। সে ব্যক্তি যত মহৎ, যত বড় মর্যাদাসম্পন্নই হোক না কেন, চাই সে জীবিত হোক অথবা মৃত, কোন অবস্থায়ই থাকে উসিলা বানানো যেতে পারে না।

কিন্তু ব্যক্তি বিশেষকে উসিলা বানানোর প্রথা সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে চালু আছে। তারা এটাকে দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করে নিয়েছে এবং মনে করা হচ্ছে যদি কেউ তা অস্বীকার করে অথবা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাহলে তাকে সহ্য করা যেতে পারে না।

সর্বসাধারণের মধ্যে তৌহীদের অবস্থা

আমার কাছে জনৈক ছাত্র একটি চিঠি পাঠিয়েছে। এর ভাষা ও বিষয়বস্তু উচ্চমানের। যেসব লোক উসিলার প্রবক্তা এই পত্রে তাদের যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। তা নিম্নরূপ ঃ

এক. জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গুনাহ্গার। আর আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকী লোকদের দোয়াই কবুল করে থাকেন। লোকেরা যদি তাদের প্রতিপালকের কাছে যায় এবং তাদের মাথার উপর গুনাহের বোঝা থাকে তাহলে তিনি তাদের প্রার্থনা কবুল করবেন না এবং তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহও করবেন না। অতএব লোকদের উচিত তারা যেন গ্রহণযোগ্য কোন উসীলা তালাশ করে। অন্য কথায় তারা যেন কোন ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে উসিলা হিসেবে গ্রহণ করে।

দুই. একথা বলা ঠিক নয় যে, 'উসিলা' শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কৃতকর্মের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকারী জিনিস হচ্ছে নিয়াত। উসিলা গ্রহণকারীদের নিয়াতে কখনো শিরক স্থান পেতে পারে না। তারা তা পছন্দও করে না।

তিন. রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবাগণ, ফিক্হবিদগণ এবং অপরাপর ইমামগণ সবাই নবী-রাসূল ও বুযুর্গ লোকদের উসিলা বানাতেন। হযরত উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উসিলা বানিয়েছিলেন।

চার. দুই ইয়াতীম বালকের ঘরের দেওয়ালের উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন ঃ

وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا ٠

তাদের পিতা ছিল নেককার। —সূরা কাহ্ফ ঃ ৮৩

পত্র লেখকের জিজ্ঞাসা এই যে, এ আয়াত থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, জীবিত ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তিদের ফায়েয লাভ করে থাকে ?

অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ ٠

তারা যখন নিজেদের ওপর জুলুম করল তখন যদি তারা তোমার কাছে আসত এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করত। —সূরা নিসা ঃ ৬৪

এ আয়াত থেকে কি উসিলা গ্রহণ করা জায়েয প্রমাণিত হয় না ?

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের চিঠিও আমার কাছে এসেছে। এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

"একজন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, কবরবাসীদের উসিলা বানানো একান্ত অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ্‌র দরবারে একজন মৃত মানুষের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে, কোন জীবিত মানুষের তা নেই। উসিলা গ্রহণকারী যদি এই আকীদা রাখে যে, আল্লাহ্ তাআলাই হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছায়ই সবকিছু হয়ে থাকে তাহলে এতে দোষের কিছু নেই।

আলেম সাহেব আরো বলেন, যেসব আয়াতের ভিত্তিতে আমরা উসিলার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করি সেগুলো বিশেষভাবে কাফির-মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক অন্ধ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যেন তাঁকে উসিলা বানিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

এ হচ্ছে সেই সব যুক্তি একদল লোক যার আশ্রয় নিয়েছে। একে ভিত্তি করে তারা এমন সব মতবাদ গড়ে নিয়েছে যা নির্ভেজাল তৌহীদের আলোক প্রভাকে ম্লান করে দিয়েছে। তারা অসংখ্য মুসলমানকে এই ধ্বংসকর জাহিলিয়াতের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমরা যখনই এই বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করতে অথবা কিছু লিখতে যাই তখনই আমাদের মধ্যে অবসন্নতা ও নিরুৎসাহ এসে যায়। কেননা হক সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত এবং রাস্তা সম্পূর্ণ আলোকিত। তা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে এ নিয়ে নিষ্ফল বিতর্ক চলে আসছে। এখন শুধু এর ধ্বংসাবশেষই বাকি আছে। অতএব লোকদেরকে এই মহাসত্য মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। সে যাই হোক, এই অবসন্নতা ও নিরুৎসাহ সত্ত্বেও আমরা উল্লেখিত সংশয়ের জবাব দেব ঃ

'গুনাহ্গার ব্যক্তির সরাসরি আল্লাহ্র দরবারে হাযির হওয়ার অধিকার নেই, এজন্য আল্লাহ্র দরবারে হাত তোলার পূর্বে কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে সাথে নিতে হবে। এটা এমন একটা কথা—ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই। ইবলীসও সরাসরি আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করেছিল এবং তার দোয়াও কবুল হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۔ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۔

শয়তান বলল, হে প্রভু ! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। প্রভু বললেন, ঠিক আছে তোমাকে সেই নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল।

—সূরা হিজর ঃ ৩৬—৩৮

মুশরিকরাও সরাসরি আল্লাহ্র তাআলার দরবারে দোয়া করেছিল এবং তা কবুল হয়েছিল। কুরআনের বাণী ঃ

دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۔ فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۔

তারা সকলেই নিজেদের দীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেস করে দিয়ে তাঁর কাছে দোয়া করে—তুমি যদি এই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকব। কিন্তু যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন, তখন তারাই অন্যায়ভাবে যমীনের বুকে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। —সূরা ইউনূস ঃ ২২-২৩

ইবলীস ও তার সৈন্যরা যে অধিকার লাভ করেছে সেই অধিকারটুকুও কি গুনাহ্গার মুসলমানরা পেতে পারে না ? তারা কি শয়তানর চেয়েও বড় অপরাধী হয়ে গেল ? কোন মুসলমানের দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে তার কর্তব্য হচ্ছে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কোন নবী, ওলী, বুযুর্গ ব্যক্তি বা শয়তানের উসিলা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ۔

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় অথবা নিজেদের আত্মার ওপর জুলুম করে বসে —তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে ? —সূরা আল ইমরান : ১৩৫

কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এই হয় যে, তার কোন দোয়াই কবুল হতে পারে না—তাহলে তার জন্য অপর কারো দোয়া কবুল না হওয়াই উচিত।

দোয়াকারী চাই ওলীকুল শিরোমণি, সাইয়েদুল আম্বিয়াই হোন না কেন। দেখছেন না, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন কিন্তু তা কবুল হয়নি।

সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্কে বলতে হয়, আল্লাহ্কে সরাসরি ডাকার অধিকার তাদের রয়েছে, বরং তাঁকে সরাসরি ডাকা তাদের ওপর ফরয। এজন্য অপর কোন সৃষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। তবে একথা সত্য যে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ইখলাস, আন্তরিক নিষ্ঠা এবং তাকওয়া বর্তমান থাকা শর্ত। কিন্তু এই বিষয়ের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক আছে ?

তুমি কি মনে কর যদি কোন ব্যক্তির মধ্য থেকে সত্যনিষ্ঠা, আল্লাহ্ ভীরুতা এবং ঈমানের জোশ নির্বাপিত হয়ে যায় তাহলে কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির কাছে গেলেই কি এর প্রতিকার হয়ে যাবে ? এটা হচ্ছে একটা ভ্রান্ত চিন্তাধারা। আল্লাহ্র দীনের মধ্যে এর কোন সমর্থন নেই। আল্লাহ্র দীন বরং এর চরম বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, কাজের কোন বিবেচনা করা হবে না, বরং এই কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্য, যে নিয়াত ক্রয়াশীল তাই বিবেচনা করা হবে। একথা ঠিক নয়। কেননা দীনের দৃষ্টিতে কোন কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক—(১) সৎ উদ্দেশ্য এবং (২) শরীআত অনুমোদিত পন্থায় কাজটির

বাস্তব প্রকাশ।—যেকোন কাজের জন্য এ দুটি জিনিস হচ্ছে স্তম্ভ। এ দুটির যেকোন একটির অনুপস্থিতিতে কাজটি বাতিল গণ্য হবে।

কোন কাজের বাহ্যিক দিকটি যদি শরীআতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, কিন্তু এর কর্তা যদি প্রদর্শনেচ্ছা বা কপটতার শিকার হয় তাহলে তার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় কিন্তু কাজের শরীআত অনুমোদিত পন্থা অনুসৃত না হয়, তাহলে এ ধরনের সৎ উদ্দেশ্যের কোন মূল্য নেই এবং এ কাজও গ্রহণযোগ্য নয়।

মানব রচিত আইনের আওতায়ও যদি কোন ব্যক্তি নিষিদ্ধ অথবা আইনের পরিপন্থী কোন কাজ করে বসে, তাহলে তার সৎ উদ্দেশ্যের কোন মূল্যই দেওয়া হয় না। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা আইন কার্যকর করার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। যদি তাই হত তাহলে নিত্য নতুন কূটকৌশল আইনের মর্যাদা ও উপযোগিতা ধূলিসাৎ করে দিত। তাহলে মানব রচিত আইন যতটুকু মর্যাদার অধিকারী—খোদায়ী আইন কি ততটুকু মর্যাদাও পেতে পারে না ? অতএব আমরা কবর পূজারীদের শিরকে লিপ্ত বলে ঘোষণা করতে এতটা সংকোচ বোধ করব কেন ? অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাহ্যাড়ম্বরকেও শিরক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আল-রিয়া শিরকুন।" কপটতা, প্রদর্শনেচ্ছা ও বাহ্যাড়ম্বর হচ্ছে শিরক।

যেকোন মুসলিম বিশেষজ্ঞ আলিমের কর্তব্য হচ্ছে—তাওয়াসসূল বা উসিলার এই ভ্রান্ত পন্থার প্রতি নিজের ঘৃণা প্রকাশ করা এবং যেসব লোক এই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে তাদেরকে মহাসত্যের কাছে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য এই ভ্রান্তির সমর্থনে তার ব্যয় করা উচিত নয়।

যেসব লোক সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে কুফরীর ফতোয়া ছড়াতে আনন্দ পায় তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এটা তো জায়েজ হতে পারে না যে, জাহিলিয়াত নির্ভেজাল আকীদা-বিশ্বাসের পোস্ট মর্টেম করবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখব যদি কোন ডাক্তার যক্ষার রোগীর চিকিৎসা করার পরিবর্তে তাকে কেবল সান্ত্বনা দিতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছ তাহলে এটা কত বড় অন্যায়। এই পন্থা কখনো অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না।

তৃতীয়ত, সাহাবায়ে কিরাম জীবিত এবং মৃত ব্যক্তিদের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করতেন। এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, ভিত্তিহীন এবং প্রত্যাখ্যাত। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর সাথে যে কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে তাও মনগড়া এবং এরও কোন ভিত্তি নেই। আমরা একথা পূর্বে বলে এসেছি যে, যেকোন ব্যক্তি তার নিজের জন্যও দোয়া করবে এবং অপরের জন্যও কল্যাণ কামনা করবে। এটা খুবই পছন্দনীয় কাজ। অতএব কুরআন মজীদের ভাষায় নবী-রাসূল ও নেককার লোকদের মুখ দিয়ে এ ধরনের দোয়াই বের হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসালামের দোয়া ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

হে আমাদের প্রতিপালক হিসাব-নিকাশ নেওয়ার দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিন লোকদের ক্ষমা করে দিন।
—সূরা ইবরাহীম ঃ ৪২

হযরত নূহ্ আলাইহিস্—সালামের দোয়া ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আমার পরিবারের মুমিন লোকদের এবং অন্য সব মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ক্ষমা করে দাও। —সূরা নূহ ঃ ২৮

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ .

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব। আমাদের ও আমাদেরই সেই ভাইদের ক্ষমা করে দাও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। —সূরা হাশর ঃ ১০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন একে অপরের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করি। অতএব এটা অত্যন্ত

পছন্দনীয় কাজ যে, আমরা নিজেদের জন্যও আল্লাহ্র রহমত তালাশ করব এবং এ কাজে পরস্পরকে উৎসাহিত করব। হযরত উমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে মুসলমানদের জন্য দোয়া করার যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তার ধরনও ছিল এইরূপ। আব্বাস (রাঃ) দোয়া করছিলেন আর মুসলমানরা তার দোয়ার সাথে সাথে আমীন বলছিল।

যুবায়র ইবনে বাক্কার 'আল-আনসাব' নামক গ্রন্থে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ার ধরন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমার (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-কে বৃষ্টি প্রার্থনা করে দোয়া করতে বলেন। তিনি বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَمْ يَنْزِلْ بَلاَءٌ اِلاَّ بِذَنْبٍ وَلاَ يُكْشَفُ اِلاَّ بِتَوْبَةٍ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِى الْقَوْمُ اِلَيْكَ لِمَكَانِىْ مِنْ نَبِيِّكَ وَهٰذِهِ اَيْدِيْنَا اِلَيْكَ بِالذُّنُوْبِ وَنَوَاصِيْنَا اِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ ٠

হে আল্লাহ! যে গযবই নাযিল হয় তা গুনাহের কারণেই নাযিল হয় এবং তা কেবল তওবা করার মাধ্যমেই দূরীভূত হয়। তোমার নবীর সাথে আমার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার কারণেই এই লোকেরা তোমার দরবারে আমাকে নিয়ে এসেছে। আমরা তোমার দরবারে আমাদের অপরাধী হাত তুললাম এবং তওবার মস্তক অবনত করে দিলাম। অতএব তুমি আমাদের বৃষ্টির মাধ্যমে সিক্ত কর।

এটা কোন জরুরী বিষয় নয় যে, নেককার লোকের সব সময় অপরাধীদের জন্য দোয়া করবে। এটা একটা ভুল ধারণা। বরং বিষয়টি আরো প্রশস্ত। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমার (রাঃ)-কে তাঁর জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করেন। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গোটা উম্মাতকে তাঁর জন্য দোয়া করার নির্দেশ দেন। আমরা কি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর রাসূলের ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করি না ? অতএব বর্তমানে প্রচলিত উসিলার সাথে যার মধ্যে সাধারণ মুসলমানরা ডুবে রয়েছে—উল্লিখিত উসিলার কোন সম্পর্ক নেই।

চতুর্থত, উসিলার সাথে নিম্নোক্ত আয়াতের কি সম্পর্ক আছে তা আমি বুঝতে অক্ষম।

وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا صٰلِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۔

আর দেওয়ালটির ব্যাপার এই যে, দুইটি ইয়াতীম ছেলে এর মালিক। তারা এই শহরেই বাস করে। এই দেওয়ালের নিচে ছেলে দুটির জন্য একটা সম্পদ গচ্ছিত আছে। এদের পিতা ছিল নেককার লোক। এই কারণে তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন, ছেলে দুটি বড় হয়ে তাদের এই গচ্ছিত সম্পদ তুলে নিক। —সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৮২

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ ۔

লোকদের ভয় করা উচিত যে, তারা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায়, তাহলে মৃত্যুর সময় তাদের সন্তানদের সম্পর্কে কত আশংকা তাদের কাতর করে। অতএব তাদের খোদাকে ভয় করা উচিত। —সূরা নিসা ঃ ৯

এ আয়াত থেকে জানা যায়, পিতার নেক কাজের প্রভাব সন্তানের ওপরও পতিত হয়, যেমনিভাবে তার অসৎ কাজের ফল তাদেরকেও ভোগ করতে হয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেককার লোকদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তান ও পরিবার-পরিজন তাদের নেক কাজের কল্যাণ ও বরকত লাভ করে থাকে। আমরা বলি, 'কখনো'—কেননা উত্তরাধিকারেরও কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। এই মহাবিশ্বের প্রতিপালক তা নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু কে যে কার উত্তরাধিকারী হবে তা আমরা কখনো সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারি না। কি আশ্চর্য! এক কট্টর কাফিরের ঔরসে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মত একজন মহান নবীর জন্ম হয়। অপরদিকে হযরত নূহের মত একজন মহান নবীর ঔরসে কাফির সন্তান জন্ম নেয়। মহান আল্লাহ্ নূহ এবং ইবরাহীমের সন্তানদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۔

এই দুই জনের সন্তানদের মধ্যে কেউ তো নেককার আর কেউ নিজের ওপর সুস্পষ্ট জুলুমকারী। —সূরা সাফফাত ঃ ১১৩

স্বয়ং এই যুগে কি এমন লোকের অভাব আছে, যারা নবী করীম(সঃ)-এর সাথে নিজেদের বংশসূত্র যোগ করে অথচ তারাই আবার ইসলামের মূলোৎপাটনে সক্রিয় ?

অতএব প্রার্থনাকারীর উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তারা যাদেরকে উসিলা বানিয়েছে সেগুলো বর্তমান যুগের মূর্তি, তাহলে আমরা তাদের বিরোধিতা করছি এবং এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনছি। হযরত হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জীবিত ছিলেন তখন নিজের ওপর আপতিত বিপদ দূর করতে সক্ষম হননি। তখন তিনি মৃত্যুর পর কেমন করে অন্যের বিপদ দূর করতে পারেন ?

এখন থাকল আল্লাহ্ তাআলার বাণী "ওয়ালাও আন্নাহুম ইয্যলামূ আনফুসাহুম জাউকা—।" এ আয়াত থেকে উসিলা ধরা জায়েয প্রমাণিত হয় কিভাবে ? উসিলা ধরা জায়েয প্রমাণিত হওয়া তো দূরের কথা, এ প্রতি সামান্য ইঙ্গিতও এ আয়াতে পাওয়া যায় না। আয়াত পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছে। এখানে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করানোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে আসার কথা বলা হয়েছে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁর জীবদ্দশার সাথেই এর সম্পর্ক ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে এ ধরনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এখানে সূফী-দরবেশদের কিছু রহস্যজনক কথাবার্তা প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়। যদি তা সত্য হয়ে থাকে তাহলে সেটা তাদের নিজস্ব গণ্ডি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আল্লাহ্র দীনে এর কোন গুরুত্ব নেই। ইসলামী শরীআতের উৎস-পরিচিতও প্রসিদ্ধ। অমুক সূফী বা দরবেশ এই এই স্বপ্ন দেখেছে ; অথবা অমুক মাজযুব (ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি) নবী করীম (সঃ)-এর রওযা মুবারক যিয়ারত করার সময় এই এই জিনিস অনুভব করেছে—ইসলামী শরীআতে এর কোনই গুরুত্ব নেই।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিজস্ব কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থা ছিল। এটা তাঁর গভীর রাসূল-প্রীতির ফল। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)

সফরের সময় যেখানে যেখানে থেমেছেন আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর (রাঃ)-ও সেখানে থামতেন এবং কিছু সময় অবস্থান করতেন। তিনি যেখানে যেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বসেছেন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) ও সেখানে গিয়ে বসতেন— তখন যদিও তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের দাবী অনুভূত হত না। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এসব কিছুকে ইবন উমর (রাঃ)-এর নিজস্ব অভিরুচি অথবা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অন্য কোন ব্যক্তি তা অনুসরণ করতে বাধ্য নয় এবং তা শরীআত হিসেবে বিধিবদ্ধ হওয়ার মর্যাদাও পায়নি।

অতএব কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের কোন ঘটনা বর্ণনা করে যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর রওযা মুবারকে গিয়েছে, সেখানে গিয়ে সালাম করেছে এবং সালামের জবাব শুনতে পেয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাত মুবারকও চুম্বন করেছে—এসব কারামত সে লাভ করেছে ; তবে এর দুটি অবস্থা হতে পারে। হয় সে মিথ্যাবাদী যার কথার কোন মূল্য নেই ; অথবা সে মাযযুব (অর্ধপাগল), যে তেলেসমাতি রচনা করেছে এবং কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ধরনের লোকের কথারও কোন গুরুত্ব নেই। এই প্রকারের কিসসা-কাহিনীর ভিত্তিতে আমরা আমাদের মহান প্রতিপালকের কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।

এখন যে ব্যক্তি উসিলা গ্রহণ করা ফরয বলে সাব্যস্ত করে এবং মনে করে যে, জীবিত ব্যক্তির তুলনায় আল্লাহর্ দরবারে মৃত ব্যক্তিদের অধিক প্রভাব রয়েছে, তার জ্ঞানে দৈন্যতা ও বিশৃংখলা আছে। সে যদি ধারণা করে যে, সমস্ত কাজের কাযী একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা, অতএব শিরকের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাস্তবতার সাথে এই ধারণার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগের মুশরিকরাও এ ধরনের বিশ্বাস রাখত। তাদেরও আকীদা ছিল— সমস্ত কাজের কাযী একমাত্র আল্লাহ্। তারা বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে যে উদ্দেশ্যে যেত এবং এদেরকে উসিলা বানাত তার কারণটা নিম্নরূপ ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ٠

আমরা এজন্যই তাদের পূজা করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র অতি কাছে পৌঁছে দেবে। — সূরা যুমার ঃ ৩

কিয়ামতের দিন তারা এ কারণেই অনুতপ্ত হবে যে, তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছে।

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٠

> আল্লাহ্‌র শপথ আমরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম যে, আমরা তোমাদেরকে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের আসনে সমাসীন করেছিলাম। —সূরা শূআরা ঃ ৯৭-৯৮

এ ধরনের অর্থজ্ঞাপক আরো বিশটি আয়াত রয়েছে। এ স্থানে একদল লোক অবশ্যই বলবে, এসব শরীকরা তো এদের পূজা উপাসনা করত। আর আজকের মুসলমানরা তো কেবল দোয়া করে এবং মনোবাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। মুশরিকদের পূজা-উপাসনা এবং মুসলমানদের অলী-দরবেশদের উসিলা বানোনোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

জবাবে আমরা বলব, এটা একটা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কুরআন ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, দোয়া এবং ফরিয়াদেও ইবাদতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ٠

> তোমাদের রব বলেন, আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। যেসব লোক গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে আমার ইবাদত করা থেকে বিমুখ থাকে—তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১] অনন্তর হাদীসে এসেছে ঃ —সূরা মুমিন ঃ ৬০

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ٠

দোয়াই ইবাতের সার। —তিরমিযী

অতএব যেটা উপাস্যের বিশেষত্ব তা নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাব কেন ? মুর্খ লোকেরা বোকামী করে এই অনিষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকলে

---

১. দোয়াই মূল ইবাদত-ইবাদতের প্রাণ হচ্ছে দোয়া—এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনে সূরা মুমিনের ৮৪ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য। —অনুবাদক

আমরা দ্রুত তাদেরকে অনিষ্ট থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব না কেন ? আমরা কেবল বসে বসে তাদের বিরুদ্ধে কোন মুখরোচক ফতোয়া প্রণয়ন করব ? এ স্থানে অন্ধ ব্যক্তির ঘটনারও বরাত দেওয়া যেতে পারে। সে নবী আলাইহিস সালামকে উসিলা বানিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিল—যেন আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

এই ঘটনাকে সহীহ্ বলে স্বীকার করে নিলেও এর ওপর উসিলার ব্যাপরটি কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা এখানে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এই অন্ধ ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল। আর এই নাদান লোকেরা অন্যের কাছে প্রার্থনার হাত প্রসাতির করে। অনন্তর-উল্লেখিত ঘটনা সম্বলিত হাদীস সহীহ্ নয় ; আর আকীদা-বিশ্বাস এবং হুকুম-আহকাম প্রমাণ করার ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের হাদীস কেবল ওয়ায-নসিহতে এবং কোন কাজের ফযীলত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে শব্দের সাধারণ প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করতে হবে, বিশেষ কারণ বা উপলক্ষ বিবেচ্য নয়। আল্লাহ্ তাআলা আরববাসীদের জন্য শিরক হারাম ঘোষণা করেছেন, তা অন্যদের জন্যও হারাম হয়ে গেছে। এ আয়াতগুলো জাহিলী যুগের মুশরিকদের লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে— এরূপ কথা বলা অজ্ঞতা ও মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানবুদ্ধির দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সত্যিকার তৌহীদের স্বাদ আস্বাদন করান। আমরা যদি বেঁচে থাকি তাহলে এই তৌহীদ নিয়েই যেন বেঁচে থাকতে পারি এবং মরে গেলেও যেন এই তৌহীদ নিয়েই মরতে পারি।

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلشِّرْكُ اَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ الذَّرِّ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ ‐ وَاَدْنَاهُ اَنْ تُحِبَّ عَلٰى شَيْئٍ مِّنَ الْجَوْرِ وَاَنْ تُبْغِضَ عَلٰى شَيْئٍ مِّنَ الْعَدْلِ ‐ وَهَلِ الدِّيْنَ اِلاَّ الْحُبُّ وَالْبُغْضُ ‐

কাঁকরময় ভূমির উপর দিয়ে অন্ধকার রাতে পিঁপড়া যেমন সন্তর্পণে অগ্রসর হয়—শিরকও তেমনি নীরবে অনুপ্রবেশ করে। বরং শিরক এর চেয়েও সন্তর্পণে আগমন করে। জুলুমের প্রতি তোমার কিছুটা আকর্ষণ

এবং ইনসাফের প্রতি কিছুটা ঘৃণাও সাধারণ পর্যায়ের শিরক। আর আকর্ষণ ও ভালবাসা এবং ঘৃণা ও অসন্তোষই তো হচ্ছে দীন। অতঃপর নবী (সঃ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠

হে নবী! লোকদের বল, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে ভালবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্‌ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। —সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

এ থেকে জানা গেল, ইনসাফের প্রতি আকর্ষণ এবং জুলুমের প্রতি বিকর্ষণও ঈমান ও ইখলাসের দাবির অন্তর্ভুক্ত। এখন যদি কোন ব্যক্তি জালিমের সাথে মহব্বত রাখে এবং ইনসাফের অনুসারী ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাহলে সে শিরকের সীমানার মধ্যে পা রাখল।

অন্তরের পবিত্রতা এবং ভ্রান্ত ঝোঁক প্রবণতার পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে ইসলামের অনুভূতি যদি এতটা তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে—তাহলে এটা কেমন করে জায়েয হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া ভিন্ন কোন শক্তির সামনে আহাজারী করছে, তার কাছে প্রার্থনা করছে, তাকে ভয় করছে, তার মাধ্যমেই কিছু পাওয়ার আশা করছে—আর আমরা তার এসব কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখার পরও তাকে বলছি—ঠিক আছে, এতে কোন দোষ নেই ?

এক্ষেত্রে একজন আলেমের ভূমিকা এমন হওয়া উচিত নয়, যেমন একজন উকিলের ভূমিকা হয়ে থাকে। তার কাজই হচ্ছে অপরাধীর সাহায্য করা এবং তার পক্ষ সমর্থন করা। সে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আইনের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিতে থাকে এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করতে চেষ্টা করতে থাকে।

পক্ষান্তরে একজন মুসলিম আলেমের ভূমিকা এই হওয়া উচিত যে, সে ইসলামের রীতিনীতির সাহায্য ও সমর্থন করবে। যদি তার বক্তব্য অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত নয়—কেননা সে অপরাধ সম্পর্কে অবহিত ছিল না—তাহলে তাকে আল্লাহ্‌র দীন শেখাতে হবে। শয়তানের আক্রমণের মুখে তাকে ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।

পরিপূর্ণ সত্তা

আল্লাহ্‌র কুদরত (শক্তি)

এই বিশ্ব,এর গতি এবং স্থিতি সবই আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরত ও শক্তিমত্তারই বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি জিনিসের মধ্যে যে উদ্যম ও শক্তি নিহিত রয়েছে তার উৎস সে নিজে নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি মাটি ভেদ করে চারাগাছ বের হয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে তা বড় হতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এই চারাগাছটি শক্তিশালী হয়ে নিজের মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। ঝড়-ঝাপটা সহজে তাকে কাবু করতে পারে না। এটা মূলত আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ প্রবল বেগে ধাবিত হয়ে তীরভাগে প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই আক্রমণ সকাল-সন্ধ্যায় অবিরত চলতে থাকে। তার কোন বিশ্রাম বা ক্লান্তি নেই। এ সবই আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের খেলা।

উড়োজাহাজ বা রেলগাড়ির ইঞ্জিন শূন্য ভেদ করে দ্রুতগতিতে বিরাট বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে, ভারী বোঝা বহন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। এটাও দয়াময় রহমানুর রহীমের অসীম কুদরতেরই চমৎকারিত্ব।

এই জনসমুদ্র মানব বসতির দিকে তাকালে দেখা যায়—তাদের মধ্যে যেমন রয়েছে ভালবাসা, সম্প্রীতি, তেমনি রয়েছে শত্রুতা ও ঘৃণার অস্তিত্ব। তাদের মধ্যে আছে আনন্দ-বিষাদ, হাসি-কান্না, কর্ম-কোলাহল এবং নীরব নিস্তব্ধতা। এটাও মহান স্রষ্টার অসীম কুদরতেরই প্রদর্শনী।

তোমার অনুভূতি থাক বা না থাক—তোমার দেহের মধ্যে যে অন্তর রয়েছে এবং হৃদয়ের মধ্যে যে স্পন্দন রয়েছে অথবা শিরায়-উপশিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে অনুভূতি বিরাজ করছে, অথবা দেহের কোষগুলোর

(cells) মধ্যে জীবনের যে স্পন্দন রয়েছে অথবা ফোঁড়া বা বসন্তের গুঁটি থেকে যে রস নির্গত হয় এ সবই আল্লাহ্ কুদরতের লীলাখেলা।

এই মহাবিশ্বের কোন জিনিস সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তার মধ্যে নিজস্বভাবেই শক্তি *(energy)* বিরাজ করছে। মহান আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত এগুলোকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছে এবং এর মধ্যে নিজের রহস্য লুকিয়ে রেখেছে, নিজের অসংখ্য নিদর্শন এই সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে যা তাঁর দিকেই পথ দেখায়।

কতিপয় প্রকৃতিবাদী নাস্তিক এসব নিদর্শন নিজেদের চর্ম-চোখে এবং জ্ঞান-চোখে অবলোকন করছে, কিন্তু তারা এগুলোকে কেবল প্রকৃতির খেলা অথবা বিভিন্ন উপাদান ও পদার্থের মধ্যে লুকায়িত শক্তির প্রদর্শনী মাত্র মনে করছে। এটা তাদের প্রকাশ্য প্রতারণা, বুদ্ধি-বিবেকের চরম অবমাননা এবং বাস্তব ঘটনার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়ে বিজলী প্রবাহিত হয়ে যে আলোর সৃষ্টি হয়, উড়োজাহাজের ইঞ্জিনের বিশেষ বিশেষ অংশে গ্যাস ভর্তি হয়ে যে গতির সৃষ্টি হয়, অনন্তর পাখার ঘূর্ণনে বাতাসের চাপের মধ্যে যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় এবং এভাবে তার মধ্যে উড়ে যাওয়ার যে ক্ষমতা সৃষ্টি হয়—এগুলোকে কেবল উপাদান ও পদার্থের বৈশিষ্ট্য বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না।

আমাদের কাছে এরূপ দাবি কেন করা হয়, আমরা যমীনের উপাদান সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করব যে, তা নিজস্ব শক্তিবলে গাছপালা তরুলতার উৎপাদন ও প্রতিপালন করে যাচ্ছে ? যদি এ দাবি যথার্থ হয়ে থাকে তাহলে মাটিকে খোদা বনে যাওয়ার পথে কে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে ? তাছাড়া যেসব জীবন্ত ও নির্জীব পদার্থ রয়েছে—তার সবগুলো সম্পর্কে একই রূপ ধারণা করে নিলে আমরা জটিলতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হব।

বাস্তব সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য এটা কি সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ নয় যে, আমরা যমীন থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত গোটা বিশ্বকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব যে, এসবই এক উচ্চতম শক্তি সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিশ্বে যা কিছুই সংঘটিত হচ্ছে বা সবই এই মহাশক্তির তত্ত্বাবধানে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে।

পরিতাপের বিষয়, আজকের প্রকৃতি বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কেবল বাহ্যিক পদার্থ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বিভিন্ন উপাদান ও পদার্থের মধ্যে প্রাপ্ত সম্পর্ক এবং এর মধ্যে সর্বদা যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে—তার রহস্য খুঁজে বের করা পর্যন্তই প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সীমিত। প্রকৃতি বিজ্ঞানের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে তার সবগুলোর কর্মক্ষেত্র এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা যদি কখনো তাদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছুটা সুনির্দিষ্ট ফলাফল লাভে সক্ষম হন তাহলে খুব কমই অন্য জিনিসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

যদিও বিজ্ঞানের এসব শাখা-প্রশাখা এই বিশ্ব ও সৃষ্টিকুল সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজলভ্য করে দেয় কিন্তু তা স্রষ্টা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। কেননা অনুসন্ধানের ব্যাপক ক্ষেত্রে যতটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় শিক্ষার্থীরা তাঁর আলোক থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। এটা হচ্ছে একটা বিরাট বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতারণা। জ্ঞানের ডানা যদি স্বাধীনভাবে মুক্তবিশ্বে বিচরণ করতে পারত এবং দৃষ্টিশক্তি যদি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ করত তাহলে মানুষের অভ্যন্তরভাগ ঈমান ও হিদায়াতের নূরে আলোকিত হয়ে যেত। মানুষের অন্তর আশা-নিরাশা এবং শান্তি ও শংকার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে মহান সৃষ্টির সামনে ঝুঁকে পড়ত।

এই একদেশদর্শী অনুসন্ধান প্রকৃতির যে দিকটির প্রতিই মনোনিবেশ করে কুদরতের আকর্ষণীয় নিদর্শনসমূহ তার সামনে এসে যায়। কিন্তু সেগুলোকে সে অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত নামের মোড়কে বন্দী করে দেয় এবং শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে ব্যস্ত রাখে। এই প্রকৃতির মাঝে আল্লাহ্‌র যে গৌরব মহিমা ছড়িয়ে আছে—বিশ্ববিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের সেদিকে নজর দেওয়ার সময় কই ? অথবা এ দিকে তাদের কোন আগ্রহ নেই। এজন্য তাদের সমস্ত অনুসন্ধানই অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝের বন্ধন ছিন্ন থাকার কারণে পূর্ণতায় তা পৌঁছতে পারে না।

এসব কথা থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় জিনিসের ওপর শক্তিমান। তিনি সুদৃঢ় ও শক্তির আধার। সৃষ্টিকার্য এবং তাঁর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তাঁর জন্য কঠিন কিছু নয়। কুরআন মজীদের ঘোষণা ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ٠

আসমান ও যমীনের কোন জিনিসই আল্লাহকে দুর্বল করতে পারে না।
তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তির অধিকারী। —সূরা ফাতির : ৪৪

আল্লাহর সৃষ্ট এই বিশাল প্রকৃতি যাবতীয় দোষক্রটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর গোটা অবয়বে কোন কলংক নেই। প্রকৃতির যে নিদর্শনই আমরা পর্যবেক্ষণ করি তা এমন মহাশক্তির সন্ধান দেয় যিনি সীমাহীন ও অতুলনীয়।

ইচ্ছা ও সংকল্প

আল্লাহ্ তাআলাই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এখানে তাঁর ব্যবস্থাপনাই কার্যকর আছে। তিনি নিজের ইচ্ছায়ই তা করছেন। তিনি যেভাবে চেয়েছেন, এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেসব জিনিস যে যে মুহূর্তে অস্তিত্ববান করতে চেয়েছেন, তাই করেছেন। এর সাথে যে বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করতে চেয়েছেন তা যুক্ত করেছেন। তিনি কোন দিক থেকেই কারো চাপের মুখে নন। আসমান ও যমীনে যে নানা রকম জিনিস, নানা রং, নানা দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তা সবই আল্লাহর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহ্ তাআলা আজ যে জিনিস সৃষ্টি করেছেন, ইচ্ছা করলে শত শত বছর আগেও তা সৃষ্টি করতে পারতেন। এই যে তরকারাজি, চন্দ্র-সূর্য আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে—তিনি ইচ্ছা করলে এগুলোকে কংকরময় প্রান্তরে পরিণত করে দিতে পারতেন। এই বিশ্বজগতে যত রকমের সৃষ্টি রয়েছে—এর গতি-প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা সব কিছুই আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

আমরা যে পৃথিবীর বাসিন্দা—তিনি ইচ্ছা করলে তা ভিন্ন আকারে গড়তে পারতেন। এ সময় তার ভিন্নতর নকশা ও ভিন্নরূপ ব্যবস্থাপনা হত।

যাবতীয় সৃষ্টির ভিন্নরূপ অবস্থা হত। তার ইচ্ছায় একই মূল জিনিস থেকে ভিন্ন স্বাদের দুটি জিনিস জন্ম নেয়। একই স্থানে পরস্পর মিলিত দুটি শস্যক্ষেত কিন্তু তার উৎপাদন পরস্পর থেকে ভিন্ন। উৎপাদিত ফসলের বৈশিষ্ট্য ও গণাগুণের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

উদ্ভিদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—একই বীজ থেকে তা উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু এর ফল ও ফুলের রং, রস, স্বাদ-গন্ধ সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষ ও জীবজন্তুর এই একই অবস্থা। দেখতে একই ধরনের বীজ। কিন্তু তা থেকে জন্ম নেওয়া মানুষ এবং পশুর মধ্যে কত পার্থক্য ; একজন অভিজাত, অপরটি নীচ, একজন বুদ্ধির সম্রাট, অন্যটি বুদ্ধিহীন পুতুল। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۔

এবং পৃথিবীতে ভূখণ্ডগুলো পাশাপাশি সম্মিলিত রয়েছে। আঙ্গুরের বাগান, কৃষিক্ষেত, খেজুর বাগান—সংযুক্ত শিকড় বিশিষ্ট এবং অসংযুক্ত শিকড় বিশিষ্ট, এরা একই পানিতে সিক্ত হয়। কিন্তু স্বাদে আমরা কোনটাকে উত্তম এবং কোনটাকে সাধারণ বানিয়ে দেই। এর মধ্যে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। —সূরা রা'দ ঃ ৪

আমাদের পূর্বকালের আলেমগণ মহান আল্লাহ্র ইচ্ছার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে বলেছেন, মৌমাছি গাছের পাতা খেলে তা মধুতে পরিণত হয়ে যায়। আর গুটিপোকা গাছের পাতা খেলে তা রেশমে পরিণত হয়ে যায়। অন্যান্য পশু বা পাখি তা খেলে বিষ্ঠায় পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ্র ইচ্ছা যখন কোন কাজ সংঘটিত করতে চায় অথবা কোন কিছুকে অস্তিত্ব দান করতে চায় তখন তা না হয়ে কোন উপায় নেই।

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۔

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতা রাখেন।

—সূরা হূদ ঃ ১০৭

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۔

তাঁর কাজ এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা পোষণ করেন তখন শুধু বলেন, "হয়ে যা" আর অমনিই তা হয়ে যায়।

—সূরা ইয়াসীন ঃ ৮২

তাঁর ইচ্ছাই আসমানী জগতেও কার্যকর রয়েছে এবং পার্থিব জগতেও কার্যকর রয়েছে। কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতেও পারে না আর কেউ তার সমালোচনা করারও দুঃসাহস করে না।

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ·

তোমার রব যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন এবং (যাকে ইচ্ছা নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নেন। এই বাছাই করার কাজ তাদের নয়।
—সূরা কাসাস ঃ ৬৮

আবার কখনো নেতিবাচকভাবে কোন কিছু করার সংকল্পকেও 'ইচ্ছা' বলা যায়। যেমন তুমি যখন কোন ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছ তখন বাড়ির মালিক ইচ্ছা করলে তোমাকে বের হতে বাধা দিতে পারে। কিন্তু সে তা করল না। তার এই নীরবতা প্রমাণ করে যে, তোমার বাইরে চলে যাওয়াটাই তার ইচ্ছা ছিল।

মুতানব্বীও তার এক কবিতায় এই দিকে ইঙ্গিত করছেন। তার সম্পর্কে কথিত আছে, একবার তিনি রাগান্বিত হয়ে সাইফুদ্দৌলার দরবার থেকে উঠে চলে যান। পরে তিনি নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে নিজের এই দুঃসাহসের ব্যাখ্যা দেন। তিনি সমস্ত দায়দায়িত্ব সাইফুদ্দৌলার মাথায় চাপিয়ে দেন।

"যখন চলে যাও তুমি
একদল লোকের মজলিস থেকে
অথচ চাইলে তোমাকে রুখতে পারতো তারা
তখন তারাই যেন চলে গেলো।"

অতএব যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ অবলম্বন করে তার অবস্থাটাও সম্পূর্ণ এ ধরনের। অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে সে এদিক সেদিক হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং তাঁকে এ অবস্থায়ই পরিত্যাগ করা হবে। কেননা সে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে তাকে নিজের রহমতের দ্বারা ধন্য করতে পারতেন। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো খুব সম্ভব সেদিকেই ইঙ্গিত করেছে ঃ

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ۚ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

যেসব লোক কুফরীর পথে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের কর্মতৎপরতা তোমাকে যেন চিন্তান্বিত না করে। তারা আল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই যে, আখিরাতে তিনি তাদের কোন অংশই দেবেন না। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। —সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৬

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۚ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۔

কাফিরদের আমরা যে অবকাশ দিচ্ছি—এটাকে তারা যেন নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। আমরা তাদের এজন্যই অবকাশ দিচ্ছি যে, তারা যেন পাপের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে নেয়। তাদের জন্য খুবই অপমানকর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। —সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৮

প্রজ্ঞা

আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ শক্তি ও ইচ্ছার মালিক। তাঁর ইচ্ছা কোন কিছুর অধীন নয়। তিনি যা চান, যখন চান, যেভাবে চান করতে পারেন। তিনি যাকে যেভাবে চান, সৃষ্টি করেন। যে পরিমাণ চান রিযিক দান করেন। কাউকে কম দেন, আবার কাউকে বেশি দেন। কাউকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে উন্নত করেন। কাউকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দেন। কাউকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। আবার কারো চেহারা কুৎসিৎ করেন। কাউকে উন্নত মমশির বানান, কারো মাথা নত করে দেন। আল্লাহ্ তাআলার কি কোন পরিকল্পনা বা স্কীম নেই ? এটা কি এরূপ যে, কোন খেয়াল মনে এসে গেল আর তা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে পরিণত হয়ে গেল ? কখনো তা নয়।

এই গোটা বিশ্ব একটা অতি সূক্ষ্ম ও মজবুত ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এমন কতগুলো স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল বিধান রয়েছে যা পরস্পরের সাথে সঙ্গতিশীল এবং যে কোন দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ। গোটা বিশ্বের মানুষ যদি এই বিধান ভঙ্গ করতে বা উৎখাত করতে একতাবদ্ধ হয় তবুও তারা এর মধ্যে কোন রদবদল সাধন করতে সক্ষম হবে না। এই ব্যবস্থাপনায় কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

ফসল পেকে তা ঘরে তোলার উপযোগী হয়। তাও মূলত আল্লাহ্‌র কুদরত ও তাঁর ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। এই কুদরত ও ইচ্ছার ধারাবাহিক বহিঃপ্রকাশ আমার সামনেই ঘটছে। তার রূপ এই যে, প্রথমে একটি বীজ বপন করা হয়, পানি সিঞ্চন করা হয়, বিভিন্ন রকম পরিচর্যা করা হয়, মৌসুম ও স্থানকেও বিবেচনায় রাখতে হয়। মায়ের জরায়ুতে গোশতের একটি টুকরো বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু হয়ে জন্ম নেয়। এসব কিছুই আল্লাহ্‌র কুদরত এবং তাঁর ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করার পরই তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মাতৃগর্ভের একটি শিশুকে এই পর্যায়গুলো অতিক্রম করতে হয়। অন্যথায় তা পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু হিসেবে ভূমিষ্ঠ হতেই পারে না।

মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন, তিনিই কাউকে কর্তৃত্ব দান করেন আবার কারো কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সকালে বা সন্ধ্যায় একটি রাজত্ব কায়েম করে দেন, আবার কোন রাজপ্রাসাদকে ধূলিসাৎ করে দেন।

পরিপূর্ণ সত্তা

কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম হওয়া বা তার পতন ঘটার পূর্বে যুগের পর যুগ ধরে বিভিন্ন কারণ ও ঘটনা পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পেতে থাকে। এতে শত বছরও লেগে যেতে পারে। এরপর একটি পর্যায়ে পৌঁছে এর ফলাফল বাস্তবে প্রকাশ পায়। একদল নির্বোধ লোক মনে করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা নিজের যে গুণ বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি যা চান তাই করেন" এর অর্থ হচ্ছে বান্দাদের মধ্যে তাঁর যে নির্দেশ জারি ও কার্যকর হচ্ছে তার ধরাবাধা কোন ব্যবস্থা নেই বা এর পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ নেই।

খুব সম্ভব তারা দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের কার্যকলাপের ওপর আল্লাহ্ তাআলার কর্তৃত্বকে অনুমান করছে। তাদের অবস্থা এই যে, তারা অন্ধ উটের মত পথ হারিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মুর্খরা যা বুঝেছে আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী এর অনেক উর্ধ্বে। এই জগত হচ্ছে কার্যকারণের জগত। এই কারণগুলো হচ্ছে চাবি যা মানুষকে দান করা হয়েছে। এগুলোর ব্যবহার করে তারা কল্যাণের দিকেও অগ্রসর হতে পারে অথবা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে মন্দ পরিণতির সম্মুখীনও হতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলা এই বিশ্বজাহানের জন্য যে প্রাকৃতিক নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য যে শরীআতী নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন— আল্লাহ্র তাআলার কুদরত ও ইচ্ছা এর অনুকূলেই আবর্তন করে। অনুরূপভাবে "আল্লাহ্র যা ইচ্ছা তাই করতে পারে" এর অর্থ এই নয় যে, তিনি পাপীদের পুরস্কৃত করতে পারেন এবং অনুগতদের শাস্তিও দিতে পারেন। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়, তিনি জুলুমও করতে পারেন, অধিকার খর্বও করতে পারেন এবং খেয়ানতও করতে পারেন (নাউযুবিল্লাহ)।

এটা কতদূর মারাত্মক ভ্রান্তি। এ ধরনের কথা বলার অর্থ যেন আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে যা বলেছেন তা মিথ্যা মনে করা। আদল ও ন্যায়নিষ্ঠা তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি যদি জুলুম করেন তাহলে কেউ তাঁকে শাস্তির সম্মুখীন করতে পারে অথবা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেমনেইবা তা হতে পারে ? বিশ্ব চরাচরের অধিপতি তো তিনিই, অবশিষ্ট সব কিছুই তাঁর বান্দা ও হুকুমের অধীন। তার ঘাড় তাঁর সামনে নত হয়ে আছে।

একদল মুসলমান 'আল্লাহ্র ইচ্ছার' অর্থ এই মনে করেছে যে, বিশ্বজাহানের এই প্রাকৃতিক বিধানের কোন গুরুত্ব নেই। সর্বোচ্চ আদালত স্বতন্ত্র কোন জিনিস নয়। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, দীনের ফরয ও ওয়াজিব কর্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে অনুভূতির এমন শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে যে, বিবেক-বুদ্ধি মতদ্বৈততায় পড়ে গেছে। 'তাকদীর' অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব।

জীবন

উচ্চ, নীচ, সম্মান ও পদমর্যাদার দিক থেকে অস্তিত্ববান জিনিসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। জড় পদার্থের মর্যাদা উদ্ভিদের তুলনায় কম, জীবজন্তুর মর্যাদা উদ্ভিদের তুলনায় অধিক। মানব সত্তা সমস্ত সৃষ্টির তুলনায় অধিক মর্যাদাবান ও উন্নত।

আল্লাহ্ তাআলাও একটি অস্তিত্ববান জীবন সত্তা। তাঁর জীবন্ত থাকার অর্থ হচ্ছে—তাঁর এখানে তাঁর সত্তা যাবতীয় মহত্ত্ব ও গৌরব বর্তমান রয়েছে—যার আগে কারো অস্তিত্বের মহত্ত্ব ও মর্যাদা কল্পনা করা যায় না। তাঁর নিদর্শনাবলী সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, তিনি বর্তমান আছেন এবং তাঁর অস্তিত্ব সূর্যের চেয়ে অধিক প্রতিভাত হয়ে আছে। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির উৎস, তিনি নিজের পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী যাকে চান অস্তিত্ব দান করেন।

একদল দার্শনিক বলেন, এই বিশ্ব অন্য কোন সত্তার কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। স্রষ্টা হচ্ছে সব কারণের মূল কারণ অথবা অস্তিত্বের সূচনা বিন্দু। এভাবে তারা এই মহান সত্তার ধারণাকে চরমভাবে কুয়াশাচ্ছন্ন করে দেয়। এতে কোন ব্যক্তির মনে এমন ধারণা জন্ম নেয় যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেরূপ হয়ে থাকে—বিশ্বস্রষ্টা থেকে সৃষ্টিকুলের অস্তিত্বও ঠিক সেভাবেই হয়ে থাকে। এর মধ্যে না কোন জীবন আছে, আর না কোন আত্মা। এটা হচ্ছে একটা ভ্রান্ত মতবাদ।

এই মহান সত্তার কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবনের আলোকচ্ছটা এমনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, তাঁর সামনে সমস্ত জীবনগুলো মূল্যহীন মনে হয়।

একবার কল্পনার জগতে ডুব দিয়ে দেখ, জীবন্ত হাত যে অবদান রাখছে, জীবন্ত জ্ঞান যে চিন্তাধারা পেশ করছে, জীবন্ত হৃদয়ে যে আবেগ-অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে—এসব কিছু খেয়াল কর। কোন একটি স্থানের কথা নয়, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জীবনের যতগুলো নমুনা ও অবদান থাকতে পারে—এসব কিছুই খেয়াল করে দেখ। শুধু আজকের কথাই নয়, অতীত শতাব্দীগুলোতে এরূপ যতগুলো জিনিস সম্ভব হতে পারে, বর্তমান যুগে যতগুলো সম্ভব হতে পারে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো জীনের সম্ভাবনা রয়েছে তার সবগুলো একত্র কর।

আবিষ্কার ও সৃষ্টিশক্তিতে ভরপুর জীবনের এই চমৎকারিত্ব—সীমাহীন প্রশস্ত খোদায়ী জিন্দেগীর সামনে কোন গুরুত্ব রাখে না। বরং এগুলো সেই চিরন্তন ও চিরঞ্জীব সত্তার কাজের কয়েকটি নমুনা এবং তাঁর কুদরতের সামান্য দ্যুতিমাত্র। তিনি তাঁর রূহ্ থেকে প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে ফুঁকে দেন এবং তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। জড় পদার্থের মধ্যে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দেন এবং তার মধ্যে গতি সৃষ্টি হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۚ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ۝

দানা ও বীজকে দীর্ণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে বের করেন জীবিত থেকে। এসব কাজের আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্। অতএব তোমরা উদভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ? —সূরা আনআম ঃ ৯৫

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝

আল্লাহ্ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি ছাড়া অর কোন ইলাহ্ নেই। —সূরা বাকারা ঃ ২২৫

ইল্ম (জ্ঞান)

আল্লাহ্ তাআলা সব জিনিসেরই জ্ঞান রাখেন। তাঁর সামনে দিয়ে এমন কোন যুগ অতিক্রম করেনি যখন তিনি অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিলেন, আর না তিনি ভুলের মধ্যে ছিলেন, অতীতেও এরূপ ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও এরূপ ঘটবে না। তাঁর জ্ঞানের মধ্যে ভুলের কোন অবকাশ নেই, এর সম্ভাবনাও নেই। প্রকাশ্য অথবা গোপন, অতীত অথবা ভবিষ্যত, দুনিয়া অথবা আখেরাত সব কিছুই তার কাছে সমান। প্রতিটি জিনিস তার সামনে পরিষ্কার। কোন জিনিস তাঁর জ্ঞানের অগোচরে নেই।

মানুষ বর্তমান যুগ সম্পর্কে কিছুটা খবর রাখে, অতীত কাল সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা রাখে। এছাড়া যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানষ

অতীতের দীর্ঘ ইতিহাসের কতটুকুইবা জানে ? সে যে জগতে বাস করছে তার অধিকাংশ জিনিস সম্পর্কেও সে অনবহিত। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আমাদের জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতীত ইতিহাসের প্রতিটি পাতা সেখানে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি রাজ্যের উত্থান-পতনের পুরা রেকর্ড সেখানে প্রস্তুত রয়েছে। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتَابٍ لَايَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى ·

ফিরাউন বলল, তাহলে পূর্বে যেসব লোক অতীত হয়ে গেছে তাদের অবস্থা কি ছিল ? মূসা বলল, এ সম্পর্কিত জ্ঞান আমার প্রভুর কাছে একটি গ্রন্থে সুরক্ষিত আছে। আমার রব না পথহারা হন, না ভুলে যান।

—সূরা ত্বাহা ঃ ৫১-৫২

মহান আল্লাহ্র জ্ঞান এমন একটি সূর্য যার আলোকরশ্মি সমগ্র গুপ্ত স্থানকেও আলোকিত করে রেখেছে। যেখানেই এই আলোকরশ্মি পতিত হয় তার ভেতর ও বাহির সব উজ্জ্বল করে দেয়। সমস্ত গুণবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং প্রতিটি জিনিসের রহস্য ও তাৎপর্য আয়নার মত সামনে এসে যায়। কোন জিনিস প্রকাশ্য হোক অথবা গুপ্ত, সামনে হোক অথবা পর্দার আড়ালে, দূরে হোক অথবা কাছে—তাঁর জ্ঞানের সামনে সবই সমান।

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ · وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ·

কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহর দিকে বর্তায়। মুকুল থেকে যেসব ফল বের হয় সে সম্পর্কেও তিনি জানেন। কোন্ স্ত্রীলোক গর্ভবতী হল এবং কে সন্তান প্রসব করল তাও তাঁর জ্ঞানে রয়েছে।

—সূরা হামীম সাজদা ঃ ৪৭

আল্লাহ্র জ্ঞান প্রতিটি জিনিসের পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছে। তিনি তাঁর গোটা সৃষ্টির ওপর নযর রাখেন। যমীনের বুকে বিশাল মরুভূমিতে যত বালুকণা

রয়েছে, সাগর-মহাসাগরে পানির যত ফোটা রয়েছে, বাগান এবং বন-জঙ্গলের গাছপালায় যত পাতা রয়েছে, প্রতিটি শাখায় যত ফল এবং প্রতিটি ছড়ায় যত শস্যদানা রয়েছে, মানুষের মাথায় এবং পশুর চামড়ায় যত লোম রয়েছে— আল্লাহ্‌র জ্ঞানের এক ক্ষুদ্রতম অংশ এর হিসাব রাখার জন্য যথেষ্ট। অনন্তর এসব জিনিসের যে অবস্থান্তর হয়ে থাকে, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এদের যে সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে এবং এগুলোর সাথে যে গুণবৈশিষ্ট্য যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে—তা সবই আল্লাহ্‌র জ্ঞানে রয়েছে। অথচ এতসব কিছুর খোঁজ রাখা আমাদের জ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ. اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۔

> তোমরা একান্তে কথা বল কিংবা উচ্চস্বরে—তিনি তো মনের গহীনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন। তিনি কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন ? অথচ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সুবিজ্ঞ। —সূরা মূল্‌ক্ ঃ ১৩-১৪

এই সুপ্রশস্ত জ্ঞান এবং পূর্ণ অবহিতি সেই মহান সত্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো আল্লাহ্ তাআলা কারো কারো জ্ঞানের সামনে তার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী বিশ্বজগতের কিছু রহস্য উদ্ভাসিত করেন অথবা কোন অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করে দেন। কিন্তু তাও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও কল্যাণকারিতার অধীনেই হয়ে থাকে। এই সুযোগ মানুষ যতদূর পৌঁছতে পারে তাও সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। তাদেরকে খুব কমই দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা পরিষ্কার ভাষায় তিনি নিজ কিতাবে তুলে ধরেছেন ঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۔

সমস্ত গায়েবের (অদৃশ্য জগৎ) চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও জলভাগে যা কিছু আছে তার সব কিছুই তিনি জানেন। গাছ থেকে পতিত এমন একটি পাতাও নেই যা তিনি জানেন না। জমির অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি শস্যদানাও এমন নেই যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। ভিজা এবং শুকনা জিনিসও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। এ সব কিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। —সূরা আনআম ঃ ৫৯

শ্রবণ ও দর্শন

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যাবতীয় প্রশংসা মহান সত্তার জন্য যাঁর কান সমস্ত আওয়াজ শুনে থাকে। ঝগড়াকারিণী 'খাওলা' রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। তিনি ঘরের এক কোণে বসে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। আমি তাঁর কথা শুনতে পাইনি। আল্লাহ্ তাআলা সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনলেন এবং এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۔

আল্লাহ্ সেই মহিলাটির[১] কথা শুনতে পেয়েছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করতে থাকছে। আল্লাহ্ তোমদের উভয়ের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা —সূরা মুজাদালা ঃ ১

নিশ্চিতই মানুষের মধ্যে যে কথোপকথন হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে যে আলোচনা ও পরামর্শ হয়ে থাকে—দয়াময় আল্লাহ্‌র কান সবকিছুর আগেই তা শুনে নেয়। তবে কখনো এরূপ ধারণা করো না যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন একদল লোকের কথাবার্তা শুনেন তখন অন্যদের কথা থেকে বেখবর হয়ে যান। তা

---

১. মহিলাটির নাম খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ)। তিনি খাজরাজ গোত্রের কন্যা ছিলেন তাঁর স্বামীর নাম আওস ইবনে সামিত আনসারী (রাঃ)। তিনি আওস গোত্রের সরদার উবাদা (রাঃ)-র ভাই ছিলেন। বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনে অত্র সূরার থেকে ১১ নং টীকা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য। —অনুবাদক

কখনো নয়! কোন কথা শুনতে গিয়ে তিনি অন্য কোন কথা থেকে অমনোযোগী হয়ে যান না। গন্ডগোল ও হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও যদি কোন গোপন পরামর্শ হয়ে থাকে—তা থেকেও তিনি অনবহিত নন। যে ভাষায়ই কথা বলা হোক না কোন—প্রতিটি ভাষাই শুনেন ও বুঝেন।

মানুষ কত উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করতে পেরেছে। তা নিয়ে তোমরা প্রাচ্যে বসে থাক এবং পাশ্চাত্য থেকে খবরাখবর, আলোচনা, বক্তৃতা, গান, নাটক ইত্যাদি প্রচারিত হয়। এতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তা তোমাদের কাছে পৌছে যায়। তোমরা ঘরে বসেই এসব শুনতে পাও এই মহাবিশ্বে যে কত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তার কতটুকুইবা আমরা জানি ? বিবেকবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে এটা মোটেই কঠিন কিছু নয় যে, এই বিশ্বজাহানের রব এই বিশ্বে সংঘটিত প্রতিটি স্পন্দন, প্রতিটি নড়াচড়া এবং প্রতিটি আওয়াজ একই সময় শুনে থাকেন। চাই তা যত দূরে অথবা কাছেই সংঘটিত হোক না কেন—আল্লাহ্র কাছে দূরত্ব ও কাছে উভয়ই সমান অতএব তিনি প্রতিটি গতি ও স্থিতি লক্ষ্য করেন, যাবতীয় শব্দ শুনতে পান এবং প্রতিটি রহস্য সম্পর্কে অবহিত। নিঃসন্দেহে কোন একটি শব্দও তোমার প্রতিপালকের সামনে গোপন নয়। এমন কিছু আওয়াজ আছে যা তিনি শুনেন এবং পছন্দ করেন। হাদীসে এসেছে ঃ

مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ اَذِنَهُ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهٖ ·

> আল্লাহ্ তাআলা কোন নবীর সুললিত কণ্ঠের আওয়াজ যেভাবে শোনেন অন্য কোন আওয়াজ সেভাবে শোনেন না। তা হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে থাকে।

কুরআন পাঠ শুনে তিনি যেভাবে খুশি হন, খারাপ কথা শুনে তিনি তদ্রূপ অসন্তুষ্ট হন। কুরআনের বাণী ঃ

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ · وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ·

মানুষ খারাপ কথা বলুক—তা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। তবে কারো ওপর জুলুম করা হয়ে থাকলে (সে যদি খারাপ কথা বলে ফেলে) অন্য কথা। আল্লাহ্ সব কিছুই শুনেন এবং সব কিছুই জানেন।

—সূরা নিসা ঃ ১৪৮

তোমাকে যদি বলা হয়, আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি দেহের প্রতিটি হৃদকম্পনও শুনে থাকেন, তাহলে এটা অত্যুক্তি হবে না। হৃদয় তো তাঁর কুদরতেরই একটি নিদর্শন। তিনি এর মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দেন আর তা একটি নির্দিষ্ট সময় স্পন্দিত হতে থাকে। অতএব যে জিনিস তাঁরই সৃষ্ট, এর কম্পন শুনা তাঁর জন্য কি কোন কষ্টকর বিষয় ?

তিনি প্রতিটি আওয়াজ যেভাবে শুনতে পান, অনুরূপভাবে তিনি প্রতিটি জিনিস দেখতে পান। যত গভীর অন্ধকারই হোক না কেন সেখানেও তাঁর দৃষ্টি পৌছে যায়। কোন জিনিস যেখানেই লুকিয়ে থাক না কেন, তাও আল্লাহ্র দৃষ্টির বাইরে নয়। যত সূক্ষ্ম কথাই হোক অথবা গহীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন জিনিসই হোক—তিনি কোন জিনিস দেখার জন্য আলোর মুখাপেক্ষী নন এবং কোন সূক্ষ্ম কথা শুনার জন্য তাঁর কোন শ্রবণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। যখন তুমি দুইজন লোকের সাথে কথা বল তখন মনে রেখ চতুর্থ এক সত্তা তোমাদের সব কিছুই দেখছেন এবং শুনছেন। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ مَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا .

আসমান ও যমীনের সব গোপন অবস্থা তাঁরই জানা আছে। তিনি কত সুন্দরভাবে দেখেন এবং কত সুন্দরভাবে শুনেন। যমীন ও আসমানের সব সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তাঁর রাজ্য শাসনে কাউকেও অংশীদার করেন না। —সূরা কাহ্ফ ঃ ২৮

আল্লাহ্ তাআলা যখন মূসা ও হারুন আলায়হিমাস সালামকে ফিরাউনের কাছে পাঠান তখন তার অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে তাঁরা শংকিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন ঃ

قَالاَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ٠

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, সে আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে কিংবা সীমালংঘনমূলক আচরণ করবে।
—সূরা ত্বাহা : ৪৫

তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন :

قَالَ لاَ تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى ٠

তিনি বলেন, তোমরা ভয় পেও না। আমি তোমাদের সাথেই আছি, সবকিছুই শুনছি ও দেখছি। —সূরা ত্বাহা : ৪৬

আল্লাহ্ তাঁদের উভয়ের সাথে ছিলেন এবং সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মাখলুকের সাথেই আছেন এবং পরবর্তীকালেও থাকবেন। তিনি সবকিছুই শুনেন ও দেখেন। এই মহান সত্তা আমাদের দেহে চক্ষু সংযোজন করেছেন এবং এর সাহায্যে আমরা বই পড়ি, লেখি এবং যেভাবে ইচ্ছা দেখতে পারি। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার প্রশস্ত ও সর্বব্যাপক দৃষ্টির সাথে কি এর কোন তুলনা চলে ? যদি দুনিয়ার সব চোখ একত্র হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করে তাহলেও আল্লাহ্র দৃষ্টির তুলনায় এদের দৃষ্টিশক্তির কোন তাৎপর্য নেই। আল্লাহ্র দর্শন ক্ষমতার আমরা কি জানি ? তিনি একই সময় সমগ্র সৃষ্টি জগতকে দেখতে পান। কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে না। রাতের গভীর অন্ধকারে কোন জিনিস লুকিয়ে থাক, অথবা দিনের উজ্জ্বল আলোয় চলাফেরা করুক, মানুষের দৃষ্টির সামনে হোক অথবা জনবসতি থেকে অনেক দূরে থাক সবই তাঁর জন্য সমান। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلاَتَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَلاَ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ٠

হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন এবং কুরআন থেকে যা কিছু শুনাও ; আর হে লোকেরা, তোমরাও যা কিছু কর সব অবস্থায়ই আমরা তোমাদের দেখি এবং লক্ষ্য করি। আসমান ও যমীনে এক বিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নেই—না ছোট, না বড়—যা তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে, এ সবই এক পরিচ্ছন্ন দফতরে লিপিবদ্ধ আছে। —সূরা ইউনূস ঃ ৬১

এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করা দীনের অংশবিশেষ, বরং সত্য কথা এই যে, এটা দীনের সুউচ্চ গম্বুজ। নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ

اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ .

ইহসান এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ। তুমি যদি তাকে না দেখতে পাও তাহলে (এই অনুভূতি জাগ্রত কর যে) তিনি তোমায় দেখছেন। —বুখারী, মুসলিম

'বান্দা আল্লাহকে দেখছে'—এই অবস্থা তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন বান্দার মন-মগজে এই অনুভূতি ক্রিয়াশীল হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি বান্দার প্রতিটি কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন, তিনি প্রতিটি গতি ও স্থিতি লক্ষ্য করছেন এবং গোপন-প্রকাশ্য সব কিছুরই জ্ঞান রাখেন ; তাঁর সামনে প্রতিটি মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। এটাই হচ্ছে তাকওয়ার মজ্জা এবং ইখলাস ও নিষ্ঠার প্রাণশক্তি।

কালাম বা কথা

মনে ভাব, অনুভূতি ও জ্ঞাত তথ্য প্রকাশ করার নাম হচ্ছে কথা বা ভাষা। কোন কিছু বলা, অন্যকে কিছু বুঝানো, উপদেশ দেওয়া এবং কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার মাধ্যম হচ্ছে এই কালাম বা ভাষা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার মাঝেও এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি গোটা সৃষ্টি জগতে জীবন-মৃত্যুর ধারাবাহিকতা চালু রেখেছেন। অসংখ্য ফেরেশতা এ কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। লক্ষ কোটি ফেরেশতাকে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন যার কোন খবরই আমরা রাখি না।

এই স্থায়ী বিশ্বব্যবস্থায় নিয়ত রুযী বন্টিত হচ্ছে। কেউ সম্মানিত হচ্ছে, কারো সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, কেউ উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে, কেউ পতনের দিকে ছুটে যাচ্ছে, কোন নির্দশন বিলুপ্ত হচ্ছে, কোনটির ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা চালু হচ্ছে। এসব কিছুই আল্লাহ তাআলার স্থায়ী ব্যবস্থাপনার অধীনে ঘটছে।

আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানভাণ্ডারে যা আছে তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই। যেসব বাক্যে তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটছে তারও কোন শেষ নেই। আমাদের অবস্থা এই যে, ছোটখাটো কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আমাদের বিরাট শব্দকোষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অতএব রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যিনি এই সৃষ্টি জগৎ পরিচালনা করছেন এবং এই বিরাট রাজ্যের ওপর শাসনক্ষমতা চালাচ্ছেন ? তোমাদের জ্ঞান কি এই সাক্ষ্যও দেয় না যে, বাস্তবিকই তাঁর কথা, তাঁর বাক্য এবং তাঁর জ্ঞানভান্ডার এত ব্যাপক ও বিস্তারিত যা তিনি তাঁর কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلاَمٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ·

যমীনের বুকে যত গাছ্ আছে সবই যদি কলম হয়ে যেত, সমুদ্র যদি কালি হয়ে যেত এবং একে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ্ করত তবুও আল্লাহ্র কথাগুলো লেখা শেষ হত না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা প্রবল পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী। —সূরা লুকমান ঃ ২৭

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ·

হে মুহাম্মাদ! বল, সাগর-মহাসাগরগুলো যদি আমা রপ্রভুর কথাসমূহ লেখার জন্য কালি হয়ে যায় তাহলে তা ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আমার প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হবে না। বরং আমরা যদি আরো এত পরিমাণ কালি এনে নেই তবে তাও যথেষ্ট হবে না।

—সূরা কাহ্ফ ঃ ১০৯

যেসব মহান ঐশী গ্রন্থ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীদের উপর নাযিল করেছেন তা তাঁর কথার উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করে। আল্লাহ্ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর অনেক বান্দাকে এই সম্মান দান করবেন। তিনি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে সর্বশেষ ওহী নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়েছেন। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তাআলার কথার সমষ্টি এবং মানব জাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশিকা। এর পর ঐশী কিতাব নাযিল হওয়ার ধারা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً . لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

তোমার রবের কথা সত্যতা ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তাঁর কথার পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। —সূরা আনআম ঃ ১১৫

তবে আল্লাহ্ তাআলার কথা বলার ধরন সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এটা এমন একটি বিষয় যা আমাদের জ্ঞানসীমার বাইরে এবং অনেক উর্ধ্বে। সে পর্যন্ত পৌছা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, মুখ ও ঠোঁটের সাহায্যে সৃষ্ট কথার নাম আল্লাহ্র কথা নয়, এটা মানুষের কথা।

তুমিই আল্লাহ্ তুমিই মাওলা

কল্পনার পাখা যখন আকাশ পানে ছুটে চলে-যেখানে রাতের বেলা তারকারাজির সমাবেশ ঘটে, দৃষ্টি যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সীমাহীন বিশ্ব পরিভ্রমণ করতে গিয়ে থমকে যায়, যখন নীরবতার আতংক ছেয়ে যায় এবং অন্তর যখন বিনয় ও নম্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়-তখন তোমার নূরালোকিত চেহারা দিকচক্রবালে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তোমার মধুর আওয়াজ কানের পর্দায় বেজে উঠে এবং তোমার মহত্ব ও গৌরব বিনম্র ও প্রশান্ত আত্মাগুলোকে নিজের বক্ষে টেনে নেয়। এ সময় এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বপ্রকৃতিকে উজ্জ্বল ও আনন্দমুখরিত মনে হয়, নীরবতা-নিস্তব্ধতা প্রশংসা গীতির সুর-মূর্ছনায় পরিণত হয়। এই গানের

সুর-মূর্ছনা সর্বদিকে গুঞ্জরিত হতে থাকে। আর এই সময় বিনম্র ও প্রশান্ত আত্মাগুলোও গেয়ে উঠে ঃ "তুমিই আল্লাহ্ তুমিই মাওলা।"

যখন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অথৈ সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দূরে বহু দূরে পর্যন্ত নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়, যেখানে নীল আকাশ সমুদ্রের নীল পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে, যেখানে বিকেলের সূর্য ধীরে ধীরে অস্তাচলে ঢলে পড়ে, মনে হয় যেন সোনার একটি থালা সমুদ্রের বুকে হারিয়ে যেতে চাচ্ছে, যখন অস্তগামী সূর্যের লাল আভা দিক-চক্রবালে পাল তোলা নৌকার মত ভেসে বেড়াতে থাকে—যেন একটি পাখি অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে সাঁতার কাটছে—তখন তার মনে এমন এক মহান সত্তার কথা ভেসে উঠে, যাঁর সামনে এই অথৈ সমুদ্র মূল্যহীন এবং খুবই নগণ্য মনে হতে থাকে।

এই দৃশ্য অবলোকন করে তার চোখ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সে চিন্তা করতে থাকে পানির সমতল বুক চিরে নৌযানগুলো স্বয়ং সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তাআলার অসীম রহমতে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানেই নিরাপদে অগ্রসর হচ্ছে। এ যেন এক মহান সত্তার মহানত্বের প্রদর্শনী। এ এমন এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য যা রূহ ও আত্মাকে শান্ত-শীতল করে দেয়। এ সময় মনের মণিকোঠায় খটখট শব্দ হয় এবং আত্মা সশব্দে চিৎকার করে উঠে ঃ "তুমি আল্লাহ্ তুমিই প্রভু।"

সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজ যখন তীর থেকে অনেক দূরে গহীন সমুদ্রের মাঝে চলে যায়, হঠাৎ ভয়ংকর তুফান উত্থিত হয়, তীব্র বেগে বাতাস বইতে থাকে, সমুদ্রের উপরিভাগ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়, আসমান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, বিজলীর চমকে চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, মেঘের গর্জনে মন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টির বেগ আরো তীব্র হতে থাকে, উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ ওলট-পালট খেয়ে নাচতে থাকে, নাস্তিকও থমকে গিয়ে আল্লাহ্ আল্লাহ্ ডাক শুরু করে দেয়, জাহাজের কাপ্তান নিরাশায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, জাহাজ প্রায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, চতুর্দিক থেকে কেবল মৃত্যুঘন্টা বাজতে থাকে—এই মহাবিপদের মধ্যে হঠাৎ আশার আলো দেখা দেয়, অন্ধকার ঘনঘটার মধ্যে তোমার নূর জ্বলে উঠে, বিপদের মেঘ কেটে যেতে থাকে এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহ এই নিরাশ্রয় ও বিপদগ্রস্ত মানুষগুলোকে নিজের কোলে টেনে নেয়। এ সময় অন্তর ও মুখ নিজের অগোচরে সমস্বরে চিৎকার করে উঠে ঃ "তুমি আল্লাহ্, তুমিই মাওলা।"

ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে, সহানুভূতিশীলদের দোয়া ও বন্ধু-বান্ধবের সেবা-যত্নের মধ্যে অবস্থানকারী রোগীর অবস্থা যখন নাজুক হয়ে যায় তখন সে কল্যাণ কামনাকারীদের দোয়া এবং বন্ধুদের আশার মাঝে নিথর হয়ে পড়ে থাকে। ডাক্তার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েও নিরাশ হয়ে যায়, বন্ধুদের সহানুভূতি নিষ্ফল প্রমাণিত হয়, বাঁচার যে ক্ষীণ আশা ছিল তাও নিরাশায় পরিণত হয়ে যায়, রোগীর উপর সবার মাথা ঝুঁকে পড়ে, হাত-পা ও অন্তর কাঁপতে থাকে,কলিজা মুখে এসে যায়—এই কঠিন মুহূর্তে তুমি আত্মপ্রকাশ কর এবং কানে বেজে উঠে, "আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি।" এ সময় ডাক্তার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, হিতাকাঙ্ক্ষী সবার মুখে একই কথা ফুটে উঠে, "নিঃসন্দেহে তুমিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক, তুমিই আল্লাহ্, তুমিই প্রভু।"

যখন কোন ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিদায় হতে যাচ্ছে এবং দুনিয়াও তাকে বিদায় দিতে যাচ্ছে, ধনসম্পদ তার হাত থেকে খসে যাচ্ছে, মান-সম্মান ও পদমর্যাদা খতম হয়ে যাচ্ছে, আশা-আকাঙ্ক্ষার সমস্ত ফুল ঝরে পড়ছে, চাওয়া-পাওয়ার দীপশিক্ষা নিভে যাচ্ছে, স্বাদ-গন্ধ রুচিহীন হয়ে যাচ্ছে, হাসি-খুশি, আনন্দ বিষাদে পরিণত হচ্ছে, এ সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি তার মন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে, আশা-আকাঙ্ক্ষার আগুনে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন তোমার স্মরণই প্রশান্তির বাহন হয়ে দাঁড়ায় ঃ "তুমিই আল্লাহ্, তুমি মাওলা।"

বাগানে যখন কোন সুন্দর ফুল দেখা যায়, যখন চোখ এমন কোন চোখের সাথে মিলিত হয়, যার মধ্যে সৌন্দর্য রয়েছে, যখন ভোরের আভা অন্তরকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে এবং পাখির কলগুঞ্জন কানের মধ্যে মধু ঢেলে দেয়, যখন বুক আনন্দে ভরে যায়, যখন অন্তর খুশিতে গদগদ করে, এ সময় আমাদের অন্তরে তোমার হৃদয়গ্রাহী চমক খেলে যায়। আমরা অনুভব করতে থাকি ঃ "তুমিই আল্লাহ, তুমিই মাওলা।"

লোকেরা যখন শ্রেষ্ঠত্বের দ্যুতি, কুদরতের খেলা, দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন, সৌন্দর্য ও গৌরবের আলোকচ্ছটা এবং স্থায়িত্বের প্রদর্শনী দেখতে পায় তখন বলে, তুমি মহান, তুমি দয়ালু, তুমি সৌন্দর্যের প্রতীক, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি স্বাধীন, চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব। অন্তরের তারে একটি গানই বেজে উঠে ঃ

انْتَ انْتَ اللّٰهُ انْتَ انْتَ اللّٰهُ .

তুমিই আল্লাহ্ তুমিই আল্লাহ
তুমিই মাওলা তুমিই মাওলা।

৪

তাকদীর (ভাগ্যলিপি)

তাকদীরে বিশ্বাস

ইসলামের যেসব আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, কাযা ও কদর বা তাকদীরের ওপর ঈমান আনাও সেই আকীদা-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্‌ পাকের মহান সত্তা, তাঁর সুন্দর নামগুলো এবং তাঁর মহান গুণাবলীর সঠিক পরিচয় লাভ করার ওপরই ঈমান বিল্লাহের ভিত্তি স্থাপিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ তাআলা যেকোন দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ, সম্মান ও মর্যাদা, সৌন্দর্য ও মহত্ব সব দিক থেকেই পরিপূর্ণ। তিনিই যাবতীয় প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۔ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۔

তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। তিনি তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। -সূরা আলা ঃ ২-৩

একজন মুমিন বান্দাকে যেখানে আরো অনেক বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হয় তার সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপরও ঈমান আনতে হয় এবং মনকে নিশ্চিন্ত করতে হয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তাঁর ইচ্ছা সব কিছুর ওপর কার্যকর রয়েছে, তাঁর শক্তি সব কিছুকে আয়ত্ত করে রেখেছে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং তিনি ভাল করেই জানেন তাঁর কি করা উচিত।

এসব গুণ তাকদীর বিশ্বাসের ভিত্তি। সুতরাং তাকদীরের ওপর ঈমান আনা ছাড়া আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। এটা হচ্ছে ঈমানের সেই মৌলিক উপাদন যা ছাড়া আল্লাহ্‌র ওপর ঈমানের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন। কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত নয়। বালির মধ্যে সন্তরণকারী পিঁপড়াই হোক অথবা মহাশূন্যের বেগবান তারকাই হোক, সব কিছুই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করছে। এই বিরাট পৃথিবী, সীমাহীন বিশ্ব, এই যুগ-যুগান্তরের মধ্যে প্রসারিত কালের পরিক্রমা—এ সবই তাঁর জ্ঞানের আওতায় অবস্থান করছে। যুগ-যুগান্তের কোন একটি মুহূর্ত, পূর্ব ও পশ্চিমের কোন একটি স্থান তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়।

জীবনের ঘটনাপঞ্জী-কখনো প্রাচুর্য, কখনো দুঃখ-দারিদ্র্য, কখনো আশার আলো, কখনো নিরাশার অন্ধকার, কখনো আনন্দের বন্যা, কখনো কান্নার রোল, কখনো বিলাপ, কখনো গানের সুর-মূর্ছনা প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা অবগত রয়েছেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .

আসমান ও যমীনের এক বিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নেই, না ছোট না বড়, যা তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে। এই সবই এক পরিচ্ছন্ন দফতরে লিপিবদ্ধ আছে। —সূরা ইউনুস ঃ ৬১

এই দফতরে তাকদীরও লিপিবদ্ধ রয়েছে, সমস্ত জিনিসের পরিণতি এবং প্রতিটি কাজের ফলাফলও তাতে লিপিবদ্ধ আছে। সফলতা, ব্যর্থতা, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য সবকিছুই তাতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান কি ঐ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম ?

اِنَّمَا الْغَيْبُ كِتَابٌ صَانَهُ

عَنْ عُيُوْنِ الْخَلْقِ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

لَيْسَ يَبْدُوْ مِنْهُ لِلنَّاسِ سِوٰى

صَفْحَةُ الْحَاضِرِ حِيْنًا بَعْدَ حِيْنٍ .

"গায়েব একটি বই—
পাতাগুলো যার বন্ধ করা,
তাকে রেখেছেন রাব্বুল আলামীন
সৃষ্টির দৃষ্টির আড়ালে।
তার ভেতর থেকে শুধু
বর্তমানের পাতাগুলো তিনি
মেলে ধরেন নির্দিষ্ট সময় অন্তর।"

জীবনের ঘটনাবলী, মানবীয় কার্যক্রম, ব্যস্ততা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাকদীরের দুটি অবস্থা রয়েছে। এই দু'টি অবস্থা পরিষ্কার ও পরস্পর বিরোধী। ফলাফলের দিক থেকেও তা পরস্পর বিপরীত। তাকদীরের এই দুটি অবস্থার পৃথক পৃথক সীমা বা ক্ষেত্র রয়েছে। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে দীন অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় এবং মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এখানে আমরা তাকদীরের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করব।

আমাদের অক্ষমতার সীমা

এই পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা আল্লাহ্‌র কুদরতের অনন্য দৃষ্টান্ত বহন করে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা অস্তিত্ব লাভ করে এবং মানুষের মাঝে কার্যকর হয়। মানুষ তা পছন্দ করুক বা না করুক, এ সম্পর্কে তাদের অনুভূতি থাক বা না থাক। জ্ঞানবুদ্ধি এবং এর প্রখরতা বা স্থুলতা, মেযাজ এবং এর নম্রতা বা রুক্ষতা, দেহ এবং এর দীর্ঘাকৃতি বা খর্বাকৃতি চেহারার সৌন্দর্য বা অসৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব এবং এর পূর্ণতা বা অপূর্ণতা ; যে যুগে তুমি জন্মেছ, যে স্থানে তুমি বসবাস করছ, যে পরিবেশে তুমি বেড়ে উঠছ, যে পিতা-মাতার কোলে লালিত-পালিত হয়েছ, উত্তরাধিকারসূত্রে তোমার মধ্যে যে আবেগ ও ঝোঁকপ্রবণতা পেয়েছ ; জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা, প্রাচুর্য-দারিদ্র্য এবং এ জাতীয় যত জিনিস রয়েছে তাতে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই। প্রকাশ্যে ও গোপনে কেবল তাকদীরের অদৃশ্য আংগুলই গতিশীল রয়েছে এবং তা জীবনকে তার প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাণচঞ্চল করে রাখছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٠

আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিসই আল্লাহ্‌র কাছে গোপন নয়। তিনিই তো তোমাদের মায়েদের গর্ভে তোমাদের আকার-আকৃতি নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে থাকেন। বাস্তবিকই এই মহান বুদ্ধিজ্ঞানের মালিক ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫-৬

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এগুলো এমন জিনিস নয় যার ওপর আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে পারে অথবা এগুলোর হিসাব-নিকাশ হতে পারে। আমরা কেবল এজন্যই তোমাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করছি যেন তোমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমাদের ভাষা, জাতীয়তা ইত্যাদির উপর আমাদের কোন এখতিয়ার নেই। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত এই সত্যেরই ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٠ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ٠ وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٠

তোমার রব যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন এবং (তিনি নিজের কাজের জন্য যাকে ইচ্ছা) বাছাই করে নেন। বাছাই করে নেওয়াটা এই লোকদের কাজ নয়। এই লোকদের আরোপিত শিরক থেকে আল্লাহ্ পাক-পবিত্র এবং সুমহান। এই লোকেরা যা কিছু নিজেদের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে আর যা কিছু প্রকাশ করে — তোমার রব তা সবই জানেন। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। দুনিয়া এবং আখিরাতে সর্বত্রই তাঁর জন্য প্রশংসা। শাসন-কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তাঁরই। তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

—সূরা কাসাস ঃ ৬৮-৭০

এ হচ্ছে তাকদীরের একটি শাখা—যার ওপর ঈমান আনা জরুরী এবং এর সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের কোন অভাব নেই। মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলো এমন বিষয় যার চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেছে। লোকদের তাকদীরে তা বন্টিত হয়ে গেছে। তাকদীরের লেখনি শুকিয়ে গেছে, তা মুছে ফেলা আর সম্ভব নয়।

এসব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন, তাঁর ইচ্ছায়ই এগুলোর প্রকাশ ঘটে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এগুলোর ব্যবস্থাপনা চলে। আমাদের এখানে কোন দখল নেই। আমাদের পূর্ববর্তীগণ এর ওপর পূর্ণ ঈমান রাখতেন। তাঁরা সত্যনিষ্ঠ এবং পরিপক্ক ঈমানের অধিকারী ছিলেন। এজন্য এগুলোর সুপ্রভাব তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁরা যখন জানতে পারতেন তাদের জীবনকালের সীমা নির্দিষ্ট হয়ে আছে, ভয়ের কারণে তা বৃদ্ধিও পায় না এবং সাহসিকতার কারণে তার ঘাটতিও হয় না—তখন তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাদেন কানে আল্লাহ্র এ বাণী বাজতে থাকত ঃ

قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ٠

তাদের বল ! ভাল কিংবা মন্দ কিছুই আমাদের হয় না, হয় শুধু তাই যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। তিনিই আমাদের মনিব। ঈমানদার লোকদের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত।

—সূরা তাওবা ঃ ৫১

তাকদীরের কাছে প্রত্যাবর্তন এবং আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের অনেক সুযোগ এসে থাকে। এটা মানুষের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়, উৎস, আবেগও অসম সাহস সৃষ্টি করে। অতএব সে ধৈর্য, অবিচলতা, উদ্যম ও উৎসাহে সম্পূর্ণরূপে বিহ্বল হয়ে যায়।

এখানে আমরা স্বাধীন

তাকদীরের দ্বিতীয় অংশ আমাদের বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সম্পৃক্ত। এ ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমরা যখন কোন কাজ করি তখন পরিষ্কারভাবে অনুভূত হয় যে, আমাদের বুদ্ধি-বিবেক জাগ্রত আছে, অন্তর সর্তক আছে এবং আবেগ গতিশীল রয়েছে।

কর্মময় জীবনে আমরা কতটুকু স্বাধীন ? আমাদের কর্মতৎপরতায় আমরা কতদূর স্বাধীনতা ভোগ করি ? আমরা নিজেদের কাজকে তাকদীরের সাথে সংশ্লিষ্ট করে থাকি—এর অর্থইবা কি ?

ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ। ইনশাআল্লাহ্ এ সম্পর্কে আমরা এমন আলোচনা করব যাতে বিবেক-বুদ্ধি আলো পেতে পারে, অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং এ সম্পর্কে যাবতীয় সংশয় ধূলির মত উড়ে যায়।

যেসব কাজ আমাদের ইচ্ছা ও এখতিয়ারাধীন তা করতে গিয়ে আমাদের পরিষ্কার মনে হয় এগুলো আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করে যাচ্ছি এবং এ ব্যাপারে আমরা পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। আমরা ইচ্ছা এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন—এটা মেনে নেওয়ার জন্য আমাদের এই অনুভূতিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তি বলতে পারে না, তা যথেষ্ট নয়। কারণ অনুভূতিও কোন কোন সময় ভুল করে বসে। সুতরাং কেবল অনুভূতির ওপর নির্ভর করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে না।

সর্বপ্রথম আমাদের দেখা উচিত এ সম্পর্কে কুরআন মজীদ আমাদের কি বলে ? এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন কুরআন অধ্যয়ন করি তখন আমরা আশ্বস্ত হয়ে যাই যে, আমাদের এই অনুভূতি নির্ভুল। যারা অনুভূতির এই সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দিতে চায় না তাদের অনুসৃত পন্থা সঠিক নয়। কুরআন এই অনুভূতির ওপর জোর দিচ্ছে এবং মানবীয় ইচ্ছার স্বাধীনতা ঘোষণা করছে ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۔

> পরিষ্কার বলে দাও, এই মহাসত্য তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নেবে, আর যার ইচ্ছা অমান্য বা অস্বীকার করবে। —সূরা কাহ্ফ ঃ ২৯

কুরআন এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, মানুষ নিজের ইচ্ছায় যা কিছু করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী এবং একদিন তাকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۔

বল, হে লোকেরা ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য এসেছে। এখন যে লোক সোজা পথ অবলম্বন করবে, তার এই সোজা পথ অবলম্বন তার জন্যই কল্যাণকর হবে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে, তার গোমরাহী তার জন্যই ক্ষতিকর হবে। আমি তোমাদের উপর কোন কর্তৃত্বধারী নই। —সূরা ইউনূস ঃ ১০৮

এই দীনের প্রকৃতি হচ্ছে কষ্ট স্বীকার এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। মানুষের যদি স্বাধীনতাই না থাকে তাহলে পরীক্ষার প্রশ্ন আসে কি করে ? আর পুরস্কার বা শাস্তির প্রশ্নই বা কি করে উঠতে পারে, যদি তার সামনে স্বাধীনভাবে কাজ করার বিস্তৃত ক্ষেত্র না থাকে ? কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে যেসব আয়াত এসেছে এখানে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা গোটা কুরআনই এই সত্যের প্রমাণ বহন করছে।

আমাদের যাবতীয় কাজকর্মের সংবাদ কি পূর্ব থেকেই আল্লাহ্র জ্ঞানে রয়েছে ? তিনি কি আগে থেকেই জানেন আমরা ভবিষ্যতে কি করব ? হাঁ, তিনি আমাদের সবকিছুই জানেন। আমাদের কোন কাজই তাঁর জ্ঞানসীমার বাইরে নয় :

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّىْ وَلاَ يَنْسَى ٠

এ সম্পর্কিত জ্ঞান আমার প্রভুর কাছে একটি গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে। আমার প্রভু পথহারাও হন না এবং ভুলেও যান না।

—সূরা ত্বাহা ঃ ৫২

কিন্তু এ দুটি জিনিস একই সময় কি করে সম্ভব হতে পারে যে, আমাদের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতাও রয়েছে আবার আমাদের কোন কাজই আল্লাহ্র জ্ঞানসীমার বাইরেও নয় ? এর জবাব অত্যন্ত সহজ। তুমি নিজের চেহারাকে বিকৃত করে একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যাও। তুমি নিজের হাতে নিজের চেহারাকে যেভাবে বিকৃত করেছ—আয়নার মাঝে ঠিক সেই দৃশ্যই দেখতে পাবে। এখানে আয়নার কি দোষ ? সে তো তোমার সামনে তোমার অবিকল চেহারাই তুলে ধরছে। পক্ষান্তরে তুমি যদি তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আয়নার সামনে তুলে ধরতে তাহলে সে তোমার চোখের সামনে অনুরূপ জিনিসই তুলে ধরত।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্র জ্ঞান হচ্ছে একটি আয়না স্বরূপ। এর মধ্যে যাবতীয় কাজকর্মের অবিকল দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কাজের ওপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। এই আয়না যাবতীয় কাজের অধীন, কাজ তার অধীন নয়। অথবা বলা যায়, আয়না হচ্ছে কাজের প্রতিবিম্ব, কাজ আয়নার প্রতিবিম্ব নয়। আল্লাহ্র জ্ঞান নামক আয়নার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে কেবল বর্তমানের দৃশ্যই নয় বরং অতীত ও ভবিষ্যতের দৃশ্যও দেখা যায়।

কোন জিনিস পূর্বে কেমন ছিল, বর্তমানে কিরূপ আছে এবং ভবিষ্যতে কেমন হবে—সব দৃশ্যই এই আয়নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং তার অবিকল চেহারাই উদ্ভাসিত হয়।

হিদায়াত ও গোমরাহীর অর্থ

এখানে আরো প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ্র ইচ্ছার সর্ব-ব্যাপক হওয়ার অর্থ কি ? গোটা সৃষ্টিকুল আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন কি করে হতে পারে ? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্ন কেন ? আল্লাহ্র ইচ্ছার সর্ব ব্যাপকতা এবং সৃষ্টির ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা— এ দুটি জিনিস কি করে একত্রে সম্মিলিত হতে পারে ?

এ প্রশ্নের জবাবও সহজ ; আল্লাহ্র কিতাবেই এর সমাধান পাওয়া যাবে। যে বুঝাতে চায় সে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

> আমরা এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ? —সূরা কামার ঃ ১৭

আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক আয়াতে যদি আল্লাহ্র ইচ্ছার সাধারণ প্রয়োগ উল্লেখ রয়েছে, তাহলে অন্য আয়াতে এর বিশেষ প্রয়োগ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছার প্রয়োগকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এক জায়গায় এর একচ্ছত্র প্রয়োগ উল্লেখ থাকলে অন্য জায়গায় তার শর্তসাপেক্ষ প্রয়োগ উল্লেখ আছে এবং সেখানে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতারও উল্লেখ আছে।

যদি কোথাও এরূপ বক্তব্য এসে থাকে যে, আল্লাহ্ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে গোমরাহ করে দিয়েছেন, তাহলে সেখানকার বক্তব্য এই যে, এই ব্যক্তি

হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে পছন্দ করেছে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পছন্দমাফিক তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। সে যে রাস্তায় চলা পছন্দ করেছে আল্লাহ তার সে রাস্তাকে সমতল করে দিয়েছেন। সে যে জিনিসের আকাংখা করেছে আল্লাহ্ তার জন্য তা সহজলভ্য করে দিয়েছেন।

তিনি তাকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٠

তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ও তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের হিদায়াত করেন না।
—সূরা সফ ঃ ৫

এখন দেখুন এ আয়াতে মানবীয় ইচ্ছা ও স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ٠

এবং যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হবে এবং তার সামনে হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও ঈমানদার লোকদের নিয়ম-নীতির বিপরীত চলবে—তাকে আমরা সেদিকেই চালাব যেদিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে এবং আমরা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। —সূরা নিসা ঃ ১১৫

অতএব ইচ্ছার প্রয়োগ সম্পর্কে এখন আর কি কোন অস্পষ্টতা বাকি আছে ? না। "ইউদিল্লু বিহি মান ইয়াশা" (তিনি যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন)-এর অর্থ সূরা বাকারার নিম্নোক্ত (২৬, ২৭) আয়াতের অর্থের অনুরূপ ঃ

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ٠ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ٠

তিনি শুধু ফাসিকদেরই বিভ্রান্ত করেন, যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেওয়ার পরতা ভঙ্গ করে।

"ইয়াহ্‌দী মান ইয়াশাউ" (তিনি যাকে চান হিদায়াত দান করেন)-এর অবস্থাও তদ্রূপ আল্লাহ্‌ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে দেখুন যে, মানবীয় ইচ্ছাকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۔

বল, আল্লাহ্‌ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর পানে ছুটে আসে তিনি তাকে সৎপথ দেখান। এসব লোকই ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করছে। শুনে রাখ! আল্লাহ্‌র স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়। —সূরা রা'দ ঃ ২৭-২৮

এ থেকে জানা গেল, যারা তাঁর দিকে অগ্রসর হয় তিনি তাদের হিদায়াত দান করেন। তিনি ফাসিক লোকদের হিদায়াত দান করেন না। এই মশাল হাতে নাও এবং প্রতিটি অবস্থা দেখে যাও। আল্লাহ্‌র দীনে কোথাও জটিলতা বা ভারসাম্যহীনতা খুঁজে পাবে না। জটিলতা ও ভারসাম্যহীনতা কেবল নির্বোধদের স্থূল জ্ঞানে এবং অলস ও সংজ্ঞাহীনদের অন্তরেই পাওয়া যায়।

এখানে কেউ এ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সীমাই বা কতদূর এবং মানুষের ইচ্ছার স্বাধীন প্রয়োগের সীমাই বা কোথায় শেষ হয়ে যায়?

তোমরা জান যে, একজন কৃষক তার জমিতে বীজ বপন করে, এর পরিচর্যা করে, আল্লাহ্‌ এর অংকুরোদগম করিয়ে তাতে আবার শস্যদানা সৃষ্টি করেন। এখন তোমরা ইচ্ছা করলে এই চাষীকেও কৃষক বলতে পার এবং তোমাদের এ বলাটা ভুল হবে না। কেননা সেও শস্য উৎপাদনের উপাদান সরবরাহ করেছে। আবার ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌ তাআলাকেও কৃষক বলতে পার। কেননা তিনিই চারাগাছের পরিবর্ধন করেছেন এবং তাতে ফসল ধরিয়েছেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۔ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا ۔

তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ—তোমরা এই যে বীজ বপন কর, তা থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর না আমরা উৎপাদন করি? আমরা ইচ্ছা করলে এই ফসলকে ভুষি বানিয়ে দিতে পারি।

—সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬৩-৫

ফসল উৎপাদনে একজন কৃষকের যে ভূমিকা—নিজের ভাগ্য গড়ায় একজন মানুষেরও অনুরূপ ভূমিকা রয়েছে। অতএব তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জীবনের কৃষিক্ষেত্রে নেকীর বীজ বপন করতে পার এবং আল্লাহ্র অসীম শক্তি তাকে একটি সুদৃশ্য বাগানে পরিণত করে দেবে। আর ইচ্ছা করলে তুমি তোমার জীবন ক্ষেত্রে দুষ্কৃতির বীজও বপন করতে পার এবং অদৃশ্য শক্তির হাত তাকে একটি কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পরিণত করে দেবে।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۔

এই লোকদের বল, তোমরা কাজ কর, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ সকলেই লক্ষ্য করবেন যে, তারপর তোমাদের কর্মনীতি কি হয়।

—সূরা তাওবা ঃ ১০৫

আল্লাহ্র দীন সম্পর্কে একটি মিথ্যাচার

লোকেরা সাধারণত বাধ্যবাধকতা এবং স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য করে না। তারা এই দুটি জিনিসের সীমাকে একত্র করে ফেলে। আমরা এখানে কেবল এতটুকুই বুঝাবার চেষ্টা করব যে, আখেরাতে যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ অনেকটা অংক ও হিসাব শাস্ত্রের অনুরূপই হবে। বান্দার যাবতীয় কাজকর্মে আল্লাহর যতটা দখল থাকবে—সে সম্পর্কে তার কাছে হিসাব-চাওয়া হবে না। কিন্তু সরাসরি তার হাত যা করেছে সে সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا ۔

আল্লাহ্ কারো ওপর একবিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না। কেউ যদি একটি নেকী করে তবে তিনি এটাকে দ্বিগুণ করে দেন।

—সূরা নিসা ঃ ৪০

কিন্তু একদল লোকের বক্তব্য হচ্ছে— আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি জিনিস লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তা কার্যকর করার জন্য তিনি লোকদের বাধ্য করেছেন। সে যা কিছু করেছে তা করতে সে বাধ্য এবং যা করছে না তাতেও সে বাধ্য। অতএব সে এক্ষেত্রে নিরুপায়, তার স্বাধীন ইচ্ছা বলতে কিছু নেই।

এই ধরনের বাতিল আকীদার শিকার হয়ে একদল ভণ্ড সূফী স্বচক্ষে গর্হিত কাজ হতে দেখে বাহু দোলাতে দোলাতে বলে, "তিনি যা চান বান্দা তো তাই করছে।" এভাবে আমরা কত বিদ্রোহীর সাক্ষাত পাই যে, তাদেরকে বুঝালে, উপদেশ দিলে বলে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তো আমাদের হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারতেন। প্রাচীনকালের মুশরিকদের অমার্জনীয় কথার সাথে এদের কথার মিল রয়েছে। এরাও নিজেদের ভ্রান্তির দিকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের দিয়ে এটা করাতেন না। কুরআন এ ধরনের উদ্ভট বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছে ঃ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۔

এই মুশরিকরা (তোমার কথার জবাবে) অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমরাও শিরক করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও করত না এবং কোন জিনিসকে হারাম করেও নিতাম না। এ ধরনের কথা বলেই এদের পূর্বের লোকেরাও সত্যকে মিথ্যা মনে করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। এদের বল, তোমাদের কাছে কোন প্রকৃত জ্ঞান আছে কি, যা আমাদের সামনে

তোমরা পেশ করতে পার ? তোমরা তো শুধু ধারণা-অনুমানের ওপর (নির্ভর করে) চলছ এবং শুধু ভিত্তিহীন ধারণা রচনা করেই যাচ্ছ।

—সূরা আনআম : ১৪৮

আবার দেখ, কুরআন মজীদ এই কূটতর্কের ভিত্তিমূলকে কিভাবে উড়িয়ে দিয়েছে। সে এদিকে মোটেই মনোযোগ দেয়নি। যেন তারা এটাকে এক ধরনের স্বীকৃতি বলে ধরে না নিতে পারে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْئٍ نَحْنُ وَلاَ اٰبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْئٍ، كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُوْلِ الاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ ۔

এই মুশরিকরা বলে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমরা এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা তিনি ছাড়া আর কোন কিছুর ইবাদত করতাম না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোন জিনিস হারাম গণ্য করতাম না। তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এ ধরনের বাহানাই তৈরি করেছিল। তাহলে পরিষ্কার বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া ছাড়াও কি এই রসূলদের আরো কোন দায়িত্ব আছে ? —সূরা নাহল : ৩৫

আল্লাহ্‌র কাছে এবং মানুষের কাছে এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের ফলাফল কি হতে পারে ? এই বক্তব্য বিরুদ্ধবাদীদের কূটতর্কের শিকড় কেটে দেয়।

رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۔

এই রসূলগণই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, যেন তাদের পাঠাবার পর লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

—সূরা নিসা : ১৬৫

ঘুমে অচেতন এসব লোকের এখনো হুশ হওয়া উচিত। আপনভোলা এই প্রাচ্যবাসীদের সতর্ক হওয়া উচিত যারা নিজেদের দার্শনিক কর্মের অহমিকায়

আত্মহারা হয়ে আছে। যে লোকদের আল্লাহ্ তাআলা শক্তি, ক্ষমতা ও প্রত্যয় দান করেছেন তাদেরও ভুল ভাঙ্গা উচিত। কিন্তু তাদের প্রত্যয় শীতল হয়ে গেছে এবং তাদের শক্তি অবচেতনভাবে পড়ে আছে। তারা অপমান ও পরাজয়ের ছায়ায় ঘুমিয়ে রয়েছে। অথচ উন্নত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা এই কর্মময় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সদা তৎপর রয়েছে। যেসব লোক 'তাকদীরে বিশ্বাসকে ইসলামের একটি প্রবেশদ্বার মনে করে নিয়েছে এবং এই দরজা দিয়ে ইসলামের সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করতে চায় তাদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۔

প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও অসদাচারীর জন্য ধ্বংস। —সূরা জাসিয়া ঃ ৭

তাকদীরের অজুহাত

মানুষ অপরাধ করে তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। সে কোন আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা তালাশ করে যে, সে কোন অপরাধ করেনি, অথবা যদি করে থাকে তাও খুব হালকা অপরাধ। এভাবে অপরাধের ব্যাখ্যা করে তারা বড় অপরাধের শিকার হয়ে পড়ে। যেমন সে মিথ্যা অথবা প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

কখনো মানুষকে একটি কাজ করতে বলা হয়, কিন্তু সে অলসতা ও অযোগ্যতার পরিচয় দেয়। দুর্বলতার কারণে সে এ কাজ করে না। আবার কখনো তাকে কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু সে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সেই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি একাজ কেন করলে না অথবা এ কাজে কেমন করে তুমি লিপ্ত হতে পারলে—তবে সে আসল কারণ বলবে না, সে নিজের অযোগ্যতা অথবা নিচ স্বভাবের কথা স্বীকার করবে না, বরং অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বলবে, আমি কি করতে পারি, আমি তো নিরুপায় ছিলাম, আমি নিরপরাধ।

প্রাচীনকালের মুশরিকরা যা বলত—সে ঠিক তাই বলে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন, তখন তারা ঘাড় বাঁকা করে বলত ঃ

وَقَالُوْا لَوْشَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ۔ اَمْ اٰتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ۔

এরা বলে, রহমান যদি চাইতেন (যে, আমরা এগুলোর পূজা করব না) তাহলে আমরা কখনোই এদের পূজা করতাম না। এ সম্পর্কে প্রকৃত কথা এরা আদৌ জানে না, শুধু আন্দাজ-অনুমান করে বেড়ায়। আমরা কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে ? —সূরা যুখরুফ ঃ ২০-২১

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যে শক্তি দান করেছেন, কোন জিনিস অনুধাবন করার যে যোগ্যতা তাদের দান করেছেন, তাদের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে উন্নত বা অবনত হওয়ার যে মানসিক শক্তি লুকিয়ে রেখেছেন এবং সৎপথ অথবা অসৎ পথের যেকোন একটি বেছে নেওয়ার যে স্বাধীনতা দান করেছেন—এর ওপর কোনরূপ চাপ প্রয়োগ করা হয় না, এতে কোন বাধার সৃষ্টি করাও হয় না। মানুষ যদি এসব ব্যাপারে অনবহিত থাকে এবং বুঝে-শুনে নিজের চোখ বন্ধ করে রাখে তাহলে তার দায়িত্বের এতটুকুও পার্থক্য হবে না। সে প্রতারণা অথবা একগুঁয়েমীর যতই আশ্রয় নিক না কেন।

একবার এমন একদল লোকের সাথে বসার আমার সুযোগ হয়েছিল যারা নিজেদের দায়দায়িত্বের সব বোঝা তাকদীরের ওপর চাপাতে চায়। আমি মনোযোগ সহকারে তাদের যুক্তি প্রমাণ শুনলাম। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে তারা যেসব জিনিসের আশ্রয় নেয় তা সবই আমার সামনে ফুটে উঠে। আমি অনুভব করলাম, তারা কুরআন ও হাদীসকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। এজন্যই তারা এই অপরিপক্ক ধারণার শিকার হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। অথচ যেসব লোকের জীবন জিহাদ ও ইবাদতের মধ্য দিয়েই কেটেছে তাদের জন্যও রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুহূর্তকাল তাকদীরের নামে বসে বসে আরাম করা পছন্দ করেননি। আমাদের মত অযোগ্য ও ত্রুটিপূর্ণ আমলের অধিকারী লোকদের অবস্থা তাহলে কি হতে পারে !

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তাদের কাছে আসছেন। ঘরে তিনি এবং ফাতিমা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা রাতে উঠে কি নামায পড় না ? আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাদের প্রাণগুলো

তো আল্লাহর হাতে থাকে। তিনি যখন চান আমাদের জাগিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখনই ফিরে চললেন। কথাটা তাঁর খুবই অপছন্দ হল এবং তিনি এর কোন প্রতিউত্তর করলেন না। অতঃপর আমি দেখলাম তিনি উরুর উপর হাতের আঘাত করছেন আর বলছেন :

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْئٍ جَدَلاً .

"মানুষ বড়ই ঝগড়াটে।" —সূরা কাহ্ফ : ৫৪

হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখ দিয়ে একথা বের হওয়ার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফিরে চললেন। তিনি আশ্চর্য হলেন, এরূপ কথা কি করে বলা গেল। অন্য কেউ এরূপ কথা বলতে পারে, কিন্তু আলী (রাঃ)-এর মুখে তা কেমন করে আসতে পারল ? তিনি যে পর্যায়ের মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর পক্ষে এরূপ কথাতো শোভা পায় না। আসলে জিহাদ এবং কঠোর শ্রমের পর মানুষ যখন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে বিছানায় যায় তখন অলক্ষ্যে এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে।

কতিপয় লোক তাকদীরকে অজুহাত বানানোর জন্য হযরত মূসা ও আদম আলায়হিমাস সালামের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কের আশ্রয় নিয়ে থাকে। আলোচনাটি নিম্নরূপ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا اَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ . فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ اَنْتَ يَا مُوْسٰى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلاَمِهٖ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرٰةَ بِيَدِهٖ اَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى .

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : আদম (আঃ) বিতর্কে মূসা (আঃ)-এর ওপর বিজয়ী হলেন। মূসা (আঃ) বললেন, হে আদম ! আপনি আমাদের পিতা, আপনিই

জান্নাত থেকে আমাদের বহিষ্কার করে নিয়ে এসেছেন। আদম (আঃ) তাঁকে বললেন, হে মূসা ! আল্লাহ্ তোমার সাথে কথা বলে তোমাকে বিরল সম্মান দান করেছেন। নিজের হাতে লিখে তোমাকে তাওরাত কিতাব দান করেছেন। তুমি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে অভিযুক্ত করছ যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে তিনি আমার তাকদীরে লিখে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম মূসার ওপর বিজয়ী হলেন। —মুসলিম

তাকদীরকে অজুহাত হিসেবে পেশকারী লোকেরা যে ধরনের চিন্তা করে এ হাদীস তাদের জন্য কোন সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে না। কেননা এ হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আঃ) গোটা মানব জাতির বোঝা হযরত আদম (আঃ)-এর ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলেন। আদম (আঃ) নিষিদ্ধ গাছে হাত দিয়েছেন—এটাকেই তিনি মানব জাতির দুর্ভাগ্যের কারণ সাব্যস্ত করেন। আদম (আঃ) নিজের নির্দোষিতার পক্ষে যে কথা বলেছিলেন—সঠিক কথাই বলেছিলেন। মানব জাতির অস্তিত্ব তাঁর অপরাধের ফল নয়—এতে কোন সন্দেহ নেই। এই অপরাধের সাথে মানব বংশের ধারাবাহিকতার কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের দাবি কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি সমর্থন করতে পারে না।

যদি তাই হত তাহলে এ অপরাধের কি অন্যরূপ শাস্তি হতে পারত না ? শুধু এতটুকুই কি যথেষ্ট ছিল না যে, তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হত অথবা বেহেশত থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হত অথবা অন্য কোন দুশ্চিন্তায় নিক্ষেপ করা যেত ? এই অপরাধের কারণেই সুখ-দুঃখ ও বিপদ-মুসিবতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে—এ কথার সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। আদম (আঃ)-এর পক্ষেও এরূপ ধারণা করা সম্ভব ছিল না। অতএব এজন্য তিরস্কার করা যেতে পারে না। মূসা আলায়হিস সালামকেও শেষ পর্যন্ত একথা স্বীকার করতে হয়।

এই বিরাট পৃথিবী, দেশ-মহাদেশ, বিস্তৃত জনবসতি, তাদের কর্মমুখর জীবনযাত্রা— এ সবই কি আদম আলায়হিস সালামের অপরাধের ফল ? তা কি করে হতে পারে ? ইসলাম কখনো একথা বলে না এবং বুদ্ধিবিবেকও তা সমর্থন করে না। অতএব এ ব্যাপারে মূসা (আঃ) যখন ভুল বুঝলেন, আদম (আঃ)

তাকে সতর্ক করে দিলেন যে, এটা তো আল্লাহ্‌র লিখন ছিল। সুতরাং মানব জাতির যাবতীয় অপরাধ আদম (আঃ)-এর ঘাড়ে চাপানো যেতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে আদম (আঃ)-এর অপরাধ এবং তার জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে—হাদীসে এর পক্ষে কোন সমর্থন বর্তমান নেই। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুনান গ্রন্থসমূহের অপর বর্ণনায় আছে ঃ

قَالَ مُوْسٰى يَارَبِّ اَرِنَا اٰدَمَ الَّذِىْ اَخْرَجَنَا وَنَفْسَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ ۔ فَاَرَاهُ اللّٰهُ اَبَاهُ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۔ فَقَالَ اَنْتَ اَبُوْنَا اٰدَمُ ؟ قَالَ نَعَمْ ۔ فَقَالَ اَنْتَ الَّذِىْ نَفَخَ اللّٰهُ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَعَلَّمَكَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا وَاَمَرَ الْمَلَائِكَةَ اَنْ يَّسْجُدُوْا لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ۔ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ اَنْ تُخْرِجَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ اٰدَمُ فَمَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ اَنَا مُوْسٰى ۔ قَالَ اَنْتَ الَّذِىْ اصْطَفَاكَ رَبُّكَ بِرِسَالَتِهٖ وَاَنْتَ نَبِىُّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الَّذِىْ كَلَّمَكَ اللّٰهُ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهٗ رَسُوْلاً مِّنْ خَلْقِهٖ ؟ قَالَ نَعَمْ ۔ قَالَ فَمَا وَجَدْتَ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ ؟ قَالَ بَلٰى ۔ قَالَ اَفَتَلُوْمُنِىْ فِىْ شَيْئٍ سَبَقَ فِيْهِ مِنَ اللّٰهِ الْقَضَاءُ قَبْلِىْ ؟ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى ۔

মূসা (আঃ) বললেন, হে প্রভু! আমাকে একটু আদমকে দেখান যিনি নিজেকে এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর আদি পিতা আদমকে দেখালেন। মূসা (আঃ) বললেন, আপনি কি আমাদের

পিতা আদম ? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আপনি কি সেই ব্যক্তি যাঁর মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা নিজের রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন, সমস্ত কিছুর নাম শিখিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন আপনাকে সিজদা করার জন্য ? তিনি বললেন, হাঁ। মূসা (আঃ) বললেন, তাহলে কোন্ জিনিস আপনাকে বাধ্য করল আপনার নিজেকে এবং আমাদেরকে বেহেশত থেকে বের করে আনতে ? আদম (আঃ) বললেন, তুমি কে ? তিনি বললেন, আমি মূসা। তিনি বললেন, তুমি কি সেই ব্যক্তি যাকে তোমার প্রভু তাঁর রিসালাতের জন্য বাছাই করেছেন, তুমি কি বনী ইসরাঈলদের নবী, আল্লাহ্ যার সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি কথা বলেছেন এবং এজন্য তোমার ও তাঁর মাঝে কাউকে মাধ্যম বানান নি ? তিনি বললেন, হাঁ আমি সেই ব্যক্তি। আদম (আঃ) বললেন, তোমার কি একথা স্মরণ নেই যে, এটা আমার জন্মের পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন ? মূসা (আঃ) বললেন, হাঁ। আদম (আঃ) বললেন, তাহলে তুমি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে দোষারোপ করলে যা আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্মের পূর্বেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

আদম মূসার ওপর বিজয়ী বলেন, আদম মূসার ওপর বিজয়ী হলেন, আদম মূসার ওপর বিজয়ী হলেন।

আদম (আঃ) ভাল করেই জানতেন যে, তিনি নিষিদ্ধ গাছের কাছে গিয়ে বড়ই ভুল করেছেন। তিনি সরল মনেই তা স্বীকার করেছেন। অতএব তিনি এই অপরাধের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে মাফ করে দিলেন। এখন কথা হচ্ছে গোটা মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশার জন্য কি তাঁকে দায়ী করা চলে ? আদম (আঃ) এই দায়িত্ব স্বীকার করলেন না এবং এ ব্যাপারে তিনি সত্যপন্থীই ছিলেন। তিনি এটাকে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদীরের ফল বলে সাব্যস্ত করেছেন। মূসা (আঃ)-ও এই বক্তব্যের সমর্থক হয়ে যান। বাস্তব অবস্থা সামনে এসে গেলে তিনিও সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে যান। এখন আমরা যদি আদমের ভুলকে বাহানা বানিয়ে নিজেদের অপরাধ ধামাচাপা দিতে চাই, তাহলে আমরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হব।

জবরিয়া মতবাদে বিশ্বাসীরা এই জগতের যে নকশা অংকন করে—যদি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তাহলে গোটা বিশ্বকে একটি অন্ধকার নগরী এবং একটি বিধ্বস্ত রাজ্য বলতে হয়। অনন্তর তাদের মতে যেহেতু গোটা মানব

জাতি স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব বঞ্চিত— অতএব সে যা কিছু করে তা করতে বাধ্য। এজন্য পাপ-পুণ্য সবই তাদের দৃষ্টিতে সমান।

এই বাতিল মতবাদের অনুসারী একদল সূফীও দেখতে পাওয়া যায়। তারা এই পর্যন্ত বলে ফেলেছে যে, আদম ও শয়তান এবং মূসা ও ফিরাউনের মধ্যে মূলত কোন তফাত নেই। কারণ তাদের মতে, এদের প্রত্যেকেই তাই করেছে যা অনাদি কাল থেকে এদের নসিবে লিখে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে পলায়ন করা তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এই জীবন হচ্ছে একটি নাটক। প্রতিটি মানুষ তাই করে যা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যে কথা তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে তাই তারা বলে। কবি বলেন ঃ

এ জীবন তো অভিনয়
একজন অভিনেতার
দিবস রঙ্গমঞ্চ এখানে
আর রাত্রি তার পরদা।

যদি তুমি অনুসন্ধান চালাও, তাহলে অনেকের মন-মগজেই জীবনের এই নকশাই অঙ্কিত পাবে। কতেকে তো প্রকাশ্যে এরূপ বলে বেড়ায় এবং কতেকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই চিন্তা-ভাবনা করে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে লজ্জা পায়। মুসলিম রাজ্যের পতন অনেকাংশে এই বাতিল মতবাদেরই ফল। জনগণের মাঝে এই মতবাদ এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে, খারাপ কাজের জন্য ধরপাকড় করার আর কেউ থাকল না। ফরয ও ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়) দায়িত্ব পালনে শিথিলতা দেখা দিল, কিন্তু সর্তক করার কেউ থাকল না।

এখন সংশোধনের প্রথম পদক্ষেপ এই যে, তাকদীর সম্পর্কিত আকীদার ক্ষেত্রে মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারার সংশোধন করতে হবে। আগেকার দিনে তাকদীরে বিশ্বাস যেভাবে ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধকারী হাতিয়ার ছিল, যেভাবে তা নেক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং বদ কাজ থেকে দূরে থাকার জযবা সৃষ্টি করত—পুনরায় এর মধ্যে সেই প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে। এভাবেই মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করা যেতে পারে এবং এভাবেই আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর হতে পারে।

এখন থাকল কুরআনের সেই সব আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাদীস—যার প্রকাশ্য অর্থ থেকে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে যে, মানুষ তার ইচ্ছা ও কাজের ক্ষেত্রে তাকদীরের হাতে বন্দী। এটা মূলত মানুষের উপলব্ধির ত্রুটি।

অন্যথায় বাস্তবতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী মূলত অপরিপক্ক ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানেরই ফল। অন্যথায় কুরআন-হাদীসে এ ধরনের কোন কথা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি বলা হয় আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

যেসব লোক কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তুমি তাদের সর্তক কর আর নাই কর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তারা কখনও ঈমান আনবে না।

—সূরা বাকারা ঃ ৬

এ কথার অর্থ এই নয় যে, তাদের অন্তরগুলোকে এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, তারা সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতাই রাখে না, তারা ইচ্ছা করলেও কুফরী থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এজন্য তাদের সতর্ক করা হোক বা না হোক— তাদের জন্যই উভয়ই সমান। আয়াতের অর্থ মোটেই তা নয়। এখানে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কেবল এতটুকু কথা বলা হয়েছে যে, তুমি এই লোকদের মাঝে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছ, তাদের হিদায়াতের জন্য মন-মগজের শক্তি ব্যয় করছ, তাদেরকে গোমরাহী থেকে বের করে আনার জন্য তুমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছ এবং রাতদিন এই চিন্তায় নিজের জীবনটাকে তিলে তিলে ক্ষয় করে দিচ্ছ— কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় সত্যপথ থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছে। অতএব তাদের পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করার কোন প্রয়োজন নেই।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা যে বলেছেন ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ .

তুমি যাকে চাও হিদায়াত করতে পার না, বরং আল্লাহ্ যাকে চান হিদায়ত দান করেন। —সূরা কাসাস ঃ ৫৬

এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করুক। তিনি কাতর কণ্ঠে আরাধনা করছিলেন, মৃত্যুর সময় তাঁর চাচা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনুক এবং পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আবূ তালিব তাতে সম্মত হয়নি এবং তৌহীদের বাণী গ্রহণ করেনি। এ অবস্থায় তার জীবন প্রদীপ নিভে গেল। এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) খুবই মর্মাহত হলেন।

এই সময় আল্লাহ্ তাআলা উল্লিখিত আয়াত নাযিল করে তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দেন।

এভাবে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ‎.

আমি দোযখে নিক্ষেপ করার জন্য অসংখ্য জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি। এদের অন্তর আছে কিন্তু এরা বুঝতে চেষ্টা করে না।

—সূরা আরাফ ঃ ১৭৯

অর্থাৎ এই ধনিক শ্রেণী ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে নিজেরাই নিজেদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে। এখানে একথাই বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটা এমন ভঙ্গীতে বলা হয়েছে যে, মনে হয় তাদেরকে জাহান্নামের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন অন্যমনস্ক বা অলস ছাত্রকে তার শিক্ষক সতর্ক করে বলে থাকে, যে নির্বোধ লেখাপড়াকে একটা খেলো বিষয় বানিয়ে নিয়েছে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি থেকে দূরে রয়েছে তার ভাগ্যেই অকৃতকার্যতা রয়েছে। এখানে বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য হয় না।

যখন কোন কাজকে বান্দার সাথে অথবা শুধু আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তখন সেখানে এ কথা মনে রাখা উচিত যে, কোন এক পক্ষের উল্লেখ অপর পক্ষের নেতিবাচক হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। যদি এই নীতি সামনে রাখা হয় তাহলে কুরআনের বহু আয়াতের অর্থ বোঝা সহজ হয়ে যাবে এবং কোনরূপ জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে না। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, অনেক কাজের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে কিন্তু সৌজন্যের দাবি অনুযায়ী তা আল্লাহ্র সাথে সংযুক্ত করা উচিত নয়। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে নিকৃষ্টতার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু এর কর্তার উল্লেখ নেই ঃ

وَاَنَّا لَا نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ‎.

আরও এই যে, আমরা বুঝতে পারতাম না, পৃথিবীবাসীর প্রতি কোন খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে কিংবা তাদের রব তাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করতে চান ? —সূরা জিন ঃ ১০

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে দেখুন, ইবরাহীম (আঃ) অসুস্থতাকে তো নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, কিন্তু আরোগ্য দানকে নিজের রবের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন ঃ

وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ۔ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ ۔

যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান, আর যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন। —সূরা শুআরা ঃ ৭৯-৮০

অনুরূপভাবে হযরত খিদর (আঃ) নৌকা ছিদ্র করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ

فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا ۔

আমি একে দোষযুক্ত করে দিতে চাইলাম। —সূরা কাহ্ফ ঃ ৭৯

গুপ্ত সম্পদের নিরাপত্তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۔

অতএব তোমার রব চাইলেন যে, এই বালক দু'টি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তাদের জন্য গচ্ছিত এই সম্পদ তারা বের করে নেবে। —সূরা কাহ্ফ ঃ ৮২

অনুরূপভাবে আখিরাতে ঈমানদার সম্প্রদায় বিনয় প্রকাশার্থে নিজেদেরকে কোন ধরনের সম্মান ও মর্যাদার অযোগ্য সাব্যস্ত করবে। তারা স্বীকার করবে, তারা যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে তা একান্তভাবেই আল্লাহ্ তাআলার দান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۔

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের হিদায়াত দান করেছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথ পেতে পারতাম না—যদি আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখাতেন। আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন। —সূরা আরাফ ঃ ৪৩

একইভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাদের চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ·

তখন আওয়াজ আসবে, তোমরা যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে তা তোমরা নিজেদের কাজের প্রতিদান হিসেবেই পেয়েছে, যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করেছিলে। —সূরা আরাফ ঃ ৪৩

তাকদীর সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রচুর সংখ্যক হাদীসও রয়েছে। তা পাঠ করে পাঠকদের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে আমরা তা দূর করে দিতে চাচ্ছি। তাহলে এটাকে আর বাহানা বানানোর সুযোগ থাকবে না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন ঃ

كُنَّا فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ · فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ· اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَصِيْرُ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيَصِيْرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى · وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ·

আমরা একটি লাশের সাথে বকী আল-গারকাদে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বসে পড়লেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ছড়ি দিয়ে মাটি খুড়তে লাগলেন, অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের

প্রত্যেক ব্যক্তির ঠিকানা বেহেশত অথবা দোযখ নির্ধারিত হয়ে আছে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! তাহলে আমরা কেন সেই লেখার ভরসা করব না এবং কাজকর্ম ছেড়ে দেব না ? তিনি বললেনঃ তোমরা কাজ করতে থাক। যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে সৌভাগ্যবানদের কাজই করে। আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য সে হতভাগ্যদের কাজই করে থাকে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

"পরন্তু যে লোক (আল্লাহ্‌র পথে) ধনমাল ব্যয় করল, (তাঁর নাফরমানী থেকে) আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য বলে মেনে নিল—তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজতা দেব। আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল, (আল্লাহ্‌র প্রতি) বিমুখ হল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করল, তার জন্য আমি দুষ্কর পথের সহজতা দান করব।

—সূরা লাইল ঃ ৫-১০

একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য এ হাদীসের মধ্যে কোন সংশয় থাকতে পারে না। একথা সত্য যে, কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে কি করবে এবং আখিরাতে তার পরিণতি কি হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ অবহিত। এটা একটা বাস্তব সত্য যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তবে একথা সত্য নয় যে, অনাদি কাল থেকে আল্লাহ্ তাআলার জানা থাকার কারণে মানুষ সংশ্লিষ্ট কাজ করতে বাধ্য হয়ে গেছে। কেননা জ্ঞান হচ্ছে একটি আলো যা বিভিন্ন জিনিসকে সমুজ্জ্বল করে তোলে। তা কোন শক্তি নয় যে, কাউকে কোন কাজ করতে বাধ্য করবে।

মানুষ নিজেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কাজ করে, চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাআলা কেবল তার উদ্দেশ্যের পথকে সমতল করে দেন এবং তার উদ্দেশ্যকে পূর্ণতায় পৌছে দেন। যে ব্যক্তি আপেলের চাষাবাদ করে আল্লাহ্ তাকে আপেল খেতে দেন। আর যে ব্যক্তি কাঁটা বপন করে আল্লাহ্ তাকে কাঁটা খেতে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আয়াত কটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন—সেগুলো পরিষ্কারভাবে এই সত্যেরই ঘোষণা দেয়।

এই আয়াতগুলো বলছে, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ অবলম্বন করে এবং তাকওয়া, অর্থব্যয় ও সত্যকে আদর্শ হিসবে গ্রহণ করে—আল্লাহ্ তাআলা তার

জন্য শুভ পরিণামের ব্যবস্থা করেন এবং জান্নাতের পথ তার জন্য সহজ করে দেন। আর যে ব্যক্তি পাপের পথ অবলম্বন করে এবং কৃপণতা, নির্লজ্জতা এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়—আল্লাহ্ তাআলা তাকে এগুলোর চর্চা করার সুযোগ দেন। তিনি তার রশি ঢিলা করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে পৌছিয়ে দেন।

আরো একটি হাদীস দেখুন, যাকে কেন্দ্রস্থল জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা দীর্ঘকাল ধরে হৈ চৈ করে আসছে। তারা মনে করেছে যে, এই হাদীসের মাধ্যমে তারা দীনের ভিত্তিমূল নড়বড়ে করে দিতে পারবে। অথচ আল্লাহ্‌র দীনকে তারা যতটা দুর্বল মনে করে নিয়েছে, তা এর চেয়ে অনেক শক্তিশালী। আল্লাহ্‌র দীনকে তারা যতটা নিঃসঙ্গ দেখতে পাচ্ছে—বাস্তব অবস্থা মোটেই তদ্রূপ নয়। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

وَالَّذِىْ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ هُـوَ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْـلِ الْجَنَّـةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الـنَّارِ فَيَدْخُلُهَا ٠ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الـنَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ٠

সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই! তোমাদের কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক বাহু পরিমাণ দূরত্বের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার সামনে তার তাকদীরের লিখন এসে উপস্থিত হয় এবং সে দোযখবাসীদের কাজ করে বসে। ফলে সে দোযখে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কোন ব্যক্তি দোযখবাসীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং দোযখের মাঝে এক বাহু পরিমাণ দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার সামনে তার তাকদীরের লিখন উপস্থিত হয় এবং সে জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

এই হাদীসে দুই ধরনের লোকের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একদল লোকের পরবর্তী জীবন পূর্ববর্তী জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়। তাদের প্রথম জীবন এক ধরনের হয়ে থাকে এবং পরবর্তী জীবন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমরা স্বচক্ষে জীবনের যে উত্থান-পতন দেখতে পাই তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়।

এমন কত লোক রয়েছে যাদের জীবনটা দুষ্কর্মের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, এক সময় তারা চিন্তার বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল ; হঠাৎ তাদের মনে গোমরাহীর অনুভূতি জাগ্রত হল এবং দ্রুত হিদায়াতের পথে চলে আসল। অনুরূপভাবে কোন কোন লোককে দেখা যায় তার জীবনে বিরাট একটা অংশ সৎপথে কেটেছে। হঠাৎ করে একদিন সে গোমরাহীর শিকার হয়ে জীবনের নিচ স্তরে নেমে যায়।

হাদীসে তাকদীরের লিখন সামনে এসে যাওয়ার যে কথা এসেছে তা ব্যাখ্যার একটি ধরন মাত্র। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সঠিক এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য। এটা অতিশয়োক্তির একটা রীতি যা আরবী ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি অনুমান করলে যে, তার পরিণতি এই হবে। সে যখন এই পরিণতির কাছে পৌছে যায়, তখন তুমি তা দুইভাবে উল্লেখ করতে পার এবং এই দুই পন্থাই সঠিক। তুমি বলতে পার, তার সম্পর্কে তোমার যে ধারণা ছিল তা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অথবা তুমি এও বলতে পার যে, তার সম্পর্কে তোমার যে সিদ্ধান্ত ছিল তা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতাকে আরও প্রতীয়মান করার জন্য এও বলতে পার যে, সে আমার অনুমানের বাইরে কি করে যেতে পারে, অথবা আমার সিদ্ধান্ত কি করে ভুল হতে পারে! আরবী ভাষায় এ ধরনের বাকরীতির বহুল প্রচলন আছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَابَنِىٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ .

হে আদম সন্তান ! শয়তান যেন তোমাদের বিপথগামী করতে না পারে। —সূরা আরাফ ঃ ২৭

অর্থাৎ শয়তানের কারণে তোমরা বিপথগামী হয়ে পড় না। বাক্যবিন্যাস এবং বাকরীতি যতই বিভিন্ন হোক না কেন, একজন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে তা অনুধাবন করা মোটেই কষ্টকর নয়। অতএব আমাদের যে কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ না করে আমরা যদি সমস্ত বোঝা তাকদীরের উপর চাপাতে চাই তাহলে এটা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

একটি রসাত্মক জবাব

এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করল, মানুষ কি স্বাধীন না নিয়ন্ত্রিত ? আমি তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তাকে বাঁকাভাবে জবাব দেব— যেভাবে সে তার স্বভাবের সাথে বক্রতা মিশিয়ে রেখেছে। আমি বললাম, মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত ; যেমন— (১) একদল প্রাচ্যে বসবাস করে এবং (২) অপর দল পাশ্চাত্যে বসবাস করে।

প্রথমোক্ত দল পরাধীন এবং শেষোক্ত দল স্বাধীন। এই জবাব শুনে সে বিস্ময়ের হাসি হাসল। তাতে তার বন্যভাব প্রকাশ পেল।

সে বলল, এ কেমন কথা ? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, মানুষ কি স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন কর্মের অধিকারী ? সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে কি? অথবা সে কোন অদৃশ্য শক্তির হাতে বন্দী ? আমি বললাম, আমি তো আপনাকে জবাব দিয়ে দিয়েছি। পাশ্চাত্যের লোকেরা স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রাচ্যের মানুষ পরাধীন ও নিয়ন্ত্রিত। ওখানকার মানুষেরা স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতার মালিক, আর এখানকার মানুষের তা নেই।

এক ব্যক্তি হেসে বলল, এটা তো কূটনৈতিক জবাব হল। আমি বললাম, কেবল রাজনৈতিকই নয়, বরং ধর্মীয় জবাবও এই। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, পাশ্চাত্যের লোকদের জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং তারা তা কাজে লাগিয়েছে। তারা বিশ্বের অনেক রহস্য আবিষ্কার করছে এবং প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত বিস্ময়কর শক্তির সন্ধান লাভ করেছে। তারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যকে অনুভব করেছে, পাশ্চাত্য-প্রাচ্যকে তন্ন তন্ন করে দেখেছে এবং বিস্ময়কর আবিষ্কার পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছে।

পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এই যে, আমাদের লোকেরা এখনো জানে না তারা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী কি না ? তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার রাখে কি না ? তারা কি স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ? তারা কি স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ? তারা স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার অধিকার রাখে কি না ? এখন সর্বপ্রথম এগুলো প্রমাণ করতে হবে। অতঃপর তারা কাজ শুরু করবে। কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে, অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত নেবে, অতঃপর কোন পদক্ষেপ নেবে।

এ সময় অবশ্যই সে পরাধীন, হুকুমের দাস। পাশ্চাত্যের স্বাধীন ব্যক্তি তাকে যেভাবে নাচাতে চায় সেভাবেই নাচায় এবং যেভাবে চায় ঘুরপাক খাওয়ায়। কি বিরাট ব্যবধান এই দুই দলের মাঝে। পাশ্চাত্যের লোকের অবস্থা এই যে, তাকে যখন জীবন নদীর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় তখন সে চিন্তা করে, আমার যখন হাত-পা রয়েছে আমি কেন সাঁতার কাটব না ? অতএব সে সাঁতার কাটতে থাকে। কখনো সে তুফানের অনুকূলে সাঁতার কাটে, আবার কখনো তুফানের প্রতিকূলে অগ্রসর হয়। এভাবে সে তীরভাগে পৌছে যায়।

আমাদের প্রাচ্যের অবস্থা এর থেকে ভিন্নতর। এখানে কোন ব্যক্তিকে উত্তাল তরঙ্গের মাঝে নিক্ষেপ করা হলে সে চিন্তা করে— আমি কি সত্যিই জীবিত আছি, না মরে গেছি ? আমি কি স্বাধীন না আমার পায়ে জিঞ্জির পরানো আছে ? কিন্তু তুফান তো আর নিষ্ফল চিন্তায় নিমজ্জিত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করে না। তুফানের পর তুফান এসে তাকে খড়কুটার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌছে দেয়। তখন আমাদের নির্বোধ কবির স্মরণ তার কোন উপকারে আসে না ঃ

সাগর বুকে নিক্ষেপ করলো
হাত-পা বেঁধে

আর বললে ঃ

খবরদার! বস্ত্র সিক্ত করো না।

হে মানুষ! আল্লাহ তোমাকে যে শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতা দান করেছেন তা নিয়ে কঠোর শ্রমে নিয়োজিত হও। এ কথা জিজ্ঞেস কর না যে, তুমি কি স্বাধীন না পরাধীন ? আল্লাহ তোমাকে যে যোগ্যতা দান করেছেন তা কাজে লাগাও। এ কথা স্মরণে রেখ— জীবনে যেখানে তোমার কিছু অধিকার রয়েছে সেখানে তোমার কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্যও রয়েছে।

তাকদীর সম্পর্কে আরো কিছু কথা

যে প্রাকৃতিক বিধানের উপর জীবন ও জীবন্ত সত্তাগুলো নির্ভরশীল এবং আসমান ও যমীনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা যে বিধানের উপর ভিত্তি করে অটল রয়েছে তাও তাকদীরের আওতাভুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা সব জিনিস অণু এবং শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করেছেন যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের দিক থেকে কতগুলো স্থায়ী বিধানের অধীন ও অনুগত। এগুলো একটি সুনিশ্চিত ব্যবস্থাপনার অধীনে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পাদন করে যাচ্ছে। এরা কখনো ভুল করে না, কখনো সীমা লংঘন করে না। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ٠

আমাদের রব প্রতিটি জিনিসের মূল সৃষ্টি-কাঠামো দান করেছেন, অতঃপর একে পথ দেখিয়েছেন— —সূরা ত্বাহা ঃ ৫০

যেসব উপাদানে পানি সৃষ্টি হয়, এই উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করার বিধান অথবা যে বিধানের মাধ্যমে পানির ঘনত্ব নিরূপণ করা যায়, অনুরূপভাবে পানি কখনো বাষ্পের আকার ধারণ করে, কখনো জমাট আকার ধারণ করে, আবার কখনো বন্যার আকার ধারণ করে, কখনো স্থির অবস্থায় থাকে, কখনো স্রোতের আকারে প্রবাহিত হয়— এই সব অবস্থায় পানির মধ্যে কতটা ওজন, কতটা চাপ এবং কি পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি হয় তা পরিমাপ করার জন্য যে বিধান রয়েছে তা সবই আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। স্রষ্টার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে।

اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ٠

আমরা প্রতিটি জিনিস একটি পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করেছি।

— সূরা কামার ঃ ৪৯

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى٠ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى٠ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ٠

তোমার মহান প্রভুর নামে তসবীহ কর— যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন ; যিনি তাকদীর নির্দিষ্ট করেছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। — সূরা আলা ঃ ১-৩

বিভিন্ন রকমের ফল উৎপন্ন হওয়া এবং তা পরিপক্ক হওয়া, মাতৃগর্ভে সন্তান পয়দা হওয়া এবং এই বস্তুজগতে তার আগমন, রাত-দিনের আবর্তন— এসবই স্রষ্টার নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা এবং তাঁর হিকমতপূর্ণ পরিচালনার অধীন।

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۞

দানা ও বীজ দীর্ণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে বের করেন জীবিত থেকে। এসব কাজের আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্। তাহলে তোমরা ভ্রান্ত পথে কোথায় যাচ্ছ? তিনিই রঙ্গীন প্রভাতের উন্মেষ করেন। তিনিই রাতকে শান্তির বাহন বানিয়েছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের হিসাব নির্দিষ্ট করেছেন। বস্তুত এ সবই সেই মহা পরাক্রমশালী ও মহা জ্ঞানীর নির্ধারিত পরিমাণ। —সূরা আনআম ঃ ৯৫-৯৬

দুই. আদালত বা ন্যায়নিষ্ঠার ওপর তাকদীরের ভিত্তি হওয়াতে তা মর্যাদার মধ্যে ব্যবধান হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যেমন— কখনো দুই ব্যক্তি একই কাজ করে সমান পরিমাণ প্রতিদান পাওয়ার অধিকারী হয়। কিন্তু এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা কেবল তার প্রাপ্য মজুরীই দেন এবং অপর ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মজুরী ছাড়াও বিশেষ পুরস্কার দান করতে পারেন। এরূপভাবে দুই ব্যক্তি একই রূপ খারাপ কাজ করে বসে এবং সমান পরিমাণ শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। অতঃপর একজন হয়ত ক্ষমা পেয়ে যায় এবং অপর জনকে প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতে হয়।

আমাদের দাবি এই যে, লোকেরা ভালভাবে বুঝে নিক যে, আল্লাহ্র ওপর কারো জোর খাটে না, তাঁর ইচ্ছা কারো অধীন নয়। অতএব তাঁর বান্দাগণ আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভীতি ও প্রেম-ভালবাসায় পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে সরাসরি তাঁর দরবারে হাযির হবে। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۞

হে নবী! তাদের বলে দাও, অনুগ্রহ এবং মর্যাদা সবই আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ্ বিশাল-ব্যাপক এবং সর্বজ্ঞ। তিনি নিজের অনুগ্রহ্ দানের জন্য যাকে চান নির্দিষ্ট করে নেন। তাঁর অনুগ্রহও অনেক বেশি এবং বিরাট। — সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৩-৭৪

এ থেকেই আমরা জানতে পারি সবকিছুর উৎসকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে কেন সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং গুনাহ মাফ পাওয়ার প্রসঙ্গইবা কেন তাঁর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ . وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ .

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন এবং যাকে চাইবেন দয়া করবেন। তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তোমরা না পৃথিবীতে কাতর ও অক্ষম করে দিতে পার আর না আসমানে। আর আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষা করার মত কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী তোমাদের নেই।

—সূরা আনকাবূত ঃ ২০-২২

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ . اُوْتِىَ اَهْلُ التَّوْرٰةِ التَّوْرٰةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَعَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا . ثُمَّ اُوْتِىَ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا اِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ فَعَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا . ثُمَّ اُوْتِيْنَا الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْنَا اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ

فَأَعْطِينَا قِيرَاطِيْنِ قِيرَاطِيْنِ . فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَىْ رَبِّ أَعْطَيْتَ هٰؤُلَاءِ قِيرَاطِيْنِ قِيرَاطِيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً مِنْهُمْ ؟ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا لَا . قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ .

তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতীত হয়েছে তাদের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্বকাল আসরের নামাযের শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সমান। ইহূদীদের তাওরাত কিতাব দেয়া হল। তারা তদনুযায়ী আমল করতে থাকল। দুপুর বেলায় পৌঁছেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অতএব তাদেরকে এক এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হল। অতঃপর খৃস্টানদেরকে ইনজীল কিতাব দেওয়া হল। তারা আসরের নামায পর্যন্ত তদনুযায়ী কাজ করতে থাকল। অতঃপর তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অতএব তাদেরকেও এক কীরাত এক কীরাত সওয়াব দেওয়া হল। অতঃপর আমাদেরকে কুরআন মজীদ দেওয়া হল। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার উপর আমল করলাম। অতএব আমাদেরকে দুই কীরাত দুই কীরাত সওয়াব দান করা হল। তাওরাত এবং ইনজীল কিতাবের অধিকারীগণ বলল, হে প্রভু! তুমি এদেরকে দুই কীরাত করে সওয়াব দান করেছ আর আমাদের এক কীরাত করে সওয়াব দিলে ? অথচ আমরা তাদের তুলনায় অধিক কাজ করেছি। মহামহিম আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি কি তোমাদের মজুরী কম দিয়েছি ? তারা বলল, না। তিনি বললেন ঃ এটাই আমার অনুগ্রহ— যাকে ইচ্ছা আমি দান করি।

এই জীবনে মানুষের মধ্যে কত ব্যবধান ও পার্থক্য রয়েছে। এই ব্যবধানও তাকদীরেরই ফল। মানুষের মাঝে বিরাজমান এই পার্থক্য, সম্মান ও মর্যাদার এই ব্যবধান সভ্যতা-সংস্কৃতির স্তম্ভ এবং বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার ভিত্তি। সমস্ত মানুষের একই সমান যোগ্যতা নিয়ে পয়দা হওয়া অসম্ভব। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, পার্থিব ও পারলৌকিক ফলাফল একই রূপ হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

জীবনের এই চাকচিক্য এবং পৃথিবীর এই আনন্দ-উৎসব যেসব কাজের ওপর নির্ভরশীল তা আঞ্জাম দেওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক হাত-পা ও মাথার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের মাঝে যে যোগ্যতা লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার মধ্যে এগুলোর দিকেও পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যাতে মানব সমাজ সুচারুপে ও পূর্ণাঙ্গভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে পারে। মানুষের কার্যকলাপে তখনই দোষত্রুটি সৃষ্টি হয় যখন পায়ের স্থানে মাথা এবং মাথার স্থানে পা ব্যবহার করা হয়। যে জাতির অবস্থা এইরূপ হয় তাকে সেই আহাম্মকের সাথেই তুলনা করা যায়, যে পায়ে হ্যাট পরিধান করে এবং মাথায় জুতা বাঁধে। প্রাচ্যে এ ধরনের নির্বোধ জাতির অভাব নেই।

এখন আমরা এর অধিক বলতে চাই না যে, এ সময় আমাদের আলোচ্য বিষয় সামাজিক সংস্কার নয়। বরং এখন আমরা যে জিনিসটি হৃদয়ঙ্গম করতে চাই তা হচ্ছে— একজন অধিনায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বাহিনীকে যেভাবে সজ্জিত করে, তাকদীরও অনুরূপভাবে দাযিত্ব ও কর্তব্য বন্টন করে দিয়েছে। একদল সৈনিকের দায়িত্ব হচ্ছে, মূল বাহিনীর পশ্চাতে, ডানে, বায়ে ও সম্মুখভাগে তাদের অবস্থান নেওয়া। তাদের কেউ অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করে, কেউ রসদপত্র সরবরাহ করে, প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত জনশক্তি সরবরাহ করে এবং অপর দল অফিসের ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ রক্ষা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে এসব কাজই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এই বন্টন ব্যবস্থা ন্যায়নিষ্ঠা ও আদল-ইনসাফের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। এই পার্থক্যের অর্থ কখনো এই নয় যে, তাকদীর কারো অধিকার খর্ব করেছে, অথবা কারো প্রচেষ্টার মোটেই গুরুত্ব দেয়নি, অথবা পুরস্কার বন্টনে কোনরূপ বেইনসাফী করেছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হবে। মানুষকে যে শক্তি ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে, তার জন্য যে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাকে যে উপায়-উপকরণ দান করা হয়েছে— এসবকে সামনে রেখেই তাকে পুরস্কার অথবা শাস্তি দেওয়া হবে।

আমার মনে পড়ে, কোথাও বিমান উড্ডয়ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বৈমানিক

পুরস্কার পাবার অধিকারী হয় না, বরং রীতিমত উড়োজাহাজগুলোর উড্ডয়ন ক্ষমতার গড় নির্ণয় করা হয়। বাতাস দ্রুতগতিতে বয়েছিল না স্বাভাবিক গতিতে বয়েছিল, আকাশ পরিষ্কার ছিল না মেঘাচ্ছন্ন ছিল, ঋতু অনুকূল ছিল না প্রতিকূল ছিল— এসব বিষয় বিবেচনা করে রীতিমত হিসাব করা হয়। অতঃপর একটি উড়োজাহাজ নিজের উড্ডয়ন ক্ষমতা অনুযায়ী কত সময়ে কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে— তা এভাবে নির্ণয় করা হয়। এর অর্থ এই যে, একটি বিমান চারটি বিমানের পর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছার পরও পঞ্চম পুরস্কার পাবার পরিবর্তে প্রথম পুরস্কার পেয়ে যেতে পারে।

এটা আমাদের সামনে একটি উদাহরণ। এ থেকে অনেকটা অনুমান করা যায় যে, কিয়ামতের দিন লোকদের যাবতীয় কাজকর্ম কিভাবে ওজন করা হবে। তাদের শ্রমসাধনা ও কর্মতৎপরতা এমনভাবে পরিমাপ করা হবে যে, তাদের কারো সাথে সামান্য পরিমাণ বাড়াবাড়িও করা হবে না এবং তাদের প্রাপ্য অধিকারও খর্ব করা হবে না। বরং প্রত্যেকের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতা বিবেচনা করেই তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা করা হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ٠

কিয়ামতের দিন আমরা নির্ভুল ওজন করার দাঁড়িপাল্লা সংস্থাপন করব। তার ফলে কোন ব্যক্তির ওপর সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না। যার এক বিন্দু পরিমাণও কাজ থাকবে তাও আমরা সামনে নিয়ে আসব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট। —সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৭

মানুষকে বিজলী বাতির সাথে তুলনা করা যায়। বিজলী বাতির কোনটি ষাট ওয়াট, কোনটি একশ ওয়াট আবার কোনটি দুইশ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এখন যদি দুই ভোল্টেজ ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ব মাত্র সত্তর ভোল্টেজ আলো দান করে এবং ষাট ভোল্টেজ ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ব পঞ্চাশ ভোল্টেজ আলো দান করে তাহলে দুইশ ভোল্টেজের বাল্বটি ষাট ভোল্টেজ বাতিটির তুলনায় কম

আলো দেয়। কিন্তু প্রকাশ্যত ষাট ভোল্টেজ বাল্বটির তুলনায় দুইশ ভোল্টেজ বাল্বটি অধিক উজ্জ্বল দেখায়।

মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ। এমন অনেক লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা অসম শক্তি এবং যোগ্যতা দান করে থাকবেন, তাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা থাকবে, অনুকূল পরিবেশ দান করা হবে। কিন্তু এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল তা করতে পারবে না। তাদের কার্যক্রমের দ্বারা লোকেরা প্রভাবিত হবে, তাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা দীনের যে আলো ছড়াবে তা হয়ত অবাক দৃষ্টিতে দেখা হবে— কিন্তু আল্লাহ্র দরবারে তাদের অবস্থা ভিন্নতর হবে, তাদের চেহারায় কোন সৌন্দর্য থাকবে না।

পক্ষান্তরে এমন অনেক লোক দেখা যাবে যাদেরকে সীমাবদ্ধ যোগ্যতা দান করা হবে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ যোগ্যতার দ্বারা তারা আল্লাহ্র দীনের যে খেদমত আঞ্জাম দেবে লোকদের দৃষ্টিতে হয়ত তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না, কিন্তু আল্লাহ্র দরবারে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদার স্থান দান করা হবে। কেননা তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ যোগ্যতাকে পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ٠

হে ঈমানদার লোকেরা! পুরুষ লোকদের একদল অপর দলকে উপহাস এবং বিদ্রূপ করবে না। এমনও হতে পারে যে, বিদ্রূপকৃত দল বিদ্রূপকারী দলের তুলনায় উত্তম। অনুরূপভাবে মহিলাদের এক দলও অপর দলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না। এমনও হতে পারে যে, এদের তুলনায় তারা উত্তম। —সূরা হুজুরাত ঃ ১১

আমরা পূর্বেও বলে এসেছি, ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে তাকদীরের গভীর প্রভাব রয়েছে। মানুষ যে শক্তিমত্তার অধিকারী হয় এবং যেসব যোগ্যতা তার মধ্যে পাওয়া যায়—সবই তাকদীরের খেলা। অনুরূপভাবে তার যে কর্মক্ষেত্র এবং কর্মসীমা রয়েছে—যেখানে সে জীবনভর নিজের শক্তি ব্যয় করে, তা নির্দিষ্টকরণেও তাকদীরের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

মানুষের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে যেসব প্রকাশ্য এবং গোপন বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হয় তা নির্ধারণ করার জন্য বংশ বিজ্ঞানীগণ উদারভাবে কাজ করে থাকেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে মানুষের অধিকাংশ কার্যকলাপ এবং যাবতীয় আকর্ষণ তাদের জন্মগত ঝোঁক-প্রবণতারই ফল। এ কথা তো প্রমাণিত যে, দেহের গ্রন্থিসমূহ থেকে যে লালা নির্গত হয় তার মধ্যে এবং স্বাভাব-প্রকৃতির ভারসাম্য ও শক্তির মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জৈবিক গ্রন্থিগুলো রক্তের মধ্যে যে হরমোন সরবরাহ করে, মানুষের জৈবিক শক্তির উপর এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। মানুষ কখনো দৈহিক উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আবার কখনো পারে না ; এখানেও হরমোনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

অনুরূপভাবে মূত্রাশয়ের চারদিকে যে বৃক্কের (Adrenal gland) সমাবেশ রয়েছে, ভয় ও রাগের সময় মানুষের মনে দুর্ভাবনা ও উত্তেজনা সৃষ্টিতে এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। কেননা এই বৃক্কগুলো মানুষের রক্তে এমন লোলা সরবরাহ করে যার ফলে অন্তর ও স্নায়ুতে প্রফুল্লতা অথবা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই লোকদের ঝোঁক-প্রবণতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সময় তাঁদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে।

কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এসব জিনিস সাধারণ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অধিক শক্তিশালী নয়। মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য হচ্ছে, এই দুটি জিনিসের এতটা সংশোধন সম্ভব যে, তা শরীআতের বিধি-বিধানের অনুগত হয়ে যেতে পারে। অতএব মানুষের উত্তেজনা ও ঝোঁক-প্রবণতার গতি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। প্রথমে বাতিলের দিকে ধাবিত হলে পরে সত্যের দিকেও ফিরে আসা সম্ভব।

মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য এই যে, এমন কিছু লোকও আছে যাদের অদ্ভূত রকমের কাজকর্ম করার বদ-অভ্যাস রয়েছে। যেমন কিছু লোকের সিঁড়ির থাক গণনা করার অভ্যাস আছে, কিছু লোক দালানের তলা গণনা করতে আনন্দ পায়, আবার কিছু লোক রাস্তায় বিজলী বাতি গণনা করতে মজা পায়। ইংরেজ সাহিত্যিক জনসন সম্পর্কে জানা যায়, রাস্তায় চলার সময় যদি কোথাও তাঁর নজরে কাঠের খুঁটি পড়ে যেত তাহলে তিনি প্রতিটি খুঁটি হাতে স্পর্শ করতেন।

যদি কোন একটি বাদ পড়ে যেত তাহলে তিনি ফিরে এসে খুঁটিগুলো পুনরায় স্পর্শ করতেন।

এমন লোকও আছে যে একটি ইঁদুর দেখেও ভয় পায়। অথচ সে বীরত্ব, সাহসিকতার জন্য খ্যাতিমান। এমনও কিছু লোক আছে যাদের ছোটখাট জিনিস চুরি করার অভ্যাস রয়েছে। অথচ তারা বিরাট সম্মান ও উচ্চ পদের অধিকারী।

এসব জিনিস বলে দিচ্ছে যে, মানুষ কখনো কখনো এমন কাজ করে বসে যে সম্পর্কে তার কোন অনুভূতি থাকে না। এমন কিছু অদৃশ্য শক্তি আছে যা গোপনে তার মধ্যে কার্যকর রয়েছে এবং তাকে দিয়ে অজান্তে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। প্রাচীনপন্থী মনস্তত্ত্ববিদগণ এটাকে মানসিক অবসন্নতা অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল বলে থাকেন অথবা এটাকে পদস্খলন মনে করেন। কিন্তু বর্তমানকালের বিশেষজ্ঞগণ এটাকে সুপ্ত জ্ঞানের ফল মনে করেন। সাহসিকতার পতন ও যোগ্যতার পরাজয় সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য হচ্ছে, এই পরাজয় আমাদের উপর সাধারণভাবেই ক্রিয়াশীল হয় এবং আমাদের ইচ্ছা, সংকল্প ও অনুভূতির উপর বিজয়ী হয় ; আমাদেরকে নিজের পছন্দ-অপছন্দের অনুগত অথবা নিজের প্রবৃত্তির গোলাম বানিয়ে দেয়।

নিঃসন্দেহে এমন কিছু আভ্যন্তরীণ অবস্থা রয়েছে যা অজান্তে মানুষের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে এবং তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে দেয়। খুব সম্ভব এই ধরনের অবস্থা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর ক্রিয়াশীল হয়েছিল, যার ফলে তিনি নবীম করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পূর্বোল্লেখিত কথা বলেছিলেন।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এ কথা প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা জীবনের সাধারণ নীতিমালা বা দৈনন্দিনের রীতিনীতির ক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্বল মুহূর্তগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে না বা তা বিবেচনা করাও ঠিক নয়। তা অস্থিরতা বা আনন্দের মহূর্তই হোক না কেন।

আমল হচ্ছে ঈমানের ভিত্তি

"আমানতু বিল্লাহ— আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি" কথার অর্থ হচ্ছে, আমি উত্তমরূপে জেনে নিয়েছি এবং তার উপর আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে।

"আসলামতু লাহ্‌— আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি" কথার অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহ্‌র সামনে আমার মাথা আনত করে দিয়েছি ; আনন্দের সাথে ও আন্তরিক একাগ্রতা সহকারে তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে নতি স্বীকার করেছি।

শরীআতের দৃষ্টিতে 'ঈমান' এবং 'ইসলাম' শব্দদ্বয় সমার্থবোধক বা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত অথবা পরস্পর পরিপূরক।

ইসলামের তাৎপর্য হচ্ছে, প্রতিটি ঈপ্সিত ইবাদত আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ মনে আল্লাহকে মেনে নেওয়া এবং তাঁর নির্দেশসমূহ কার্যকর করার নাম হচ্ছে ইসলাম।

ঈমানের তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌ তাআলার সঠিক পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর যে কোন দাবি পূরণ করা।

অতএব ইসলামের মধ্যে প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অর্থও পাওয়া যায় এবং ঈমানের মধ্যে আত্মসমর্পণের অর্থও নিহিত রয়েছে। সুতরাং ইয়াকীন বা বিশ্বাসশূন্য ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয় এবং আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা-শূন্য ঈমানও গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী নিম্নরূপ ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰـكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ .

এই বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। (হে মুহাম্মদ! তাঁদের) বল, তোমরা ঈমান আননি। বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারেনি।

—সূরা হুজুরাত ঃ ১৪

এই আয়াতে যে 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা সেই 'দীনে হক' বোঝানো হয়নি যা নিম্নোক্ত আয়াতে বোঝানো হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করতে চায়, তার কাছ থেকে সেই ধর্ম মোটেই গ্রহণ করা হবে না।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮৫

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'ইসলাম' দ্বারা সেই আনুগত্যকে বোঝানো হয়েছে যা একান্ত বাধ্য হয়ে গ্রহণ করা হয়েছে অথবা যা মুনাফিকীর ফলশ্রুতি। ঈমান যতক্ষণ প্রতিটি শিরা-উপশিরায় মজবুতভাবে বসে না যায় ততক্ষণ এই ইসলামের কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। অনুরূপভাবে যে ঈমানের সাথে শ্রবণ ও আনুগত্য পাওয়া যাবে এবং যা অবাধ্যতা ও অহংকারমুক্ত হবে সেই ঈমানই নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে। কুরআনের বাণী ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ .

এরা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমরা অনুগত হয়ে গেছি। এর পরও তাদের মধ্যে একদল লোক আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এরা কখনো মুমিন নয়।

—সূরা নূর ঃ ৪৭

সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দীন নিয়ে এসেছেন, 'ইসলাম' শব্দটি তারই পরিচয় চিহ্ন। এটা এমন এক বাস্তবতা, যে সম্পর্কে দুনিয়ার সব জাতিই অবগত। যখন 'ইসলাম' শব্দের উল্লেখ করা হয়, তখন এই শিরোনাম থেকে সেই দীনেরই পরিচয় ফুটে উঠে যার স্থিতি কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। এর প্রবেশদ্বার হচ্ছে কলেমায়ে তাওহীদ। যার ইচ্ছা সে-ই এই দরজা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে তাকে ইসলাম আরোপিত যাবতীয় দায়িত্ব ও কতর্ব্য সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে হবে।

তবে 'ঈমান' শব্দটির ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাধারণ ব্যবহার এবং বিশ্বব্যাপক পরিচিতির দিক থেকে শব্দটির মধ্যে যথেষ্ট প্রশস্ততা রয়েছে। ইহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ, পৌত্তলিকতা, সমাজতন্ত্র এবং আরো যত ধর্ম ও মতবাদ রয়েছে সর্বত্রই এ শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপক পরিচিতির কারণে শব্দটির ইসলামী বৈশিষ্ট্য এবং শরীআতসম্মত অর্থের গুরুত্বের উপর কোন খারাপ প্রভাব পড়ে না। কেননা ইসলামে 'ঈমান' শব্দটির যে ব্যাপক অর্থ রয়েছে, এর সাথে যে সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে এবং এর যে দাবি রয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাছে কোন ঈমান বিশুদ্ধ হতে পারে না—যতক্ষণ তা ইসলামের সমার্থবোধক না হবে বা এর আবশ্যকীয় উপাদান না হবে।

অবশ্য এই সাধারণ পরিচিতির ফলে একটি বিষয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে আমাদের সামনে আসে। তা হচ্ছে ইসলামে এমন কোন মতবাদ বা দর্শন গ্রহণযোগ্য নয়— যা ফরয ও ওয়াজিব পর্যায়ের দায়িত্বসমূহ পালনে অমনোযোগিতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভাবধারার জন্ম দেয়। এজন্যই কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র সামনে মাথা নত না করে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে আমরা তাকে ধর্মদ্রোহী, ইসলামের শত্রু এবং ঈমান বিনষ্টকারী বলে চিহ্নিত করে থাকি। সে ঈমান মারেফাতের যত বড় দাবিদারই হোক না কেন।

ইবলীস শয়তানের কি এ ব্যাপারে কোন সংশয় ছিল যে, আল্লাহ্ এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই ? তার কি এই বিশ্বাস ছিল না যে, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হতে হবে ? কিন্তু সে যখন নাফরমানী করল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি সিজদার হুকুম হল, কিন্তু সে তা অমান্য করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলার একত্বে বিশ্বাস তার কোন কাজে এল না। কেননা আল্লাহ্র কাছে আনুগত্য ও ইবাদত-শূন্য জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সহকারে এরূপ নাফরমানী ঈমানদার ব্যক্তিকেও ঈমানের আওতা থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

হযরত আবু বক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে এই বাস্তব সত্যের অনুভূতিই জাগ্রত ছিল। তাই তিনি ধর্মত্যাগী মুরতাদ সম্প্রদায় এবং যাকাত অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেননি। অথচ তারা নিজেদের ঈমানদার বলে দাবি করত। তাদের কাছে যাকাত চাওয়া হল। কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করল এবং অস্ত্র ধারণ করল। তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু যাকাত দিতে প্রস্তুত হল না। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা তাদের মস্তক ছিন্ন করে তাদেরকে অহংকারী ও বিদ্রোহী শয়তানের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন। এ ধরনের যাবতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে এই একই হুকুম প্রযোজ্য।

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁর নির্দেশকে উপহাস করে, তিনি যেসব কাজ নিষিদ্ধ করেছেন তাতে লিপ্ত হয় এবং এতে গৌরব বোধ করে— তাহলে ইসলামের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকল ? এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলাম বলার অর্থ হচ্ছে— নির্বুদ্ধিতাকে আভিজাত্য, উন্মাদনাকে প্রজ্ঞা, মিথ্যাকে সত্য এবং ছালার চটকে কিংখাব বলে প্রচার করা।

কোন কোন ফিক্‌হ্‌বিদ অসাবধানতাবশতঃ লিখে দিয়েছেন যে, নামায ত্যাগকারীকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা যেতে পারে, তাকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বলা যাবে না। এটা সঠিক কথা নয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করে নেয় অথচ নামায পড়াকে গ্রহণ করে না, দীনের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? দীনের সাথে যখন তার কোন সম্পর্ক নেই তখন তাকে মুসলমান বলার কি অর্থ আছে ?

এখন আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক কি ? কুরআন ও হাদীস থেকে এ সম্পর্কে কি জানতে পারি ? এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

ইসলামের অবনতি আমাদের ধর্মবিরোধী কার্যকলাপেরই ফল

আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ, আল্লাহ্-ভীতি, শরীআতের আনুগত্য, আখিরাতের প্রস্তুতি, জবাবদিহির ভয়— এ হচ্ছে দীন ও শরীআতের প্রাণশক্তি। নিঃসন্দেহে দীনের শিক্ষার মধ্যে নৈতিক নীতিমালাও রয়েছে এবং সামাজিক আইন-কানুনও

রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে এবং সামাজিক জীবনের সাথেও। জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যেখানে এই নীতিমালা ও আইন-কানুন পরিব্যাপ্ত নয়।

ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা যেন একটি ইমারত এবং আকীদা-বিশ্বাস হচ্ছে এর স্তম্ভ। অথবা এগুলো হচ্ছে বাস্তব কর্ম— যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ। এখন স্তম্ভ যদি ধ্বসে যায়, অথবা উদ্দেশ্য যদি দৃষ্টির অন্তরালে বিলীন হয়ে যায় তাহলে যাবতীয় নৈতিক বিধি-বিধান এবং সামাজিক ব্যবস্থা স্ব স্ব মূল্য ও মর্যাদা হারিয়ে বসবে। তা অন্য একটি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং যার অবস্থা হবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যেমন কাগজীমুদ্রা স্বর্ণমান হারিয়ে ফেললে তার বিনিময় মূল্য নিঃশেষ হয়ে যায়।

নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অনুভূতি জাগ্রত করা, বান্দার ওপর তাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্ব এবং জীবনযাপনের জন্য আইন প্রণয়নে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার এবং তাঁর নির্ধারিত বিধি-নিষেধের সীমাকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধার্মিকতার প্রাণশক্তি। অতএব এই অনুভূতি এবং স্বীকৃতির দাবি এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তাই করব। তা কেবল এই উদ্দেশ্যে নয় যে, এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বরং এ কারণেই যে, আল্লাহ্‌র অনুগত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী দাবি তাই। এটাই হচ্ছে তাঁর অধিকার আদায়ের পন্থা। অবশ্য এর মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণের একটি দিকও রয়েছে।

একজন জড়বাদী বা নাস্তিকও তার আচার-ব্যবহার এবং কার্যকলাপে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারে। কিন্তু তার সত্য বলাটা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয় না। কেননা সে তার স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব সে তাঁর কাছে কোন সওয়াব বা প্রতিদান পাওয়ারও আশা রাখে না। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলে তখন তার লক্ষ্য থাকে তার প্রতিপালক তাকে সত্য কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ·

তোমরা যারা ঈমান এনেছ— আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও। —সূরা তাওবা ঃ ১১৯

অতএব তার সত্যবাদিতার আসল কারণ এই যে, সে আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনেছে এবং এই ঈমান তাকে সত্যবাদিতার উচ্চ শিখরে পৌছে দেয়, যাবতীয় নেক আমল— তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের হোক অথবা সমষ্টিগত পর্যায়ের— যখন তা ইসলামী শিক্ষার অঙ্গে পরিণত হয় বা মুমিন ব্যক্তির আচরণের অংশে পরিণত হয়, তখন তা জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রতীয়মান হয়ে উঠে। তার মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়ের গভীরতা সৃষ্টি হয় এবং তার জীবন আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠে। আল্লাহ্র ওপর ঈমান যাবতীয় কাজে উৎসাহ যোগায় এবং আল্লাহ্ ভীতি হচ্ছে এর প্রাণ যা কখনো তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

এখানে আমি মানব মস্তিষ্কপ্রসূত কতগুলো ব্যবস্থাপনার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেগুলো অন্তত কতগুলো রসম-রেওয়াজ ও রীতি-নীতির উপর লোকদের একত্র করে, যার ফলাফল কখনো ভাল হয় আবার কখনো খারাপ হয়। অতঃপর লোকেরা এই রসম-রেওয়াজ মেনে চলাকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি মনে করতে থাকে। অথচ ঈমানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বরং তা মানুষের মধ্যে এমন প্রবণতা সৃষ্টি করে যার ফলে ভুলেও তার মনে আল্লাহ্র কথা জাগ্রত হয় না।

এই দলের লোকেরা ধর্মকে দুটি অংশে বিভক্ত করে ফেলেছে। আকীদা বিশ্বাস ও ইবাদতের বিষয়গুলো তারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে। এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। বাস্তব কর্মপন্থা এবং সামাজিক নীতিমালার উপর তারা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে, তার অনুশীলন করে এবং এর মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে থাকে।

আমাদের জানা আছে যে, আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন— এর প্রতিটি কাজ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য করা এবং তাঁর অধিকার আদায় করা। কিন্তু যদি এসব কাজ করা হয় এবং এর লক্ষ্য যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন না হয়, তাহলে এসব কাজের কোন মূল্য নেই।

পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তা যতই কল্যাণকর হোক না কেন এবং সাময়িকভাবে তার অবদান যত বড়ই হোক না কেন।

একটি ঈমানদার জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'ঈমান' কখনো দ্বিতীয় স্তরের জিনিস হতে পারে না। আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান আমাদের প্রাণ ও খাদ্যে পরিণত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসার চর্চা হবে, এটা আমাদের সমাজের আবেগময় শ্লোগানে পরিণত হবে এবং আমাদের জীবন-পাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে।

একদল লোক আখিরাত ও বেহেশত-দোযখের কথা শুনে হাসে। তারা মনে করে এগুলো প্রাচীনকালের রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কাহিনীর দিন ফুরিয়ে গেছে, ওয়াজের মাহফিলেই এসব কথা বিকাতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে যেদিন আখিরাতের প্রসঙ্গ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাটা সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়বে এবং আখিরাতের কথাকে অর্থহীন মনে করা হবে, সেদিন ধর্ম বলতে কোন জিনিসের আর অস্তিত্ব থাকবে না।

এ কথা মুসলমানদের ভাল করে বুঝে নেওয়া উচিত। তাদের এ কথা ভাল করে বুঝ নেওয়া দরকার যে, পরকাল এবং পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারটি হাসি-ঠাট্টার জিনিস নয়। আল্লাহ্ এবং আখিরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে জীবনযাপন করা মূলত সঠিক পথ পরিত্যাগ করা এবং মরীচিকার পেছনে ধাবিত হওয়ারই নামান্তর।

আমাদের মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম ঈমানকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হবে এবং যে বস্তুবাদী সভ্যতা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যকে গ্রাস করে ফেলেছে আমাদেরকেও তার স্রোতে ভেসে যাওয়া চলবে না। এই সভ্যতা আল্লাহ্র প্রতি বিমুখ এবং ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত। তা নিজের কুপ্রবৃত্তির পূজারী এবং ধর্মের প্রতি বিরাগী।

মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের ধারণা এই যে, আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত ও নৈতিকতার সমষ্টিই হচ্ছে দীন। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক হচ্ছে যাবতীয় নির্দেশের প্রাণ। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কটা যদি নির্ভেজাল হয়, তাহলে এটা মুক্তির উপায়ে পরিণত হবে। যদিও অন্যান্য দায়িত্ব হুবহু পালন করা সম্ভব নাও হয়।

এখানে কিছুক্ষণ থেমে আমরা এই বক্তব্যের মূল্যায়ন করতে চাই। মূল্যায়নের সময় আমরা মূল ইমানের সাথে বাড়াবাড়িও করব না এবং ঈমানের অবশ্যম্ভাবী ফল— আমলের সাথেও বাড়াবাড়ি করব না। আমাদের পূর্বকালের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ঠিকই করেছেন। তাঁরা কাফিরদের প্রতিটি ভাল কাজকে মূল্যহীন বলেছেন। তাঁরা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, নেকীর পাল্লায় তাওহীদ বা একত্ববাদের কলেমাই ভারী ও মূল্যবান।

তাদের দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। আজো আমরা দেখতে পাই, যে ব্যক্তি আত্মসাতের অপরাধে অপরাধী তার এই অপরাধ তার অতীতের যাবতীয় অবদানকে ম্লান করে দেয়। যদি কখনো বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে দেশকে শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে তাহলে তার ক্ষেত্রে ক্রোধ, ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু নজরে আসবে কি ? তার সম্পর্কে সকলের রায় কি এই হবে না যে, তাকে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দেয়া হোক এবং তা দ্রুত কার্যকর করা হোক ?

যদি বলা হয় যে, এই বেচারা তার মায়ের খুবই অনুগত ছিল, কর্মচারীদের প্রতি দয়াপরবশ ছিল, বন্ধুদের জন্য বসন্তের বাগান ছিল, তাহলে তার এই সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলীর প্রতি কি কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে ? যদি কেউ তার পক্ষে এ ধরনের সুপারিশ করতে আসে, তাহলে কি তার মুখ সুঁই দিয়ে সেলাই করে দেয়া হবে না ? এসব গুণ তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাস্তবিকপক্ষে আমাদের পূর্ববর্তীগণ কাফিরদেরকে সেই দৃষ্টিতেই দেখেছেন, যে দৃষ্টিতে আজকের যুগে কোন দেশ বা জাতির বিশ্বাসঘাতককে দেখা হয়। তারা তার অতীতের কোন ভাল কাজের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হবে না। আমাদের দৃষ্টিতেও কাফিরদের কাজ ঘৃণা ও অবজ্ঞা পাবারই উপযুক্ত।

আল্লাহ্ তাআলাকে অস্বীকারকারী, তাঁর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এবং আখিরাত ও জবাবদিহিকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী নিঃসন্দেহ চরম বিশ্বাসঘাতক। এখন সে যাই করুক তার কোন মূল্য নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ·

আল্লাহ্ যাকে অপদস্ত করবেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না।

—সূরা হজ্জ ঃ ১৮

নিঃসন্দেহে এটা একটা বাস্তব সত্য। কিন্তু এখান থেকে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে গেছে। তা ঈমান ও ঈমানদার সম্প্রদায়ের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। সাধারণ মুসলমানরা মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ্র সাথে যদি উত্তম সম্পর্ক থাকে তাহলে অবশিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তাতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তাদের চিন্তার পরিধি বৃদ্ধি পেতে পেতে এই পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, এসব ফরয ছুটে গেলেও মূল ঈমানের দ্বারাই পার পাওয়া যাবে।

একদিকে তো এই অবস্থা বিরাজ করছে, অপরদিকে যেসব লোক ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত এবং স্রষ্টার সাথে যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না তারা কতগুলো মানবিক বিষয়ে নিজেদের যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। যখন পৃথিবীর বুকে এ দুটি চিত্র প্রতীয়মান হয়ে গেল তখন এই দীনের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেল, মুদিনদের বৈশিষ্ট্য দুর্বল হয়ে পড়ল এবং গোটা পৃথিবীকে বিপর্যয়ের অন্ধকার গ্রাস করে ফেলল। প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ লোকদের বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে এই পরিস্থিতিরি মোকাবিলায় এগিয়ে আসা উচিত।

আমাদের ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমে নিজেদের সংশোধন করা, অতঃপর অন্যদের চিন্তা ও কর্মে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা। নিঃসন্দেহে ঈমান এই দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় নেকী এবং সর্বাধিক কল্যাণকর জিনিস। এটা অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। যেখানে ঈমান আছে সেখানে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি রয়েছে, আর যেখানে ঈমান নেই সেখানে অন্ধকার আর অন্ধকার।

সৌন্দর্যমণ্ডিত ঈমানের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ রয়েছে। তার মধ্যে আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের পূর্ণ ভাবধারা বিরাজ করবে, নিজের নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে, মানুষের সাথে ইনসাফপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করবে।

অতঃপর মুমিনরাই হবে এই দুনিয়ার শাসক, পরিচালক ও সর্বময় কর্তা। এটা সেই ঈমান যা পুরস্কার, সম্মান ও শুভ পরিণতির অধিকারী হয়। এই সেই ঈমান যা সব সময় বিজয়ী হয়ে থাকে। যেকোন ময়দানেই হোক নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা তার উপর জয়যুক্ত হতে পারে না, তার সামনে টিকতেও পারে না।

ঈমানকে অবনত করার জিনিস এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার একটা কৃত্রিম সম্পর্ক থাকবে, যা তাকে পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করতেও উৎসাহিত করবে না, আর তাকে পতন থেকেও বাঁচাবে না। সে কতিপয় ফরয ইবাদতের বাহ্যিক রূপকেই যথেষ্ট মনে করে বসে থাকবে এবং তা তার ভেতরে ও বাইরে কোন আকর্ষণীয় ও সজীব আখলাক-চরিত্র সৃষ্টি করবে না। এই ধরনের বাহ্যিক ঈমান কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। তা কোন প্রতিযোগিতার ময়দানে বিজয়ী হতে পারে না। যদিও আজ সর্বত্র এই পর্যায়ের ঈমানের ছবিই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নাস্তিক্যবাদ যদি কখনো মাথা তোলে, অথবা এর প্রতারণা ও কুমন্ত্রণা কিছুটা সাফল্য লাভ করে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে উল্লিখিত ধরনের ক্রটিপূর্ণ ঈমানের দ্বারা মোকাবিলা করা কি সম্ভব ? নাস্তিক্যবাদের ঝাণ্ডা এই ধরনের নিকৃষ্ট ও ঈমানদারদের ছাড়া আর কাদের মধ্যে উত্তোলিত হতে পারে ?

একথা আমাদের কি করে আনন্দিত করতে পারে যে, এই উম্মাত ধর্মত্যাগী হয়ে জীবনযাপন করুক, তারা এমন একটি দীনের অনুসারী না হোক যা তাদের যাবতীয় বিষয়কে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে এবং তাদেরকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে ? যে মতবাদ ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তির জন্ম দেয়, উন্নত মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরাভূত করে দেয়, নীচতার জন্ম দেয়, বিদআত, পথভ্রষ্টতা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটায় এবং মানবীয় যোগ্যতাকে পঙ্গু করে দেয়— মানুষের মাঝে এরূপ একটি মতবাদ বা জীবন দর্শনের প্রভাবশালী হওয়াটা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়।

আমাদেরকে ন্যায়নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে। আমরা যেন ইসলামের বিশেষত্বকে ভুলে না যাই যে, তা মানবজাতিকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে, তা তাদেরকে উন্নত জীবন দান করেছে। এর অর্থ এই নয় যে, তা নির্বোধের মত অনুসরণ করতে হবে। বরং ইসলামের মঞ্চে মানুষ তার যোগ্যতা প্রদর্শন করবে এবং তা থেকে লাভবান হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এক আল্লাহ্‌র বান্দা। তার কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌কে সঠিকভাবে জেনে নেওয়া এবং তাঁর আনুগত্য করা। মানুষকে এই পৃথিবীর নেতৃপদে আসীন করা হয়েছে। সে এই পৃথিবীর কাছ থেকে সেবা আদায় করবে এবং এর মধ্যে লুকায়িত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হবে। মানুষ পরস্পরের ভাই। প্রতিটি ভাল কাজে তার ভাইয়ের সহযোগিতা করা, তার সাথে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহার করা এবং তার সাথে সহানুভূতিসুলভ আচরণ করা তার কর্তব্য।

ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনায় শায়খ ইসহাক হুসায়নীর কথা আমার কাছে খুবই পছন্দনীয়। তিনি বলেন, "মানব রচিত ধর্মই হোক অথবা আসমানী ধর্মই হোক" — আমরা যদি এর ইতিহাসের মূল্যায়ন করি তাহলে ইসলামের দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

এক ঃ জীবন-দর্শনের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলাম জীবনকে বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি অথবা বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত 'একক' মনে করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের আত্মিক দিক বস্তুগত দিকের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত সংশোধন সামাজিক সংশোধনের চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কতিপয় আত্মিক মূল্যবোধ যেভাবে ইবাদতের ভিত্তি, তদ্রূপ কতিপয় নৈতিক মূল্যবোধ পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণের ভিত্তি। জামাআত বা সমষ্টির যেসব অধিকার রয়েছে, ব্যক্তিরও অনুরূপ অধিকার রয়েছে।

যাবতীয় ভাল কাজ বিবেচনাযোগ্য এবং অনুসরণযোগ্য। একের সাহায্য ছাড়া অপরের মধ্যকার ঘাটতি পূরণ হতে পারে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে— ইসলাম হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের পরিপূর্ণ সাফল্যের পয়গাম। সে এমন একটি উন্নত সমাজ এবং দৃষ্টান্তমূলক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চায় যা সুখে-দুঃখে একে অপরের শরীক হবে, নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অপরের বাহু হবে এবং যা কল্যাণকর কাজে উৎসাহ যোগাবে ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত রাখবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

ঈমানদান পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের সহযোগী। তারা পরস্পরকে ন্যায়ানুগ কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। —সূরা তাওবা ঃ ১১

দুই ঃ ইসলাম গোটা মানবজাতিকে একই পরিবারভুক্ত মনে করে। ইসলামের দাবি হচ্ছে, তারা পরস্পর পরিচিত হবে, একে অপরের সহযোগিতা করবে এবং কেবল তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতিকেই সম্মান, মর্যাদা ও আভিজাত্যের মাপকাঠি গণ্য করবে। অনুরূপভাবে ইসলাম আল্লাহ্‌র যাবতীয় পয়গামকে একই দৃষ্টিতে দেখে এবং নবী-রাসূলদেরকে পরস্পরের ভাই মনে করে। সে তাদের মধ্যে কোনরূপে পার্থক্য করে না।

"এ কারণেই ইসলামে পারস্পরিক আদান-প্রদানে রয়েছে ইনসাফ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি। সে যেখানে জ্ঞানে পরিপূর্ণ কথা পায় নিয়ে নেয়, কল্যাণকর জিনিস যেখানেই পায় তার সমাদার করে। এ কারণেই গোটা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছিল এবং ইসলামী সভ্যতা সমগ্র মানবীয় সভ্যতার সুগন্ধি নিজের মধ্যে ধারণ করে নিয়েছে।

কুরআন মজীদে অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা উত্তম চরিত্র-নৈতিকতার দিকে আহ্‌বান জানায়। তা সামাজিক সৌন্দর্যে সুসজ্জিত হওয়ার এবং সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠাকে স্বভাবে পরিণত করে নিতে উৎসাহ্ দান করে। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র ও ইয়াতীমদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ জোর দেয়। অভাবগ্রস্তকে খাবার দেওয়া, দুর্বল ও অসুস্থদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন এবং সন্ধি ও সমন্বয়কে অগ্রাধিকার দেয়। ধৈর্য, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, দান-খয়রাত এবং নেকী ও তাকওয়াভিত্তিক কাজে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে।

অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা নৈতিক অবনতি ও নীচ মানসিকতাকে প্রতিরোধ করে। যেমন মুখ থেকে খারাপ কথা বের করা যাবে না, খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে, মিথ্যা বলা যাবে না, খেয়ানত বা আত্মসাৎ করা চলবে না, জুলুম-নির্যাতন, বাড়াবাড়ি, বিদ্রোহ অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যায়ভাবে অপরের ধনসম্পদ

কুক্ষিগত করা যাবে না, পিতৃহীনের সম্পদ ভোগ করা যাবে না, তাদের দাবিয়ে রাখা এবং তাদের উপর বিভিন্ন পন্থায় নির্যাতন করা যাবে না। ওজন ও পরিমাপে ফাঁকি দেওয়া চলবে না এবং অপব্যয় থেকে দূরে থাকতে হবে। এ বিষয়ে নবী করীম (সঃ)-এর হাদীস এবং সাহাবা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অসংখ্য বাণী রয়েছে। এ সবই কুরআনের মূলনীতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং কুরআনের আয়াতের সমর্থক ও ব্যাখ্যা।

উপরোক্ত মূল্যায়ন থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম যেন এমন একটি আশ্চর্যজনক ঘর যা দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের কেন্দ্রস্থল। এমন কোন কল্যাণ নেই যা এই কেন্দ্রে বর্তমান নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন অনেক জ্ঞানবান ব্যক্তি এবং বক্তা ও লেখক রয়েছেন, যারা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দীনকে বুঝবার চেষ্টা করেন না এবং সমাজকেও এর মাধ্যমে সংশোধন করার চেষ্টা করেন না।

হাঁ, এমন অনেক আলেমও আছে যারা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নামে ইমানের ক্ষতি সাধন করে এবং দীনের সাথে কার্যত বৈরী আচরণ করে। তারা কত বড় অন্যায় করে যখন তারা এই ধারণা বদ্ধমূল করে নেয় যে, দীন হচ্ছে একটি রুমাল বিশেষ, যার দ্বারা গুনাহগার লোকেরা নিজেদের অপরাধ মুছে নেয়, তারা ভুল করতে থাকে আর ঈমান তা দূরীভূত করে দেয়, তারা ইবাদতের ওয়াদা ভঙ্গ করতে থাকে আর ইসলামের দাবি তাদের সংযোগ রক্ষা করতে থাকে। বিগত আসমানী ধর্মের অসংখ্য অনুসারী ধর্মকে এভাবেই বুঝেছেন। তাদেরও ধারণা ছিল, ধর্মের সাথে কোন রকম একটা সম্পর্ক বজায় থাকলেই তা মুক্তির জন্য যথেষ্ট ধর্মের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কুরআনের ভাষায় তাদের বক্তব্য ঃ

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ·

তারা বলে, বেহেশতে ইহুদী ও খৃস্টান ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তাদের ভিত্তিহীন আশা মাত্র। —সূরা বাকারা ঃ ১১১

কুরআন মজীদ এ ধরনের যাবতীয় ধারণা-বিশ্বাসের শিকড় কেটে দেয় এবং মুক্তির সঠিক রাস্তা নির্ধারণ করে দেয়। আর তা হচ্ছে জীবন্ত ঈমান ও ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে নেক কাজ করা এবং আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া।

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۰ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ۰

তাদের বল, তোমাদের দাবিতে তোমরা সত্যবাদী হলে এর উপযুক্ত প্রমাণ পেশ কর। বরং সত্য কথা হচ্ছে— যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে এবং কার্যত সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করবে তার রবের কাছে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে এবং এ ধরনের লোকদের জন্য কোন ভয় ও আংশকার কারণ নেই।

—সূরা বাকারা ঃ ১১১-১২

এক শ্রেণীর নিম্নমানের বক্তার অবস্থা এই যে, তারা যেকোন একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) পেলেই তা নিয়ে উড়তে শুরু করে। প্রতিটি রিওয়ায়াতের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র এবং একটি নির্দিষ্ট পটভূমি রয়েছে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে চেষ্টা করে না এবং স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সবখানেই তা ব্যবহার করতে থাকে। তারা এজন্য কিতাব ও সুন্নাতের গোটা ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করে এবং ঈমানের মেজাজকেও বিবেচনা করে না। আর ঈমানের মেজাজ হচ্ছে মৃতের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা এবং বিচ্ছিন্নতাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে দেওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হাদীসে বিতাকা' উল্লেখ করা যেতে পারে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ لَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعُوْنَ سِجِلاً كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا ؟ اَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ ؟ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ ۰ فَيَقُوْلُ تَعَالٰى بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَاِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ۰ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ ؟ فَقَالَ فَانَّكَ لاَ تُظْلَمُ . قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِيْ كِفَّةٍ وَّالْبِطَاقَةُ فِيْ كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْئٌ . قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সৃষ্টিকুলের সামনে নিয়ে আসবেন। অতঃপর তার গুনাহের নিরানব্বইটি দফতর তার সামনে খুলে ধরা হবে। চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রতিটি দফতর গুনাহে পরিপূর্ণ থাকবে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এর কোন একটি অপরাধ অস্বীকার করতে পার ? অথবা আমার এই নথিপত্র সংরক্ষণকারীরা কি তোমার ওপর জুলুম করেছে ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এর কোনটিই নয়। আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কি কোন ওজর আছে ? সে বলবে, হে প্রভু! আমার কোন ওজর নেই। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, হাঁ, আমার কাছে তোমার কিছু নেক কাজও রয়েছে। আর তোমার ওপর কোনরূপ জুলুম করা হবে না। অতঃপর এক টুকরা কাগজ বের হবে। তাতে লেখা থাকবে ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রসূল।" অতঃপর তিনি বলবেন, তোমার যাবতীয় কাজ ওজন করাতে যাও। সে তখন বলবে, হে প্রভু! এই নথিপত্রের সাথে এই কাগজের টুকরাটি কিসের ? তিনি বলবেন, তোমার ওপর অবিচার করা হবে না। নবী করীম (সঃ) বলেন, অতঃপর নিরানব্বইটি দফতর এক

পাল্লায় এবং কাগজের টুকরাটি অপর পাল্লায় রাখা হবে। কিন্তু পাপের বিরাট দফতর হালকা হয়ে যাবে এবং কাগজের টুকরাটি ভারী হয়ে যাবে। কোন কিছুই আল্লাহ্ তাআলার নামের সমকক্ষ হতে পারে না।

—তিরমিযী, (৪১) আবওয়াবুল ঈমান, (১৭) বাব মা জাআ ফী মান ইয়ামূতু ওয়া হুওয়া ইয়াশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নং ২৬৩৯ ; ইবন মাজাহ, যুহ্দ অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড।

হাদীসের তাৎপর্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার। যদি এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার ওপর আরোপিত যাবতীয় দায়দায়িত্ব অকেজো হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর কোন অর্থ থাকে না ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۔ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۔

ফাসাদকারী লোকদের কাজকে আল্লাহ্ তাআলা শুদ্ধ হতে দেন না। আল্লাহ্ তাঁর ফরমান দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিভাত করে দেখান, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন।

—সূরা ইউনূস ঃ ৮১, ৮২

এ হাদীসের সনদ যদি সহীহ্ হয় তাহলে আমাদের মতে এ হাদীস এমন মুশরিক ব্যক্তির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে তার গোটা জীবনটাই পাপ কাজে শেষ করেছে। অতঃপর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু পূর্বজীবনের অপরাধসমূহের প্রতিবিধান করার মত সময় পায়নি এবং ইতিমধ্যে তার জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। অনন্তর এ হাদীস বলে দিচ্ছে যে, ঈমানের সাথে শেষ পরিণতির কতটা গুরুত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ্র কাছে একত্ববাদের কি মর্যাদা রয়েছে।

এ ধরনের যাবতীয় হাদীস না বুঝে-শুনে সরলভাবে বর্ণনা করে বেড়ানো গোটা দীনকে ধ্বংস করে দেওয়ার সমার্থবোধক। এই জিনিসটি আজ

ধর্মভীরুদের মধ্যে এমন লোকের সৃষ্টি করে দিয়েছে যারা ঈমানের ক্ষতি সাধন করছে এবং এর মূল্য ও মর্যাদাকে হেয় করছে।

আজ পৃথিবী এমন ঈমানের মুখাপেক্ষী যা তাকে বিশ্বপ্রভুর সামনে নিয়ে ঝুঁকিয়ে দেবে, তার প্রভুর বিশ্বাসভাজন ও অনুগত বানিয়ে দেবে এবং সংগ্রামের পথে পরিচালিত করবে। অন্যথায় লক্ষণ খুব ভাল দেখা যাচ্ছে না, বিপদের ঘনঘটা আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ঈমান ও আমল (কাজ)

আচার-আচরণের সাথে নৈতিকতার যেরূপ সম্পর্ক রয়েছে আমলের সাথে ঈমানেরও অনুরূপ সম্পর্ক রয়েছে। কোন ব্যক্তি যখন মহামহিম আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে, আখিরাতের ওপর প্রত্যয় সৃষ্টি হয় এবং নবী-রাসূলগণের আনীত শিক্ষাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেয় তখন এসব জিনিস অবশ্যম্ভাবীরূপে তার মধ্যে গতি এবং কাজের প্রাণশক্তি ফুঁকে দেয়, তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুসন্ধান এবং তা লাভ করার জন্য গতিশীল করে তোলে এবং তার পদযুগল আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ়ভাবে জমিয়ে দেয়। ঠিক সেভাবে যেভাবে একজন বীর সৈনিক ভীতিকর পরিস্থিতিতে নিজের বীরত্ব প্রর্দশন করে থাকে, অথবা একজন দানবীর ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিজের দানশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখায়, অথবা একজন সত্যবাদী লোক কথা বলার সময় যেভাবে ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার ওপর অবিচল থাকে।

এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, বরং অসম্ভব ব্যাপার যে, কোন ব্যক্তি তার দীনকে এই স্তর থেকেও নিচে নামিয়ে দিতে পারে অথবা কিতাব ও সুন্নাতের এমন অর্থ বের করবে যা তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু ইসলামের শত্রুদের অকল্যাণ হোক। যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে ব্যর্থ হয়ে তারা চালবাজি ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে, হিংস্র ছোবল বিস্তার করে যে কাজ উদ্ধার করতে পারেনি, মিশ্রির ছুরি দিয়ে তা উদ্ধার করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু ইসলামকে তার নিজের ঘরে ধরাশায়ী করে রেখে গেছে।

তারা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক রেখে গেছে যারা আস্তিনের সাপ হয়ে তাদের দংশন করছে। এরা তাদের সামনে ইসলামের চিত্রকে এমন ভঙ্গীতে পেশ করছে যে, তা কেবল একটি সহজ-সরল কলেমা যার কোন পৃষ্ঠপোষক নেই। এটা নযর-নিয়াযের এক জগত, এখানে জিহাদ ও কর্মচাঞ্চল্যের কোন প্রয়োজন নেই।

এই ভ্রান্ত ও নিরোপদ্রব দর্শনের ফল এই হল যে, বছরের পর বছর ধরে মুসলমান, ইহূদী ও কিবতীরা পাশাপাশি বসবাস করে আসছে এবং মেলামেশা করছে, কিন্তু তুমি কোন একটি দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না (কে মুসলমান আর কে অমুসলমান)। তাদের কেউ মসজিদেও যায় না, কোন ফরযও আদায় করে না এবং আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মানও প্রদর্শন করে না। তাদের মধ্যে যদি কিছু পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে এতটুকুই যে, ইহূদীরা শনিবারকে পবিত্র মনে করে এবং খৃস্টানরা রবিরারে চার্চে যায়। আর নামসর্বস্ব মুসলমানদের ইসলামের সাথে ব্যস এতটুকু সম্পর্ক আছে যে, তাদের ব্যর্থ সার্টিফিকেটে কারো নাম আবদুল্লাহ্ এবং কারো নাম আবদুর রহমান।

পরিতাপের বিষয় কোন মুসলিম আলেমই এই ব্যাপারটির প্রতি কোন গুরুত্বই দেন না। মানুষ যদি না বুঝে-শুনে কলেমা তৌহীদ পড়ে নেয় তাহলে তার একটি আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং এখন সে সহজেই যেকোন ফরয পরিত্যাগ করতে পারে অথবা যেকোন হারাম কাজে লিপ্ত হতে পারে। এরা ধারণা করে নিয়েছে যে, ধর্ম এটাই শিখায়। তার যা করছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

যেমন কোন দল সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করল এবং তারা দলের গঠনতন্ত্র এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনগণের সামনে পেশ করল। তাদের দলীয় গঠনতন্ত্রে এমন অনেক ধারা রয়েছে যার মাধ্যমে দলের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং কর্মপন্থার পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে যদি এমন একটি ধারাও থাকে যে, দলের যেকোন সদস্য ইচ্ছা করলে সংগঠনের মূলনীতি মানতেও পারে বা নাও মানতে পারে, এর

নির্দেশাবলীর আনুগত্য করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে— তাহলে সব লোকই বলবে, এত পরিষ্কার হাসিঠাট্টা ও উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলে আমরা ইসলাম সম্পর্কে কি করে ধারণা করতে পারি যে, তা নিজের আস্তিনে এমন কুঠার রাখে যা তার বুনিয়াদকে ধূলিসাৎ করে দেয় ?

আমরা ইসলামের নির্দেশাবলীর মধ্যে এমন নির্দেশ কি করে খুঁজতে পারি যা তার সাথে তামাশা করার এবং বিপথগামী হওয়ার অনুমতি দিতে পারে ? আমরা কি করে এরূপ দাবি করতে পারি যে, একনিষ্ঠ আমল একটি সৌন্দর্য বা বাহ্যিক রং বিশেষ, তার মধ্যে যদি কোন ক্রটি হয়ে যায় তাহলে এতে কিছু অসুবিধা নেই ? এটা সেসব নির্বোধ লোকেরই ধারণা যারা দীনকে হাসি-ঠাট্টার বস্তু বানিয়ে রেখেছে এবং যারা পার্থিব জীবনের ধোঁকায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। কুরআন মজীদের বাণী ঃ

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

তারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে, আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারণার গোলক-ধাঁধায় নিমজ্জিত করে রেখেছে। —সূরা আরাফ ঃ ৫১

আল্লাহর নির্ধারিত সীমার সংরক্ষণ এবং ফরযসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে যে অনীহা চলছে তার শাস্তি কি তাদের ভোগ করতে হবে না ? মুসলমানরা যখন তাদের দীন সম্পর্কে এরূপ ক্রটিপূর্ণ ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল তখন তাদের ওপর কত বিপদ এসেছে, কিয়ামতের ঘনঘটা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলেছে। যে জাতি আমলকে একটি 'সওয়াবের কাজ মাত্র' মনে করে তাদের দীন কি করে নিরাপদ থাকতে পারে ? তারা দুনিয়াতে কি করে অবিচল থাকতে পারে ? আল্লাহ্ তাআলা তো আমলকে জীবনের পয়গাম, মানব জীবনের দৈনন্দিন বৃত্তি এবং কল্যাণকর কাজে অগ্রগামিতাকে সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব ও হিসাব-নিকাশের বুনিয়াদ ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ .

তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদের পরখ করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি সর্বশক্তিমান এবং ক্ষমাশীল। —সূরা মুলক ঃ ২

আল্লাহ্‌র কিতাবে এমন কোন আয়াত নেই, যাতে কেবল ঈমানেরই উল্লেখ আছে। বরং প্রতিটি স্থানে ঈমানের সাথে নেক আমল অথবা তাকওয়া অথবা ইসলামেরও উল্লেখ আছে। এভাবে ঈমানের সাথে আমলের এতটা মজবুত সম্পর্ক রয়েছে যে, তার মধ্যে শিথিলতার কোন প্রশ্নই আসে না। যদি হিদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে তুলনা করা হয় তাহলে ঈমান ও আমলকে এক দাঁড়িতে রাখা হবে এবং কুফরকে অপর দাঁড়িতে রাখা হবে।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ وَلَا الْمُسِىْءُ .

আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না এবং ঈমানদার নেককার লোক ও দুষ্কৃতিকারীও কখনো সমান হতে পারে না। —সূরা মুমিন ঃ ৫৮

বহু জায়গায় ইসলাম ও তার পরিপূর্ণ তাৎপর্যের দিকে কতগুলো নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে ইশারা করা হয়েছে। যেমন ঃ

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ . اَوْ اِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ . يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . اَوْمِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ .

সে ব্যক্তি দুর্গম পথ অতিক্রম করতে সাহস করেনি। তুমি কি জান সেই দুর্গম ঘাঁটি পথ কি ? কোন গলা দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে কোন নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধূলিমলিন মিসকিনকে খাবার দান করা —সূরা বালাদ ঃ ১১-১৬

বরং কুরআন মজীদে কোন কোন নেক আমলের প্রতি অমনোযোগিতাকে আত্মিক বিশ্বাসে শূন্যতা ও ঈমানশূন্য অন্তরের নিদর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন সূরা মাউনে বলা হয়েছে ঃ

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

> তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে আখিরাতের শুভ পরিণতি ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে ? এ তো সেই লোক, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকীনদের খাবার দান করতে উৎসাহিত করে না। —সূরা মাউন ঃ ১-৩

কখনো ঈমানকে একটি গুণবৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা হয়, যা আমলের সাথে সংযুক্ত হয়। তা সাধারণ মানবীয় চরিত্রের ওপর ছাপ রাখে এবং তার সংশোধন করে তাকে মহাপ্রভুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়। এভাবে প্রথমে আমলের উল্লেখ করা হয়। কেননা প্রথমে তারই অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। অতঃপর ঈমানের উল্লেখপূর্বক বোঝানো হয় যে, কোন কাজ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ঈমান হচ্ছে শর্ত। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝

> অতঃপর যে ব্যক্তি নেক আমল করবে এই অবস্থায় যে, সে মুমিন— তার কাজের কোন অমর্যাদা করা হবে না। আমরা তা লিখে রাখছি। —সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৪

অতঃপর আখিরাতে এমন কি জিনিস হবে যার ওজন দেওয়া হবে ? তা কি এই আমল নয় যা মানুষকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে ? নাকি মৌখিক দাবি এবং অলীক ধারণা-বিশ্বাস ?

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ ۝ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا

يَظْلِمُوْنَ .

সেই দিন ওজন অনুষ্ঠানের ব্যাপারটি সুনিশ্চিত। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহা ক্ষতির সম্মুখীন করবে। কেননা তারা আমাদের আয়াতসমূহের সাথে জালিমের ন্যায় আচরণ করেছে।

—সূরা আরাফ ঃ ৮, ৯

আমাদের সামনে এমন অনেক জাতির ইতিহাস বর্তমান রয়েছে যারা নিজেদের দুষ্কৃতির কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা লূত আলায়হিস সালামের জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কেননা তারা অশ্লীলতত, যেনা-ব্যভিচার ও সমকামিতার মত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি শুআইব আলায়হিস সালামের জাতিকে এইজন্য ধ্বংস করেছেন যে, তারা ওজন-পরিমাপে ফাঁকি দিত। নেবার বেলায় বেশি নিত, দেবার বেলায় কম দিত। এসব দুষ্কৃতিকারীর যে পরিণতি হয়েছে তা আমাদের সামনেই রয়েছে।

এখন যদি আমাদের এই উম্মাত দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদেরকে কি এর পরিণতি ভোগ করতে হবে না ? তাদের জন্য কি মুক্তির কোন বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে ? ইসলাম পূর্বের শরীআত থেকে ভিন্নতর কোন নতুন শরীআত নয় যে, তা ঈমানকে বাধ্যতামূলক করে এবং কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়। বরং কুরআন মজীদ আমাদের অতীত জাতিসমূহের করুণ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন আমরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করি। অতঃপর আল্লাহ্র বাণী আমাদের সামনে রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا كَذَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ . ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ .

হে লোকেরা! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা জুলুমের আচরণ অবলম্বন করেছিল। তাদের কাছে তাদের নবী-রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনেনি। এভাবেই আমরা পাপীদেরকে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। এখন তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, যেন আমরা দেখতে পারি তোমরা কি রকম কাজ কর। —সূরা ইউনুস ঃ ১৩, ১৪

এ যেন আমাদের পরীক্ষা চলছে। আমাদের প্রতিটি গতি ও স্থিতির পর্যবেক্ষণ চলছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ওপর ঈমান ও আমল উভয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি দেখছেন আমরা এই দায়িত্ব কতটা পালন করছি। আল্লাহ্ তাআলা গোটা মানব জাতিকে এই বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। তিনি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নেক কাজ ও আল্লাহ্ ভীতিই হচ্ছে মুক্তির সোপান, কপটতা ও অবান্তর ধারণা-বিশ্বাস নয়। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَا بَنِيْ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِيْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۔

হে আদম সন্তান! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে যদি এমন রসূল আসে, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনাবে—তখন যে কেউ নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের আচার-আচরণকে সংশোধন করে নেবে, তার জন্য কোন দুঃখ বা ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করবে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ গ্রহণ করবে, তারাই হবে দোযখী। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। —সূরা আরাফ ঃ ৩৫, ৩৬

চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যখন সত্যের সন্ধান পেল এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ঈমান আনার ঘোষণা দিল ঃ

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا .

হে আমাদের রব! আমরা এক আহবানকারীর ডাক শুনতে পেয়েছি যিনি ঈমানের দিকে আহবান করেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন। অতএব আমরা ঈমান এনেছি।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯২

এবং যখন তারা বিনয়ের সাথে দয়াময় রহমানের কাছে কাতর প্রার্থনা করল যে, তিনি যেন তাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন ঃ

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ .

হে আমাদের রব! আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও, খারাপ কাজগুলোকে বিলীন করে দাও এবং নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দান কর। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯২

এবং যখন তারা এই প্রার্থনা ও আবেগ সহকারে যমীনের বুকে বিজয় ও জাঁকজমক এবং আখিরাতের সাফল্য ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনা করল ঃ

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

হে আমাদের রব! আপনি আপনার রসুলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা আমাদের দান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপদস্থ করবেন না। —সূরা আলে -ইমরান ঃ ১৯৪

তখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে, তাদের দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে কেবল তাদের আমল, তাদের কর্মতৎপরতা। শুধু প্রার্থনায় তাঁর এখানে কোন লাভ হয় না। আশা-আকাঙ্ক্ষা তখনই পূর্ণ হয় যখন তাঁর রাস্তায় চেষ্টা সাধনা করা হয়, আত্মোৎসর্গ করা হয়, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা হয় এবং তাঁর পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয়।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .

উত্তরে তাদের রব বললেন, তোমাদের মধ্যে কারো কাজকে বিনষ্ট করে দেব না—সে পুরুষ হোক অথবা স্ত্রীলোক হোক। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী। অতএব যারা কেবলমাত্র আমার জন্য নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের বাড়িঘর থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে এবং আমার জন্যই লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে—তাদের সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব এবং তাদেরকে এমন বেহেশতে স্থান দেব যার নিচে দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯৫

ঈমান ও আমলের মধ্যে রয়েছে গভীর আন্ত-সম্পর্ক। একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না। এটা একটা চূড়ান্ত সত্য, এই সত্যের সপক্ষে এত অধিক প্রমাণ রয়েছে যে, তার হিসাব নেওয়া সম্ভব নয়। কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করলে বাস্তব সত্য সামনে এসে যায়, প্রতিটি মুসলমানের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত ভঙ্গীতে আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত নির্দেশ কানে বেজে উঠে ঃ

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

এই লোকদের বল, তোমরা কাজ করতে থাক। আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ সকলেই লক্ষ্য করবে যে, তারপর তোমাদের কর্মনীতি কিরূপ হয়। অতঃপর তোমাদেরকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমরা কি সব কাজ করছিলে। —সূরা তাওবা ঃ ১০৫

উম্মীদের কিতাব সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই

এমন কতগুলো হাদীস রয়েছে যা সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। তারা এর ভুল অর্থ গ্রহণ করে দীনের নির্ধারিত মূলনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। সর্বসাধারণের মধ্যে এ ধরনের হাদীসগুলোর চর্চাই অধিক হয়ে থাকে। যেমন

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীর ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর পেছন দিকে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বসা ছিলেন। নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ

يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا ـ قَالَ مَامِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ الاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ـ

হে মুআয! তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি আপনার কাছেই উপস্থিত (এভাবে তিনবার) তিনি বললেন, যে ব্যক্তিই আন্তরিক সততা সহকারে সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল'- আল্লাহ্ তাআলা তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন।

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا ؟ قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا وَاَخْبَرَ بِهِ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا ـ

মুআয (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি এ সম্পর্কে লোকদের অবহিত করব না, যাতে তারা আনন্দিত হতে পারে ? তিনি বললেন, তাহলে লোকেরা এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে। অতঃপর মুআয (রাঃ) ইলম গোপন করার অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যুর পূর্বে লোকদের তা অবহিত করেছেন। —বুখারী, মুসলিম

এ ধরনের আরো অনেক হাদীস আছে, যেগুলোকে হাতিয়ার বানিয়ে সাধারণ মুসলমানরা দীনের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে, ইসলামের স্তম্ভসমূহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং আমল ও তার ফলাফলের গুরুত্বকে হ্রাস করে দিয়েছে। অথচ এ জাতীয় হাদীসকে ভিত্তি করে এ ধরনের কথা বলা কোন ক্রমেই সঠিক নয়।

হাফেজ মুনযিরী (রঃ) বলেন, "উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, যেসব হাদীসে সাধারণভাবে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা দোযখের আগুন তার ওপর হারাম হয়ে যাবে—এগুলো ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের হাদীস, যখন শুধু

একত্ববাদের ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছিল। অতঃপর যখন ইসলামের ব্যাপক বিধিবিধান এসে গেল এবং যাবতীয় ব্যাপারে সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল, তখন এসব হাদীস মানসূখ হয়ে যায়। এর সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান রয়েছে। দাহ্হাক, যুহরী, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ মনীষীর এই মত।

অপর একদল মনীষীর মতে রহিত হওয়ার দাবি করার প্রয়োজন নেই। কেননা দীনের যতগুলো রুকন (স্তম্ভ) রয়েছে এবং ইসলামের যতগুলো আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে—তা সবই এই কলেমার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর আনুগত্য করা ছাড়া এই সাক্ষ্য পরিপূর্ণ হতে পারে না। অতএব কোন ব্যক্তি এই কলেমাকে স্বীকার করে নেওয়ার পর যদি একগুঁয়েমী, হঠকারিতা অথবা তাচ্ছিল্যের সাথে কোন ফরযকে উপেক্ষ করে, তাহলে সে আমাদের মতে কাফির হয়ে যাবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

মুনযিরী আরো কিছু বক্তব্য নকল করেছেন। কিন্তু এর সবগুলোর মূল কথা এই যে, এসব হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আর বাহ্যিক অর্থ কিভাবে লওয়া যেতে পারে—যেখানে এমন অসংখ্য আয়াত এবং হাদীস রয়েছে, যা ঈমানের জন্য কিছু আমলকেও বাধ্যতামূলক করে দেয়? বাস্তবিকপক্ষে কোন স্থানে যে কথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে—অন্যত্র তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ (مُشْرِكِى الْعَرَبِ) حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ ٠

فَاِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ٠

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন লোকদের (আরব মুশরিকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যাবত না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি তারা এসব কাজ করে, তাহলে তারা

আমার থেকে তাদের রক্ত (জীবন) ও ধন-সম্পদকে নিরাপদ করে নিল। কিন্তু ইসলামের হক তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র যিম্মায়। —বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসে কিছু আমলের কথাও উল্লেখ আছে, যা পূর্বোক্ত সাক্ষ্য সম্বলিত হাদীসে নেই। এই হাদীস আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীসমূহেরই ব্যাখ্যা ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ٠

অতএব এখন যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই। —সূরা তাওবা ঃ ১১

এই আয়াতের সামান্য আগেই আমাদের সামনে রয়েছে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ٠

অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাও। —সূরা তাওবা ঃ ৫

কলেমা শাহাদাত মূলত পরবর্তী পর্যায়ের আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যাবলীর ভূমিকা স্বরূপ অথবা এর অগ্রদূত। এমন নয় যে, একা কলেমা শাহাদাত যথেষ্ট এবং এরপর আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। দুর্বলচেতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন লোকেরা তাই ধারণা করে থাকে।

এই কলেমার শব্দগুলো মূলত এমন একটি গবাক্ষদ্বার যা মানুষকে বিরাট প্রশস্ত দুনিয়ায় পৌছে দেয়, যেখানে অন্তর নির্ভেজাল তৌহীদের নিগূঢ় রহস্যে বিহবল হয়ে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে তাকে নিজের স্রষ্টার সামনে অবনত মস্তক হতে হবে, তাঁর সন্তোষ লাভে সক্রিয় হতে হবে, তাঁর অসন্তোষে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হবে, নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ফরয কাজগুলো যথারীতি আদায় করতে হবে।

শিরকের আবর্জনা এমন কোন একটিমাত্র বাক্য নয় যে, তাতে শুধু মুখই মলিন ও অপবিত্র হয় আর তার পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ বলে দিলেই আবার মুখ পবিত্র হয়ে যায়। শিরকের তাৎপর্য এই যে, অন্তর গায়রুল্লাহ্র বাসস্থানে পরিণত হয়ে যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গায়রুল্লাহ্র অনুগত হয়ে যায়।

অতএব তৌহীদের বাণী যদি অন্তর ও মন-মগজে সংক্রমিত না হয়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যদি তার নেশা ছড়িয়ে না পড়ে এবং তা যদি মানুষকে সৎকাজ করার জন্য উত্তেজিত না করে, তাহলে এই ধরনের ঈমানের কি মূল্য আছে! কলেমা তৌহীদ হচ্ছে এমন একটি দুর্গ যার অভ্যন্তরে এসে গোটা মানবতা বাতিল প্রভুদের গোলামী থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই মাবুদ কেবল খোদাই করা পাথরগুলোই নয়, বরং এমন প্রতিটি জিনিস যা আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়, তাঁর সাথে আশা-নিরাশা, ভয়-ভীতি, সন্তোষ এবং তাকওয়া ও মহব্বতের সম্পর্ককে অটুট থাকতে দেয় না এবং এ হচ্ছে কুফরীর দরজা ও শিরকের দুঃখজনক পরিণতি।

আজ হাজার হাজার এমন মুসলমান রয়েছে—ইসলামের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা শয়তানের সাথী, আল্লাহ্‌র প্রতি বিমুখ, কুপ্রবৃত্তির পূজারী, ইবাদতের সাথে সম্পর্কহীন এবং তারা আল্লাহ্‌কে চরমভাবে ভুলে গেছে। তাদের আজকের মন-মানসিকতাকে জাহিলী যুগের মন-মানসিকতার সাথে তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যাবে না। জাহিলী সমাজ যে ঔদ্ধত্য, একগুঁয়েমি ও হঠকারিতায় পরিপূর্ণ ছিল, বর্তমানেও তাই চলছে। তারা কলেমা পড়ে কিন্তু এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম নয়, যদি বা বুঝে কিন্তু স্বীকার করে না।

মানবপ্রকৃতি তো তৌহীদের নূর পরিবেষ্টিত পরিবেশে বিচরণ করে। কিন্তু তার পা যখন শয়তানের ফাঁদে পড়ে যায়, যখন তার মধ্যে প্রবৃত্তির মালিন্য জমা হয়ে যায় এবং ব্যক্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, যখন সে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে নীচতার দিকে ঝুঁকে যায়—তখন সে পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায়। সে উন্নত পর্যায় থেকে পতিত হতে হতে অবনতির নিম্নতম স্তরে পৌছে যায়। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْتَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে, সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেল। অতঃপর তাকে হয় পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, অথবা বাতাস

তাকে নিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করবে, যেখানে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। —সূরা হজ্জ ঃ ৩১

কলেমা তৌহীদ কোন অনুর্বর যমীনে অংকুরিত হওয়ার মত প্রাণহীন বীজ নয়। তা অত্যন্ত সজীব এবং সম্ভাবনাময় চারাগাছ, যার শিকড় উর্বর অন্তরের গভীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ছায়াও প্রাণ শীতলকারী এবং এর ফলও সুস্বাদু। তা এমন কাজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে—ইসলাম যেসব কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছে, বারবার তাকিদ দিয়েছে এবং যেগুলোর আত্মপ্রকাশের ওপর নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল গণ্য করেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۔ تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۔

তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ তাআলা কোন জিনিসের সাথে কলেমা তাইয়্যেবার তুলনা করেছেন ? এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেন একটি ভাল জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ় নিবদ্ধ হয়ে আছে এবং এর শাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রতি মুহূর্তে তা তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফল দান করছে। এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তাআলা এজন্য দিচ্ছে যেন লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। —সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪, ২৫

এই কলেমা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতি উচ্চ ও উন্নত। এটা এমন কোন জিনিস নয় যে, কোন মুনাফিক অথবা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ইচ্ছা করলেই নিজের স্বার্থে তা ব্যবহার করতে পারে। যে ব্যক্তির আমলের কোন পুঁজি নেই—স্রেফ মৌখিক দাবির মাধ্যমে সে কি পেতে পারে ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۔

কতিপয় লোক বলে, আমরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের দিনের উপর ঈমান এনেছি, কিন্তু আসলে তারা মুমিন নয়। —সূরা বাকারা ঃ ৮

অতএব লোকদের কার্যাবলী যখন তাদের আভ্যন্তরীণ মালিন্যের অনুসন্ধান দেয়, যখন তারা প্রকাশ্যভাবেই দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, যখন আমরা তাদের এমন স্থানে উপস্থিত পাই না যেখান থেকে একজন মুমিন বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, আমরা তাদেরকে যখনই দেখতে পাই শয়তানের দোলনায় অথবা ইসলামের শত্রুদের সমাবেশে—তখন এই ধরনের ঈমানের দাবিদারদের প্রত্যাখ্যান করা আমাদের উপর ফরয। তারা নিজেদের ঈমানের সপক্ষে যতবারই শপথ করুক না কেন। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ۔ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ۔

> তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে, আমরা তো তোমাদের মধ্যেকারই লোক। অথচ তারা কখনো তোমাদের মধ্যেকার লোক নয়। আসলে তারা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত লোক। তারা যদি আশ্রয় নেবার মত কোন স্থান কিংবা কোন গুহা অথবা ঢুকে বসার মত জায়গা পায়, তাহলে তারা সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে।
>
> —সূরা তাওবা ঃ ৫৬, ৫৭

ইসলাম জীবনের প্রতিটি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পথনির্দেশ দান করেছে। তা আইন-কানুন অথবা আচার-ব্যবহার অথবা আখলাক চরিত্র হোক—প্রতিটি ব্যাপারেই তার পথনির্দেশ রয়েছে। অতএব মুমিনদের এখন একটি মাত্র ভূমিকাই হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তা হচ্ছে ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য এবং তার কাছে একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যদি এর পরিপন্থী হয় এবং জীবনের কার্যকলাপ যদি অন্তরের গোমরাহীর অনুসন্ধান দেয়—তাহলে ঈমানের প্রশ্নটা একটি অলীক ধারণা ছাড়া আর কি হতে পারে ? মহানবী (সঃ)-এর যুগে মুনাফিকদের চিহ্নিত করার এটাই ছিল মানদণ্ড। বর্তমানে যারা তাদের বন্ধু ও সহযোগী আমরা তাদের জন্যই এই মানদণ্ড ব্যবহার করব।

কোন এক শহরে দুটি কাপড়ের কারখানা রয়েছে। কারখানা দুটি সম্পর্কে আমি ভালভাবে অবগত। একটির পরিচালক বিদেশী এক ইংরেজ। সে সব সময়ই তৎপর থাকে—কখন জানি তার ওপর গোঁড়ামির অপবাদ এসে যায়। অতএব সে মুসলমানদের জুমুআর নামাযের ছুটি দেয়।

অপরটির পরিচালক এক বংশানুক্রমিক মুসলমান। সে তার মুসলমানিত্বের মিথ্যা দাবির ওপর আশ্বস্ত। সে মনে করে, তার ওপর এ ধরনের কোন অপবাদ লাগানো যাবে না। অতএব সে তার কর্মচারীদের নামাযের জন্য এতটুকু সময়ও বরাদ্দ করে না, যতটুকু সময় ঐ ইংরেজ পরিচালক বরাদ্দ করে থাকে।

তুমি যদি এই ধর্মবিরোধী অথবা ধর্মীয় অসচেতনতা সম্পর্কে তার সাথে আলাপ করতে চাও, তাহলে নামায ও নামাযীদের জন্য এটা মোটেই কল্যাণকর হবে না। বরং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলবে। এ ধরনের দুষ্ট প্রকৃতির লোক যাদের অন্তরে ইসলামের নির্দেশনাবলীর প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই, তাদেরকেও কি মুমিনদের কাতারে শামিল করা হবে ?

এসব লোকের অবস্থা এই যে, তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য থেকে ইসলামী আইনও নিরাপদ থাকতে পারেনি। তারা ইসলামী আইনের ওপর এবং এর পতাকাবাহীদের ওপর নিকৃষ্ট পন্থায় আঘাত হেনে থাকে। উম্মাতের আলেমদের ঐকমত্য অনুযায়ী এরা ইসলামের গণ্ডিতে থাকার উপযুক্ত নয়।

এখন প্রয়োজন হচ্ছে যাচাই-বাছাই করে ইসলামী উম্মাতকে পরিচ্ছন্ন করা, যাতে এর মধ্যকার যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা দূরীভূত হয়ে যায়, খড়কুটাগুলো চিহ্নিত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি মুসলমান তাকে মুসলমানই মনে করা হবে। আর যে ব্যক্তি কুফর ও ন্যাস্তিক্যবাদের শিকার তার অবস্থাটাও সামনে এসে যাবে।

বাস্তব কর্মক্ষেত্রে

এমন কতকগুলো হাদীস আছে যে সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরা ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। এগুলোর ওপর আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজন। তার সঠিক অর্থ তুলে ধরতে হবে। এসব হাদীস ক্ষমা, শাস্তি, অপরাধ এবং তওবার সাথে

সম্পর্কিত। আমরা আর কি করতে পারব, যদি উম্মাতের মধ্যে এমন সব উপাদানের প্রভাব পড়ে যায়, যারা মারাত্মক মারাত্মক অপরাধ করতেও দ্বিধাবোধ করে না, যারা উম্মাতকে শিক্ষা দেয় যে, ভুলভ্রান্তি ও অপরাধ করে বসা কোন দূষণীয় ব্যাপার নয়, যারা চিন্তাভাবনা না করেই কুরআন-হাদীসের দলিল পেশ করে এবং এমন রহমতের আশা নিয়ে বসে আছে যা পাবার জন্য কিছুই করা হয়নি ?

ইসলামী সভ্যতার মধ্যে এখান থেকেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে যখন কুরআন ও হাদীসকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সম্পাদিত কাজ হোক অথবা অন্তরের মধ্যে লুকায়িত আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণাই হোক—তার সাথে শরীআতের নির্দেশের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য তারা নিকৃষ্ট পন্থায় গোঁজামিল দিতে লাগল। একদিকে তাদের আকাঙ্খা হচ্ছে, নাস্তিকতা এবং অপরাধের জগতে তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে। অপরদিকে সালেহীন এবং সিদ্দিকীগণের জন্য যে মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে তাও আল্লাহ্‌র দরবারে তারাই পেয়ে যাক।

ইহুদী জাতিও এই ধরনের কলুষ মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছিল। কুরআন মজীদ কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার করেছে। একদিকে তারা সামান্য পার্থিব স্বার্থের জন্য জীবন দিয়ে দিত, এর সাময়িক চাকচিক্যের পেছনে ছুটে বেড়াত। অপরদিকে তারা আখিরাতের সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় বসে আছে। তাদের আকাশ-কুসুম কল্পনা—তাদের এই নিকৃষ্ট কাজে কখনো তাওরাতের বিরোধিতা হয় না এবং তারা মূসা আলায়হিস সালামের প্রদর্শিত পথেই স্থির আছে—এটাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত ভাষায় তাদের চিত্র তুলে ধরেছে ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰـى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُلَنَا وَاِنْ يَاْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۔ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيْثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لاَّ يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۔

কিন্তু তাদের পরে এমন সব অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার যাবতীয় স্বার্থ সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকে আর বলে ঃ 'আশা করা যায় আমাদের মাফ করে দেওয়া হবে।' সেই বৈষয়িক স্বার্থই যদি আবার তাদের সামনে এসে পড়ে তাহলে তখনি টপ করে তা হস্তগত করে। তাদের কাছ থেকে কিতাবের প্রতিশ্রুতি কি পূর্বে গ্রহণ করা হয়নি যে, আল্লাহ্‌র নামে তারা কেবল এমন কথাই বলবে যা সত্য ও যথার্থ ? আর কিতাবে যা কিছু লেখা হয়েছে তা তারা নিজেরাই পড়েছে। —সূরা আরাফ ঃ ১৬৯

পুনরায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে এ কথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, নেককার লোকেরাই কেবল সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হবে। তাদের প্রাপ্য কখনো নষ্ট হবে না। যেসব লোক আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর অবিচলভাবে কায়েম থাকে এবং যেসব ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা করে—আল্লাহ্‌র কাছে তারাই হচ্ছে নেককার লোক। কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে ঃ

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ . اَلَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لاَ نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ .

আখিরাতের বাসস্থান তো কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই কল্যাণকর হবে। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পার না ? যারা দৃঢ়ভাবে কিতাব ধারণ করে রেখেছে, নামায কায়েম করেছে—এই ধরনের নেক চরিত্রের লোকদের কর্মফল আমরা নিশ্চয়ই নষ্ট করব না।

—সূরা আরাফ ঃ ১৬৯—৭০

কিন্তু কুরআনের ধারক মুসলমানগণ আজ কোথায় কুরআনের ওপর কায়েম আছে ? আমাদের মুসলিম অঞ্চলসমূহে আজ হত্যাকাণ্ডের যতগুলো অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে—ফিনল্যাণ্ডে (ইউরোপ) পঞ্চাশ বছরেও এতগুলো হত্যাকাণ্ডের অপরাধ সংঘটিত হয়নি। অথচ সেখানকার অধিবাসীরা ইসলামের সাথেও পরিচিত নয় এবং অন্য কোন ধর্মের সাথেও পরিচিত নয়।

যদিও এসব খুনখারাবির অসংখ্য কারণ রয়েছে, কিন্তু তবুও এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ককে যখন

ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, মানুষের মনে যখন এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, অপরাধ শাস্তিকে অবধারিত করে না ; অসংখ্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হতে পারে ; নিষ্কর্মা লোকদের আশা-ভরসার হাদীস শুনানো হতে থাকল ; কঠোরতার স্থলে নম্রতা এবং তরবারির স্থলে আদর দেখিয়ে কাজ আদায় করার চেষ্টা চলল—তখন থেকেই ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির পতন শুরু হয়ে গেল। মুসলিম উম্মতের আলোকবর্তিকা নিভু নিভু করে জ্বলতে থাকল এবং অন্যান্য সভ্যতা সামনে অগ্রসর হয়ে উন্নতির প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল।

এখন যেসব হাদীসের তাৎপর্য অনুধাবন করতে গিয়ে সাধারণ লোকেরা ভুল করে থাকে তা উল্লেখ করার পূর্বে ডঃ আবদুল আযীয ইসমাঈলের কয়েকটি বাক্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরব। তিনি বলেন ঃ

"এক ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে কখনো মানসিক উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়ে। সে সম্পূর্ণরূপে বিবেকশূন্য হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থায় কাউকে হত্যা করে বসে। পুনরায় তার হুঁশ ফিরে আসলে—সে নিজের কৃতকর্মের জন্য চরমভাবে অনুতপ্ত হয়। অতএব এ এমন এক ব্যক্তি যে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে অপরাধ করেছে, অন্যথায় তার অন্তর এবং তার বিবেক এ অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচণ্ড উত্তেজনা অনেক সময় কোন কোন শক্ত গ্রন্থিতে অধিক পরিমাণে লালারস সৃষ্টি করে। এর ফলে রক্তের চাপ বেড়ে যায় এবং মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কখনো কখনো এই উত্তেজনা স্নায়ুতে আকস্মিক বিক্ষুব্ধ অবস্থার সৃষ্টি করে অথবা অনুভূতি শক্তিকে শোকার্ত করে তোলে। এরূপ অবস্থায় মানুষের দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হয় যেগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় সে চরমভাবে অপছন্দ করে।

এগুলো এমন অপরাধ যেখানে মানুষ তাকদীরের হাত অসহায় হয়ে যায়। আমরা যদি কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে এর রহস্যের মূল্যায়ন করাই তাহলে আখেরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ত এর জবাবদিহির সীমা কতকটা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। এই রকমের অপরাধ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণী নিম্নরূপ ঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ .

সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি ভুল না করতে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের তুলে নিতেন এবং তদস্থলে এমন এক জাতিকে নিয়ে আসতেন, যারা অপরাধ করতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করত। অতঃপর তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হত।

—মুসলিম-তওবা ; তিরমিযী, জান্নাত, দাওআত ; মুসনাদে আহ্মাদ- ১ম, ২য় ও ৫ম খণ্ড

এ হাদীসে গুনাহ্ ও অপরাধ করার জন্য সাধারণভাবে আহ্বান জানানো হয়নি। আর দুষ্কর্ম ও অপরাধে লিপ্ত থাকাও জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন।

لِيَبْلُوكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً .

যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিকে থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? —সূরা মূলক ঃ ২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَقْلاً وَّ اَوْرَعُ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَاَسْرَعُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ .

তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম জ্ঞানী, কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক আল্লাহ্ ভীরু এবং কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যে সর্বদা সক্রিয়।

যে মানসিক প্রতিক্রিয়া নিজের স্রোতে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এ হাদীস মূলত সেই প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর সংকল্পকে তাকদীরের প্রচণ্ড অন্ধকারে একাকার করে দেয় এবং তা সম্পূর্ণ ধূলার মত উড়ে যায়। পুনরায় যখন সে অন্ধকার সমুদ্র থেকে বের হয়ে আসে এবং তার মাথা এর প্রভাবে চক্কর দিতে থাকে—তখন তার জন্য 'যদি তোমরা ভুল না করতে—' বক্তব্যের মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ—যেমন একটি তৃষ্ণার্ত ঠোঁট এবং দগ্ধিভূত আত্মার কাছে পানীয় জলের মর্যাদা। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সান্ত্বনার বাণী যেরূপ শীতলতা এনে দেয়—এই হাদীসের মাধ্যমে মন-মস্তিষ্ক তদ্রূপ

শীতলতা অর্জন করে থাকে। পেশাদার দুষ্কৃতিকারী এবং কাপুরুষদের কর্মধারার সাথে এ হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। যৌবনের পদস্খলন এবং মানসিক দুর্বলতা ও পরাজয়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

মানবদেহে গ্রন্থিগুলোর উত্তেজনার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থি নিজ নিজ পদার্থ গরম রক্তের সাথে মিশিয়ে দেয়। মানুষ তা সংবরণ করতে না পারলে হোঁচট খেয়ে যায়। খুব সম্ভব আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা এই যে, সৃষ্টির সেরা মানুষ দোজাহানের রাজাধিরাজের সামনে অসহায় গোলামের মত বসবাস করুক। সে তার কার্যকলাপ এবং আনুগত্যের অহংকারে ফেটে পড়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার গৌরব ও মর্যাদা এবং তাঁর সাহায্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুক। যেসব লোক অসম শক্তি এবং অপরিসীম যোগ্যতার অধিকারী, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে, তারা গুনাহের আবর্তে হোঁচট খেয়ে পড়বে না—তারাই সাধারণত নিজেদের মধ্যে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

এই বক্তব্যের আলোকে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি ঃ

كُتِبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهٗ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَامَحَالَةَ . اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهٗ .

আদম সন্তানের জন্য যেনার অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যম্ভাবীরূপে সে তা পাবেই। দর্শন হচ্ছে চোখের যেনা, শ্রবণ হচ্ছে কানের যেনা, কথাবার্তা বলা হচ্ছে মুখের যেনা, স্পর্শ করা হচ্ছে হাতের যেনা, পায়ের যেনা হচ্ছে এ উদ্দেশ্য হেঁটে যাওয়া, অন্তর তাতে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করে এবং লজ্জাস্থান এই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে দেয় অথবা তা ব্যর্থ করে দেয়। —বুখারী, মুসলিম

এই যে জিনিস নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এগুলোই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বহির্ভূত মানসিক উত্তেজনার কদর্য রূপ। মানুষের শক্তি ও ক্ষমতাবহির্ভূত অবস্থার সাথেই আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও উদারতার সম্পর্ক রয়েছে। একজন যুবকের দায়িত্ব হচ্ছে, সে অপরাধ ও দুষ্কর্ম থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, ধোঁকা ও প্রতারণা ক্ষেত্রে তার অন্তর ধৈর্য ধারণ করবে, স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে যতই উত্তেজনা আসুক, সে আত্মনিয়ন্ত্রণ করবে।

কিন্তু কখনো কখনো এই চাপ চরম আকার ধারণ করে, এতই চরম যে, তার মুকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশেষে মুমিন ব্যক্তির পদস্খলন ঘটে এবং সে নিজ ভূমিকায় অবিচল থাকতে পারে না। যেমন সমুদ্রে পতিত একজন সাঁতারু উত্তাল তরংগের মধ্যে হাত-পা মারতে থাকে, সে সামনে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে, নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তীরে পৌছে যাওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে হঠাৎ সে অনুভব করতে পারে যে, তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের স্রোত অত্যন্ত তীব্র, এর মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। যখন সে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় তখন যতই শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন নিজের স্থান থেকে এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারে না।

কর্মময় জীবনেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে—যখন এ ধরনের হাদীস আমাদের সামনে আসে, গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার অবাধ অনুমতি দেয়ার জন্য নয়, বরং গুনাহ্ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য, এর মলিনতা থেকে পাক করার জন্য। এ সময় মানুষকে ইতিবাচক ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট করা হয়। কেননা নেতিবাচক ইবাদতে যে পরাজয় হয়েছে তার চিকিৎসা ইতিবাচক ইবাদতের মধ্যেই রয়েছে। নিম্নের আয়াত থেকেও এই সত্য প্রতিভাত হয় ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ٠

তোমরা নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে এবং কিছুটা রাত হওয়ার পর। ন্যায় কাজসমূহ অন্যায় কাজসমূহকে দূর করে দেয়। যেসব লোক আল্লাহ্কে স্মরণ করতে অভ্যস্ত—এটা তাদের জন্য একটি স্মারক বিশেষ। —সূরা হূদ ঃ ১১৪

শয়তান যদি কল্যাণকর কাজের দরজা একদিক থেকে বন্ধ করে দিতে চায় তাহলে অন্যদিক থেকে তা খুলে দেয়া হয়। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ٠

এবং ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ্ সৎ কর্মশীল লোকদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করেন না। —সূরা হুদ ঃ ১১৫

বাস্তবিকপক্ষে অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা আসে নেক কাজগুলো কেবল তার নিরাময়ই নয়, বরং এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করা এবং এর মলিনতা থেকে পাক হওয়ার ব্যাপারে সফলকাম হওয়া যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে তা যতই কঠিন মনে হোক না কেন এটাই হচ্ছে ঈমানের পরিচয়। অবশ্য যদি কোন লোক গর্হিত কাজে ডুবে থাকে, নেক কাজ থেকে দূরে থাকে, আবার মুসলমান হওয়ার দাবিও করে তবে তার এ দাবি চূড়ান্তভাবেই মিথ্যা। পূর্বোক্ত হাদীসে এমন কোন জিনিস নেই যার থেকে তার ঈমানের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যেতে পারে।

জাহিল মূর্খ লোকেরা আরো একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকে এবং তার ভিত্তিতে বলে যে, আমলের কোন গুরুত্ব নেই। হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ لاَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلاَنٍ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ ذَالَّذِيْ يَتَاَلّٰى عَلَىَّ اَنْ لاَّ اَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ٠

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ কোন ব্যক্তি আমার নামে শপথ করে বলছে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করব না ? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার যাবতীয় আমল বিনষ্ট করে দিলাম। —মুসলিম

এটি সহীহ্ হাদীস। সুনানে আবু দাউদেও এই ধরনের হাদীস এসেছে। তার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ مَعَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ رَجُلاَنِ مُتَوَاخِيَانِ اَحَدُهُمَا مُذْنِبٌ وَّالْاٰخَرُ فِي الْعِبَادَةِ مُجْتَهِدٌ فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لاَ يَزَالُ يَلْقَى الْاٰخَرَ عَلٰى ذَنْبٍ فَيَقُوْلُ لَهُ : اَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِيْ وَرَبِّيْ اَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيْبًا ؟ فَقَالَ لَهُ وَاللّٰهِ لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ اَوْقَالَ لاَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَقَبَضَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالٰى لِلْمُجْتَهِدِ اَكُنْتَ عَلٰى مَا فِيْ يَدِيْ قَدِيْرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ اِذْهَبُوْا بِهِ اِلَى النَّارِ ۔

রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বনী ইসরাঈল বংশের দুই ব্যক্তি ছিল। তারা পরস্পরের ভাই হত। তাদের একজন ছিল পাপী এবং অপর জন্য ছিল সৎলোক। পাপী ব্যক্তি যখনই কোন খারাপ কাজ করত, সৎ লোকটি তাকে বলত, এ কাজ পরিত্যাগ কর। পাপী লোকটি বলত, আমাকে আমার প্রভুর উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হয়েছে ? তখন নেককার লোকটি তাকে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তোমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। অথবা সে বলল, তিনি কখনো তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের উভয়কে মৃত্যু দান করলেন এবং তারা আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হয়ে গেল। আল্লাহ্ ইবাদতে মশগুল লোকটিকে বললেন, আমার হাতে যা রয়েছে তার উপর তোমার কর্তৃত্ব চলে কি ? অতঃপর তিনি অপরাধীকে বললেন, চলে যাও এবং আমার অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ কর। তিনি অপর ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, তোমরা একে নিয়ে দোযখে চলে যাও।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের সামনেও এ হাদীস এসেছে। এ হাদীসের ঠিক যে অর্থ হতে পারে তাঁরা তাই বুঝেছেন। তাঁরা হাদীসের অর্থ এই বুঝেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের আনুগত্য ও ইবাদত নিয়ে গর্ভ-অহংকারে লিপ্ত হয়, সে অনুতপ্ত পাপীর তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট। আর এটাই হল সঠিক কথা। ধর্মীয় বেশভূষা ধারণকারী একদল লোক আছে যারা কিছু নামায-কালাম পড়ে মনে করে—তারা বান্দার ভাগ্য বন্টনে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রভাব বিস্তার করে আছে। সবার ভবিষ্যৎ তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। বেহেশত- দোযখের চাবি তাদের হাতে এসে গেছে। আমি ধর্মীয় পরিমণ্ডলে অনেক জুব্বা সর্বস্ব ব্যক্তিকে দেখেছি যারা এই আকাশ-কুসুম কল্পনায় ডুবে আছে। এরা আন্তরিক নম্রতা, বিনয় ও ইখলাসের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত।

যেসব লোক বাড়াবাড়ির পরিণতি ভয়ংকর হবে বলে পাপীদের ভয় দেখায়—এ হাদীস তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, এটা সংশোধনের উপযুক্ত পন্থা নয়। তোমরা খৃস্টানদের প্রতি লক্ষ্য কর। কোন ব্যক্তি অপরাধ করে ভগ্ন হৃদয়ে গির্জায় গিয়ে উপস্থিত হয়। পোপ তাদের এখানে প্রচলিত পন্থায় তাকে তওবা করায়। তুমি যদি কোনভাবে তাদের অন্তরে ঢুকে যেতে পার তাহলে তুমি দেখতে পাবে, এই পাপীর অন্তর এবং মানসিকতাও এমন স্তরে পৌঁছে যেতে পারে যা পোপের স্থানের চেয়ে অতি উচ্চে।

এ সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমাদের কোন কোন ধর্মীয় নেতার এখানে পাষাণ হৃদয় ও কর্কশ ব্যবহারের এমন দৃশ্য দেখা যায়—যার কারণে আমি সেখান থেকে দৌড়ে পালাই। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোকও পাওয়া যায়, দীনের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, ইসলামের সৌন্দর্য ও কল্যাণ সম্পর্কে যাদের কোন ধারণা নেই কিন্তু তারা অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও অমায়িক যে, মুহূর্তের মধ্যে মন জয় করে ফেলে। সে যাই হোক, এ হাদীস থেকে নিম্নোক্ত আয়াতের পরিপন্থী অর্থ কোনক্রমেই গ্রহণ করা সম্ভব নয় ঃ

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۔ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۔ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۔ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۔

اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۔ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۔ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۔

নিশ্চিতই আল্লাহ্ভীরু লোকদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত রয়েছে। আমরা কি অনুগত লোকদের অবস্থা অপরাধী লোকদের মত করব ? তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি রকমের কথাবার্তা বলছ ? তোমাদের কাছে এমন কোন কিতাব আছে, যার মধ্যে তোমরা পড় যে, নিশ্চয়ই সেখানে তোমাদের জন্য সেই সব জিনিসই রয়েছে যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর? অথবা তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এমন কিছু প্রতিশ্রুতি আমাদের উপর অবশ্যই পালনীয় হয়ে আছে যে, তোমরা যা বলছ তোমাদের সেসব কিছুই দেওয়া হবে ? এদের জিজ্ঞেস কর, তোমাদের মধ্যে কে এর জন্য দায়িত্বশীল ? —সূরা কালাম ঃ ৩৪-৪০

যেসব নির্বোধ জাহিল কুরআন ও হাদীসকে খেলার বস্তুতে পরিণত করেছে, আমরা তাদের জিজ্ঞেস করি ঃ যদি তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে এবং কুরআন ও হাদীস বুঝবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে থাকে, তাহলে কোন্ সাহসে তারা ঈমান ও আমলের আন্ত-সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করছে এবং অপরাধের শাস্তি অবধারিত নয় বলে দাবি করছে ?

৬

গুনাহ্ ও তওবা

ঈমান ও অপরাধ

আমাদের আকীদা এই যে, ঈমান ও আমলের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ঈমানের অর্থ হচ্ছে নিষ্পাপ বা মাসূম থাকা। অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা ঈমানের তাৎপর্য নয়। কেননা মুমিন ব্যক্তিও ভুল করে বসতে পারে। কিন্তু মুমিন ব্যক্তির পদস্খলন তাকে দীনের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার করে দেয় না। এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার, যাতে এর সবগুলো দিক সামনে এসে যায়।

কোন ব্যক্তি যখন মজবুত ঈমানের অধিকারী হয়, যখন সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সদা সক্রিয় থাকে এবং যখন সে আল্লাহ্‌কে অধিক মাত্রায় স্মরণ করে তখন তার দ্বারা গুনাহের কাজ খুব কমই সংঘটিত হয়। কখনো যদি সে হোঁচট খেয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে এটা তার স্বাভাবিক জীবনের ব্যতিক্রমী ঘটনা। যেমন কোন মূলনীতির ব্যতিক্রম ঘটনাও কখনো কখনো ঘটে থাকে। এরূপ ব্যক্তির ভুলের যে মেজাজ-প্রকৃতি হয়ে থাকে, তা তার ভুলকে একটা ভিন্নতর স্বরূপ দান করে। সে ইচ্ছাপূর্বক এই খারাপ কাজ করে না, এ থেকে সে নিরাপদও থাকতে পারে না এবং এর উপর সে অনুক্ষণ স্থিরও থাকে না।

তার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, কোন পথিক তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলছে, সে তার প্রয়োজন বা কাজের চিন্তায় ডুবে গেছে, হঠাৎ তার পা কোন খাদে পড়ে গেল। সে দ্রুত এই খাদ থেকে উঠে আসে। এভাবে পড়ে যাওয়ার জন্য সে নীরবে লজ্জিত হয় এবং ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

তদ্রূপ একজন মুমিনের অবস্থা। সে দ্রুত পদক্ষেপে নিজের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসে। হঠাৎ তার পা ফসকে যায় এবং সে এমন এক কাজ করে বসে

যা তার জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। কিন্তু সে পংকিলতার এই গর্তে পতিত হওয়ার সাথে সাথেই বের হয়ে চলে আসে এবং এ সময় অনুশোচনায় তার চেহারা মলিন হয়ে যায়। তার অন্তরে দুঃখ- বেদনার তুফান সৃষ্টি হয়ে যায়।

এই ধরনের ভুলভ্রান্তি মুমিনের চরিত্রকে কলংকিত করতে পারে না। তার ব্যক্তিত্বকেও পর্যুদস্ত করতে পারে না। পর্যুদস্ত হওয়ার প্রশ্নই বা কেন ? তাজী ঘোড়াও কখনো হোঁচট খেয়ে যায়, বীর সৈনিকের তরবারিও কখনো হাত থেকে সিটকে পড়ে যায়।

মানুষ দুই ধরনের উপাদানের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। একটি উপাদানের সম্পর্ক রয়েছে উর্ধ্ব জগতের সাথে এবং অপরটির সম্পর্ক রয়েছে মাটির সাথে। অতএব মানুষের কর্মতৎপরতার আয়নায় এই উভয়বিধ উপাদানের প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিগোচর হয়। তার স্বভাব-প্রকৃতির বিচারে এটা কোন তাজ্জবের ব্যাপার নয় যে, সে কখনো হীন কাজের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। এজন্য আল্লাহ্তাআলা এ ধরনের যাবতীয় অপরাধ নিজের ক্ষমার আঁচলে লুকিয়ে নেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ٠

যেসব লোক বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে—তবে কিছু অপরাধ তাদের দ্বারা ঘটে যায়। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা যে ব্যাপক ও বিশাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। —সূরা নাজম ঃ ৩২

তাঁর এই উদারতাপূর্ণ ক্ষমার কারণ এই যে ঃ

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ٠

তিনি তোমাদের সেই সময় থেকে খুব ভালভাবেই জানেন যখন তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর যখন তোমরা তোমাদের মায়েদের গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে। —সূরা নাজ ঃ ৩২

কবি বলেন ঃ

মানুষের প্রকৃতিই তাকে ঝুঁকিয়ে দেয়
একবার
গলিত আঠালো মাটির দিকে।

আমরা পূর্বেও বলে এসেছি মুমিন লোকদের এ ধরনের পদস্খলন হতে পারে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় অবিচল থেকে যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর থাকে এবং নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চিন্তামগ্ন থাকে। এরই ফাঁকে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাদের পা ফসকে যেতে পারে। এই পদস্খলন তাদের অজান্তে হয়ে যায়। এ সময় সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, দুঃখ- বেদনায় হৃদয় ভরে যায়। তার এই অবস্থা পদস্খলনের দাগকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিতে থাকে এবং এর পরিণতিকে খুবই হাল্কা করে দেয়।

এটাও তার জন্য কম শাস্তি নয় যে, এই পদস্খলন সব সময় তার অন্তরে করাঘাত করতে থাকে এবং সে বিনীতভাবে নিজের প্রতিপালকের পদতলে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ. لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ . لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَءَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

আর যে ব্যক্তি পরম সত্য নিয়ে এলো, আর যেসব লোক তা সত্য বলে মেনে নিল—তারাই মুত্তাকী। তাদের মনে যেসব ইচ্ছা জাগবে তা সবই তারা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে পাবে। নেক কাজ সম্পাদনকারীদের জন্য এটাই প্রতিদান। তারা যে নিকৃষ্টতম কাজ করেছিল তা যেন তাদের হিসাব থেকে আল্লাহ্তাআলা খারিজ করে দেন এবং যে উত্তম কাজ তারা করেছিল সেই অনুপাতে তিনি তাদের প্রতিফল দান করতে পারেন। —সূরা যুমার ঃ ৩৩-৩৫

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ·

আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের দোষগুলি আমরা তাদের থেকে দূর করে দেব এবং তাদেরকে উত্তম কাজের প্রতিফল দান করব। —সূরা আনকাবুত ঃ ৭

মনস্তত্ত্ববিদগণ এই সাময়িক পদস্খলনের উপর অধিক সময় অবস্থান করা ঠিক মনে করেন না। তাদের দৃষ্টিতে পতনোন্মুখ ব্যক্তির হাত টেনে ধরতে হবে, যাতে সে তাড়াতাড়ি উঠে আবার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে পারে। সে পূর্বের মতো অথবা তার চেয়েও অধিক আনন্দ সহকারে পুনর্বার নিজের কর্তব্যকর্মে লেগে যাবে। সংঘটিত এই ভুলভ্রান্তিকে যদি তারা গুরুত্ব না দিয়ে থাকে তাহলে এর কারণ এই নয় যে, তা তাদের কাছে পছন্দনীয়। বরং তারা ভুলের শিকার ব্যক্তিকে এর কু-প্রভাব থেকে বাঁচাতে চান, তাকে দ্রুত গর্ত থেকে তুলে নিতে চান। তারা তাকে পথ হারিয়ে সর্বস্বান্ত হতে দিতে চান না। নবী স্বাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণীর স্বরূপও তাই। তিনি বলেন ঃ

اَذْنَبَ عَبْدٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ · فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِالذَّنْبِ · ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ فَقَالَ يَارَبِّ اغْفِرْلِيْ · فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَذْنَبَ عَبْدِيْ فَعَلِمَ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ فَقَالَ يَارَبِّ اغْفِرْلِيْ · فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَذْنَبَ عَبْدِيْ فَعَلِمَ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِالذَّنْبِ اِعْمَلْ مَاشِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ·

এক ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে বসল। সে বলল, হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তখন মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা

একটি অপরাধ করেছে। সে জানতে পেরেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমাও করতে পারেন এবং এজন্য জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেন। সে পুনরায় একটি গুনাহ্ করে বসল। অতঃপর বলল, হে প্রভু! আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ্তাআলা বলেন, আমরা বান্দা একটি অপরাধ করে ফেলেছে এবং সে জানতে পেরেছে যে, তার একজন প্রভূ আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমাও করতে পারেন এবং এ জন্য জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেন। সে পুনরায় অপরাধ করে ফেলল। অতঃপর বলল, হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্তাআলা বলেন, আমার বান্দা অপরাধ করে বসেছে এবং সে জানতে পেরেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমাও করতে পারেন এবং এজন্য জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেন। অতপর তুমি যা চাও করতে পার, আমার ক্ষমার দরজা তোমার জন্য খোলা রয়েছে।
—বুখারী, মুসনাদে আহমাদ

এ হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীস বলছে যে, যতই গুনাহ্ করা হোক— না কেন, তওবার দরজা সব সময়ই খোলা থাকে। তা সেই লোকদের জন্যই—যাদের উল্লেখ আমরা এইমাত্র করেছি। নেক কাজের প্রসার ঘটানো এবং এজন্য উৎসাহিত করাই এর উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তির যদি পদস্খলন হয়ে যায়, তাহলে তাকে দ্রুত তা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। শয়তান যখনই কারো দৃষ্টিকে নিচের দিকে নিবদ্ধ করাবে—তখনই সাথে সাথে তাকে উচ্চতার দিকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

এসব হাদীসের উদ্দেশ্য কখনো তা নয়—যা নির্বোধ লোকেরা নির্ধারণ করেছে। তাদের মতে পদস্খলনকে কোন গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই। অপরাধীদের ইসলামের নির্দেশসমূহের পরিপন্থী কাজ করার অবাধ অধিকার থাকবে, যেন তারা হারাম কাজে নিজেদের জড়াতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী। এই দৃষ্টিভঙ্গী নবুয়াতের ভিত্তিকেই ধ্বসিয়ে দেয়—যাঁরা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। যে অসংখ্য হাদীস খারাপ কাজের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করছে—উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গী তার প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ খুলে

দেয় এবং এসব হাদীস সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাকে তুলে ধরে। এসব হাদীসের ভ্রান্ত অর্থ গ্রহণ করা, অতঃপর ভাল কাজে শিথিলতা প্রদর্শন করা মানুষের একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ। সব অপরাধের ধরন একরকম নয় এবং সব অপরাধীও একই মানসিকতা সম্পন্ন নয়।

অজ্ঞতা, অলসতা ও বোকামীর বিভিন্ন ধরন হতে পারে, যা মানুষকে অপরাধে অভ্যস্ত করে দেয়। অতঃপর সে খুব তাড়াতাড়ি তা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। তা সত্ত্বেও তার অন্তরে ঈমান কঠিন আকর্ষণ-বিকর্ষণ সৃষ্টি করে। তা অবশিষ্ট থাকা বা না থাকা অপরাধীর অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সে আল্লাহ্ থেকে কতটা দূরে সরে পড়েছে এবং গুনাহের কতটা নিকবর্তী হয়ে পড়েছে—এটাই তার ফয়সালা করে দেয়।

সে যাই হোক, কোন মুসলমান অপরাধ করে ফেললে সে দ্রুত তওবা করে পাকসাফ হয়ে যায়, অথবা তাকে তওবা ও অনুশোচনার অনুভূতি দংশন করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতে সে ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে।

যেসব লোক পাপকাজে লিপ্ত থাকে এবং অনুশোচনার অনুভূতি ও শাস্তির আশংকা মনে থাকা সত্ত্বেও অবিলম্বে তওবা করে না—তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না যে, ভবিষ্যতে তাদের পরিণতি কি হবে। কেননা ভ্রান্ত কাজের অবিরত আক্রমণ ঈমানকে পরাভূত করে দেয়। তা একজন মুসলমানকে কুফরীর বাহুবন্ধনে নিয়ে যায়। যেমন কোন দুরারোগ্য ব্যাধি যদি কাউকে আক্রমণ করে বসে, তাহলে তা ঘুণে পোকার মত তার সমস্ত শরীর জর্জরিত করে ফেলে এবং একটি সজীব ও স্বাস্থ্যবান মানুষকে অন্তসারশূন্য করে দেয়।

সে যাই হোক, ঈমানের সাথে গুনাহের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। আমরা একথা বলতে পারি যে, অপরাধ করা সত্ত্বেও ঈমান অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি পাপ কাজ করে গর্ববোধ করে এবং ফরযসমূহকে উপহাস করে—তাহলে ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না এবং সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে। এটা এমন একটা জঘন্য মনোভাব যা কোন মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে কল্পনা করা যায় না।

এটা অসম্ভব নয় যে, কোন মুমিন ব্যক্তি কোন ভাল কাজে কিছুটা অলস হতে পারে, কিন্তু তার পক্ষে খারাপ কাজের অগ্রসর হওয়া এবং প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র

নাফরমানী করার কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর কালামে পাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, মুমিন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আবেগ, দুর্বলতা, নিরুৎসাহ অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় সে পাপ কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰـئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۔

যেসব লোক অজ্ঞতাবশত ঃ কোন অন্যায় কাজ করে বসে, অতঃপর অবিলম্বে তওবা করে—কেবল তাদের তওবাই আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা এদের তওবাই গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং মহাজ্ঞানী। কিন্তু যেসব লোক অব্যাহতভাবে পাপ কাজ করতে থাকে তাদের জন্য তওবার কোন অবকাশ নেই। এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন বলে, এখন আমি তওবা করলাম। অনুরূপভাবে যেসব লোক মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকে তাদের জন্যও তওবার কোন সুযোগ নেই।

—সূরা নিসা ঃ ১৭, ১৮

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۔

তোমাদের প্রতিপালক দয়া-অনুগ্রহ করাটা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত কোন অন্যায়

কাজ করে বসে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন হয়—তাহলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন এবং নরম ব্যবহার করেন। এভাবেই আমরা আয়াতসমূহ্ সুস্পষ্ট করে পেশ করি, যেন অপরাধীদের পথ সুপ্রকট হয়ে উঠে। —সূরা আনআম ঃ ৫৪, ৫৫

ঈমানের সাথে আনুগত্য ও অন্যায় কাজের যে সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমটি হচ্ছে ঈমানের খাদ্য যার দ্বারা সে ফলে-ফুলে সুশোভিত হয় এবং পরিপুষ্ট থাকে। আর দ্বিতীয়টি যেন গরম বাতাস—লু হাওয়া যার ফলে ঈমান দুর্বল ও কৃশ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি করে তাকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। জিহাদের বিভিন্ন স্তরে তার পরীক্ষা চলে। সন্দেহ-সংশয়ের অন্ধকারের সাথে মোকাবেলা করতে হয়। জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবিচলতার পরিচয় দিতে হয়। নীতির প্রশ্নে আপোসহীনতার প্রমাণ দিতে হয় ইত্যাদি। এই পরীক্ষা থেকে তার পলায়ন করার কোন উপায় নেই। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে অতিক্রম করতেই হবে। এরপর তার সফলতা বা ব্যর্থতার ফয়সালা হবে।

মানুষকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে—তা সম্ভব নয়। এটা হতেই পারে না যে, কোন ব্যক্তি ঈমানের মিথ্যা দাবি করবে আর তার কুফরী গোপন থেকে যাবে। কোন ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ধোঁকা দিয়ে পার পেয়ে যাবে তা মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন তা মূলত এই পরীক্ষারই অগ্রবাহিনী। এসব পরীক্ষা স্বভাব-প্রকৃতিকে নিংড়াতে থাকে এবং তার যাবতীয় ভাল ও মন্দ কাজ প্রকাশ করে দেয়। এই পরীক্ষা অনবরত ঈমানের গভীরতা ও মজবুতীকে পরখ করতে থাকে ; ঈমানদার ব্যক্তি কি বেহেশতের অধিকারী না দোযখের উপযোগী, না উভয়টির—তা নির্ণয় করে দেয়। এভাবে মানুষ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে তার প্রতিপালকের দরবারে পৌঁছে যায়।

الٓمّٓ ۔ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ ۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۔

> আলিফ-লাম মীম। লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে,"আমরা ঈমান এনেছি" এটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমরা এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ্কে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। যেসব লোক খারাপ কাজ করছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে ? তারা অত্যন্ত খারাপ ফয়সালাই করছে। —সূরা আনকাবূত ঃ ১-৪

মানুষের পরিণতি কি হবে তার সিদ্ধান্ত একটি মাত্র অপরাধ অথবা একটি মাত্র আনুগত্যমূলক কাজের ভিত্তিতে নেওয়া যেতে পারে না। কেননা সময় দীর্ঘ, দায়িত্ব অনেক, কাজ বিভিন্নমুখী। অতএব এ সম্পর্কে সাধারণভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে না। হাদীসে এসেছে ঃ

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَعَرْضِ الْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَاَيُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ۔ وَاَيُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَعُوْدَ الْقُلُوْبُ عَلٰى قَلْبَيْنِ قَلْبٍ اَسْوَدَ مُرْبَادًا كَالْكُوْزِ مُجْخِيًا (مَكْبُوْبًا) لَايَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَّلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ۔ وَ قَلْبٍ اَبْيَضَ فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۔

মানুষের অন্তরের উপর ফিতনাসমূহ এমনভাবে জমে যায়, যেভাবে একটি চাটাইয়ের মধ্যে একটি একটি করে পাতা জমা হয়। যে অন্তরের মধ্যে ফিতনা ঢুকে পড়ে তার উপর একটি করে কালো দাগ পড়তে থাকে। আর যে অন্তর তা খারাপ জানে তার মধ্যে একটি করে সাদা দাগ পড়ে যায়। এভাবে অন্তরগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হচ্ছে কালো দাগ ও ময়লাযুক্ত অন্তর। তা উপুড় করা পেয়ালার মত। তার কোন ভাল কাজের প্রতি আকর্ষণ থাকে না এবং খারাপ কাজকে খারাপ জানে না। তা নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসারী। আরেক অন্তর হচ্ছে উজ্জ্বল ধবধবে। আসমান-যমীন যতদিন কায়েম থাকবে, এই ফিতনা এই অন্তরের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, গুনাহসমূহের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। প্রতিটি পর্যায় তার পরবর্তী পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দেয়। অনন্তর অন্তরের মধ্যে যে বিভিন্ন অবস্থা ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে তাতে ঈমানও প্রভাবিত হয়। এমন কতগুলো অন্তর আছে যার উপর অনবরত পাপ কাজের আক্রমণ চলতে থাকে। ফলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার এমন কতগুলো অন্তর রয়েছে যা ধ্বংসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তা যদিও এখনও ঈমানকে ধ্বংস করতে পারেনি কিন্তু গোমরাহীর গর্তের কিনারে পৌছে গেছে। আবার এমন কতগুলো অন্তর আছে যা ভাল ও মন্দের মাঝখানে নড়বড়ে অবস্থায় থাকে, একবার ডানদিকে ঝুঁকে যায় আর একবার বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে।

কলবের উপর দুষ্কর্মের যে বিন্দু বিন্দু কালিমা জমতে থাকে—হাদীসে তাকে চাটাইয়ের পাতার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা একটি একটি করে বুননের শৃঙ্খলে এসে যোগ হতে থাকে। হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, দুষ্কর্মে আক্রান্ত কলবগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে।

এক, কলব তো তাকেই বলে যা ফিতনার (দুষ্কর্ম) সম্মুখীন হতেই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তা ফিতনাকে এমনভাবে শোষণ করে নেয় যেমন তুলা পানিকে শুষে নেয় এবং এর উপর কালো তিলক চিহ্ন পড়ে যায়। সে আগত যেকোন

দুষ্কর্মকে স্বাগত জানায়। শেষ পর্যন্ত তা কালো হয়ে পেয়ালার মত উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। অন্তর যখন কালো হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন তা দুটি ধ্বংসাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, যা থেকে তা আর কখনো আরোগ্য লাভ করতে পারে না। প্রথমত সে ন্যায়-অন্যায় এবং ভালমন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। কোন ভাল কাজের প্রতি এর আকর্ষণ্ন থাকে না এবং কোন খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা বোধও থাকে না। অনেক সময় এই রোগ এতটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌছে যায় যে, ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায়, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে।

দুই, শরীআতের ব্যাপারে সে নিজের প্রবৃত্তিকে কর্তা বানিয়ে নেয়। প্রবৃত্তি তাকে যেখানে নিয়ে যায়, সে তার পিছে পিছে দৌড়াতে থাকে।

কিন্তু পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ অন্তরে ঈমানের নূর চমকাতে থাকে। যদি সে কখনো বা দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ে তাহলে ঘৃণাভরে তার উপর পদাঘাত করে। এভাবে তার ঈমানের নূর আরও বেড়ে যায়। ফিতনা-বিপর্যয় এবং দুষ্কর্মের কোলাহলে ঈমানের অবস্থা কি হতে পারে সে প্রসঙ্গেও নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখযোগ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَاَ خَطِئَةً نُكِتَتْ فِىْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهٗ وَاِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوْ قَلْبَهٗ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ . ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

বান্দাহ্ যখন কোন গুনাহ্ করে বসে তখন তার কলবের উপর একটি কাল দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে তা পরিত্যাগ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে তখন তার কলব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যদি সে অপরাধের পর

অপরাধ করতেই থাকে তাহলে তার অন্তরের কালো দাগও বেড়ে যেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে 'মরিচা' যা আল্লাহ্ পাক তাঁর কুরআন মজীদে উল্লেখ করছেন ঃ

> "কক্ষণও নয়, বরং এই লোকদের কলবের উপর তাদের পাপ কাজের মরিচা জমে গেছে। কক্ষণও নয় নিঃসন্দেহে এই লোকদের সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। অতঃপর তারা দোযখে নিপতিত হবে। —সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ১৪-১৬

ইমাম তিরমিযী (রহ) এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ্ বলেছেন।

তওবা এবং নিষ্কলংকতা

বাস্তবিকপক্ষে মানুষ বড়ই অপরাধী। অপরাধ করাটা যেন তার মজ্জাগত ব্যাপার। অপরাধপ্রবণতা তার মধ্যে এমনভাবে সক্রিয় যেমন শিরা-উপশিরায় রক্তের প্রবাহ সদা-সক্রিয়। এজন্য কাউকে একেবারে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হতে হবে এমন দাবি করা যায় না। আল্লাহ্ তাআলা কাউকে একেবারে নিষ্পাপ থাকতে বাধ্য করেননি। তাঁর দাবি হচ্ছে, মানুষ যখনই কোন অপরাধ করে বসবে সাথে সাথে তওবা করে নেবে এবং পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসবে। কখনো তার পদস্খলন হলে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাবে। কখনো হোঁচট খেয়ে মাটিতে উল্টে পড়ে গেলে সাথে সাথে উঠে দাঁড়াবে, শরীরে কোন ময়লা লেগে থাকলে তা ঝেড়ে ফেলবে এবং পুনরায় লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলবে।

মানুষের আত্মাও বলতে গেলে তার দেহের মত। উভয়ই সব সময় পাক-পবিত্র থাকতে চায়। কেননা দেহ্ ও আত্মা থেকে সব সময় এমন জিনিস বের হয় এবং তার মধ্যে বাইরে থেকে প্রবেশ করে যা অনবরত গোসল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দাবি জানায়। দেহে এমন সব গ্রন্থি এবং কলকব্জা রয়েছে যা সব সময় লালা নির্গত করে। সে যে যমীনের বুকে বাস করে তার পরিবেশ অনবরত তার দেহে ধুলোবালি জমা করে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এসব ময়লা দূর করে ফেলা একান্ত প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে মানুষের অন্তরও খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাছাড়া অন্যদের সাহচর্যে সে নানারূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে এবং নিত্য নতুন উত্তেজনার শিকার হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন বারবার তওবা করার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার—যাতে অন্তরের ময়লা দূর হতে পারে এবং কালো দাগ বিলীন হয়ে যেতে পারে। যেমন গোসলের মাধ্যমে দেহ থেকে ময়লা দূর করে তা পরিষ্কার রাখা হয়। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত সেদিকেই ইঙ্গিত করেছে :

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ‎٠

নিশ্চিতই আল্লাহ্ তাআলা তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন। —সূরা বাকারা : ২২২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সব সময় তওবা করতেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। অন্যদেরও তিনি এ কাজে উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন :

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً ‎٠

তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর। আমি আল্লাহ্র কাছে দৈনিক একশো বার তওবা করে থাকি।

এই গুণের জন্য কুরআন মজীদ নবী-রাসূলদের প্রশংসা করেছে। হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে :

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ‎٠

অতি উত্তম বান্দাহ্, বারবার খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। —সূরা সাদ : ৩০

আল্লাহ্ তাআলা মুমিন লোকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে ব্যক্তি-স্বার্থের মালিন্য, প্রবৃত্তির তাড়না এবং জীবনযাত্রার পথের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। কেননা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তারা ঈমানের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। নিম্নোক্ত আয়াত এই বাস্তব সত্যকেই তুলে ধরেছে :

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۔

ঈমানদার লোকদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে আল্লাহ্দ্রোহী শক্তি 'তাগূত'। এটা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। —সূরা বাকারা ঃ ২৫৭

এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের দ্বারা যে ভুলভ্রান্তি হয়ে যায় তার ধাপগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। একই জিনিস কারো জন্য সঠিক এবং বৈধ গণ্য হয়, কিন্তু অপরের জন্য ভ্রান্ত ও অবৈধ প্রমাণিত হয়। কবি বলেন ঃ

একই কাজের ফল দ্বিবিধ হতে পারে
একজনের জন্য যা নেকী
অন্যের জন্য হতে পারে গুণাহের পর্যায়ভুক্ত।
তাসাওফপন্থীদের কথার অর্থও খুব সম্ভব তাই ঃ

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔

ধার্মিক লোকদের নেক কাজ নৈকট্যলাভকারী লোকদের অপরাধ বলে গণ্য হয়।

এই আলোচনার উদ্দেশ্যে হচ্ছে, লোকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ থেকে ফায়দা উঠানো এবং এর আলোকে অপরাধীদের অপরাধ এবং উদ্যত যুবকদের বেপরোয়া কার্যকলাপের চিকিৎসা করা। "ঈমান বর্তমান থাকলে গুনাহ্ কোন ক্ষতি করতে পারে না।"—এই ভ্রান্ত এবং নেতিবাচক দর্শনের কোন ভিত্তি নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এই ধ্যান-ধারণা একদিকে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, শক্তি সামর্থ্য এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পতন ঘটিয়েছে, অপরদিকে তা ঈমানকে একটি নৈতিক দুর্গ এবং জাতীয় সংহতি

ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসেবে এর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে। তাছাড়া ঈমান যে জ্ঞানকে আলো দান করে এবং অন্তরকে প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, উল্লেখিত ধ্যানধারণা তার এই মর্যাদাকেও চরমভাবে আহত করেছে এবং সর্বপ্রথম তার অবয়বকে বিকৃত করে ছেড়েছে।

আমরা একথা বলছি না যে মানুষ অপরাধ করে বসলে চোখের পলকেই কাফির হয়ে যায়। ঈমানের প্রসঙ্গটি এর চেয়েও নাজুক। আমরা অবশ্যই এ কথা বলব যে, দুষ্কর্ম যখন ঈমানকে গ্রাস করে নেয় এবং তার উপর অবিরত আক্রমণ চালাতে থাকে, এভাবে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং ঈমান ঘুটঘুটে অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে—এই অবস্থায় তওবার অগ্নিস্ফুলিংগ উদ্ভাসিত হয়ে এই অন্ধকারের পর্দাকে ভেদ করতে পারে না। এ ধরনের অন্তর থেকে, শেষ পর্যন্ত ঈমান ধীরে ধীরে বিদায় নিতে থাকে, হৃদয়ের সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সে ভয়াবহ জাহিলিয়াতের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা যাক :

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ কামাই করেছে এবং পাপের জালে জড়িয়ে পড়েছে সে-ই হবে জাহান্নামী এবং চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে।

—সূরা বাকারা : ৮১

রাত-দিন অতিবাহিত হতে থাকে, দুষ্কর্ম নিজের জাল বিস্তার করতে থাকে, আর অমনোযোগী ব্যক্তি অপমান ও লজ্জার বিছানায় বেহুঁশ অবস্থায় পার্শ্ব বদল করতে থাকে। তার ঠিকানা দোযখ ছাড়া আর কি হতে পারে ? আর তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা।

আয়াতে উল্লেখিত (সাইয়্যেআত) শব্দটি এখানে যদি শিরক এবং মূর্তিপূজা অর্থে ব্যবহৃত হত, তাহলে আয়াতের কোন অর্থই হয় না। এ আয়াত মূলত ইহুদী আলেমদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে এবং তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। মূর্তিপূজার অর্থ করার সুযোগ কোথায় ? আভিধানিক অর্থ এবং শরীআতের

পরিভাষাগত দিকটিও এ ধরনের ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ করে দেয়। এজন্য কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকে না।

একটি বিতর্ক যুদ্ধ

কতিপয় লোক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, যে মুসলমান অনবরত গুনাহ্ করে এবং এর উপর অবিচল থাকে তার হুকুম কি ? একদল বলেছেন, সে কাফির। অন্যরা বলেছেন, না না, সে মুসলমান। ঈমান অটুট থাকলে গুনাহ্ করলে আর কি হয় ? অপর দল বলেছেন, ঈমান ও কুফরের মাঝখানে একটি স্তর আছে। সে এই পর্যায়ভুক্ত।

এ ছিল একটি শব্দগত বিতর্ক। এর ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ্ দুটি পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর পরিণতিতে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করাটাই ভুল, বরং নাজায়েয। এটা মূলত ইসলামের মেজাজ-প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতারই ফল।

ইসরার (পুনঃ পুনঃ) শব্দটির মধ্যে ইচ্ছার একাগ্রতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তার অর্থও নিহিত আছে। এ থেকে প্রকাশ পায় যে, কোন ব্যক্তি বাঞ্ছিত ফলাফল অনুমান করে নিয়েছে এবং উপায়-উপকরণ ও কার্যকারণ শক্তির উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। অন্য কথায় বলা যায়, এটা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, তাঁর সাথে নাফরমানী করার সংকল্প, তাঁর প্রতি বেপরোয়া মনোভাবের প্রকাশ এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা। একজন মুসলমানের বেলায় এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী কল্পনা করা যায় না।

নিঃসন্দেহে কোন নিষ্ঠাবান মুমিনের ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে দুর্বলতা থাকতে পারে, তার প্রবৃত্তির মধ্যে উত্তেজনা এবং তার আবেগের মধ্যে উচ্ছ্বাস থাকতে পারে, এভাবে সে খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। কিন্তু এটাকে 'ইসারার' বলা যায় না। যে ইতিবাচক শক্তি মানুষকে ভাল কাজের দিকে ধাবিত করে, তার দুর্বলতার কারণে সে যদি খারাপ কাজ করে বসে তাহলে এটাকে 'দুষ্কর্মের উপর অবিচল থাকা বা তা বারবার করা' বলাটা ঠিক হবে না। কেননা মুমিন ব্যক্তির কখনো পদস্খলন ঘটলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার মধ্যে এক ধরনের

অপমান এবং লজ্জাকর অনুভূতি জাগ্রত হয়—চাই সে অনুভূতি দুর্বল হোক অথবা সবল।

কিন্তু যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কোন মুসলমান হাসতে হাসতে মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হয় এবং ইসলামী শরীআতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে তাহলে বলতে হবে তার অন্তর থেকে আল্লাহ্র দীন বিদায় নিয়েছে এবং ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

অপমানবোধ এবং অনুভূতিই যেকোন মুমিন ব্যক্তিকে তওবার দিকে ধাবিত করে—চাই সে অবিলম্বে তওবা করুক বা বিলম্বে। এই অনুভূতিই তাকে ঈমানের সাথে সংযুক্ত করে রাখে। কিন্তু যদি এই বোধশক্তি বিদায় হয়ে যায় তখন ঈমানের আর কি বাকি থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اٰخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ . وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ .

মুমিন এবং ঈমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেন খুঁটিতে বাঁধা একটি ঘোড়া। তা চারদিকে চক্কর দেয় আবার নিজের খুঁটির কাছে ফিরে আসে। মুমিন ব্যক্তি ভুল করে বসে কিন্তু সাথে সাথে নিজের প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসে। —মুসনাদে আহ্মাদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৮-৫৫

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ وَاهٍ رَاقِعٌ فَسَعِيْدٌ مَّنْ هَلَكَ عَلٰى رُقْعَةٍ .

মুমিন ব্যক্তি অপরাধী এবং তওবাকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী। যে ব্যক্তি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে মারা যায় সে-ই হচ্ছে সৌভাগ্যবান।

ইসরার বা বাড়াবাড়ি এমন একটি জিনিস যা সহসা সৃষ্টি হয় না। মানুষ একবার, দু'বার, তিনবার, এভাবে বারবার গুনাহ্ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অনুভূতির মৃত্যু ঘটে। এখন সে কেবল অপরাধই করে না, বরং অপরাধের প্রতি তার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়। এই অবস্থার নামই হচ্ছে ইসরার। অপরাধের

গলিপথে পা রাখার পর ঈমানের শিকড়গুলো কাটা শুরু হয়ে যায় এবং মানুষ যদি তওবার দিকে অগ্রসর না হয় তাহলে ঈমানের শিকড়গুলো কাটতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত ঈমান-বৃক্ষটি মরে শুকিয়ে যায়।

এটা এমন একটা বিষয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলোর সঠিক অধ্যয়ন এবং ঘটনাবলীর সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। অন্যথায় বিতর্ক ও শব্দের মারপ্যাচ একটি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি এখানে নীতিশাস্ত্রের কিছু স্বীকৃত তত্ত্ব তুলে ধরতে চাই। এর আলোকে দুষ্কর্মের শ্রেণীবিভাগ, তার ধরন, দুষ্কৃতিকারীদের স্তর এবং এর ফলে কুফর অথবা ঈমানের সাথে তাদের কতটা কাছে অথবা দূর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়—তা অনুধাবন করা যেতে পারে। উস্তাদ মুহাম্মাদ ইউসূফ মূসা তার "মাবাহিসুন ফালসাফিয়াতুন ফিল আখলাক" নামক গ্রন্থে বোধশক্তির কয়েকটি স্তর বর্ণনা করেছেন। তা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

> উদ্ভিদেরও খাদ্য এবং আলো-বাতাসের প্রয়োজন হয়। খাদ্য সংগ্রহের জন্য শাখা-প্রশাখা শূন্যের দিকে উঠে যায়। এটাকে তিনি 'প্রয়োজন' নাম দিয়েছেন।

যেসব জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে পশু জীবন ধারণ করে সে সেদিকে ধাবিত হয়। যে জিনিস তার প্রয়োজন সে সম্পর্কে তার সীমিত জ্ঞানও আছে। কিন্তু এসব জিনিস লাভ করে যে ফল পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে পশুর কোন বোধশক্তি বা চেতনা নেই। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'ক্ষুধা'।

তিনি পুনরায় বলেন, এরপর আমরা মানুষের দিকে অগ্রসর হব। আমরা দেখছি মানুষ তার প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের জন্য চেষ্টা সাধনা করে এবং এ সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ বোধশক্তিও রয়েছে। তা অর্জন করতে পারলে যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং হারিয়ে গেলে যে কষ্ট পাওয়া যায়—এ সম্পর্কে তার পূর্ণ অনুভূতি রয়েছে। এই জিনিসই তাকে জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। তার এই বৈশিষ্ট্যকে 'ইচ্ছা বা মনোযোগ' নাম দেওয়া যায়। মানুষ যে জিনিসের সঠিক ধারণা রাখে এবং এর ফলাফল সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে—তার

দিকে মনোনিবেশের নাম হচ্ছে 'ইচ্ছা বা মনোযোগ'। মানুষের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে এবং তদনুযায়ী ইচ্ছাও বিভিন্নমুখী হয়ে যায়। কারো লক্ষ্য হচ্ছে বিখ্যাত ব্যক্তি হওয়া, কারো উদ্দেশ্য হচ্ছে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব হস্তগত করা, কারো উদ্দেশ্য হচ্ছে ধন-সম্পদ অর্জন করা ইত্যাদি।

একই শ্রেণীভুক্ত ঝোঁকপ্রবণতা যা একই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে তাকে 'আলাম' বলা হয়। আর এখান থেকেই আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যখন কোন ঝোঁক-প্রবণতা সমশ্রেণীর অন্যসব ঝোঁকপ্রবণতার উপর বিজয়ী হয় এবং এগুলোকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে নেয় তখন এটাকে বলা হয় 'আকর্ষণ'।'

অতঃপর যে জিনিসের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়—সে সম্পর্কে মানুষ যখন চিন্তা-ভাবনা করে, তার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা থাকে তা দূরীভূত করে, যেসব গিরিপথ থাকে তা সমতল করে নেয়, অতঃপর তা অর্জনের জন্য একাগ্র হয়ে উঠে—এটা হচ্ছে আকর্ষণের পরবর্তী পর্যায়, আর এর নাম হচ্ছে 'সংকল্প'। আকর্ষণ এবং সংকল্পের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আকর্ষণ অনেক সময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তা বাঞ্ছিত ফলাফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। মানুষের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় কিন্তু তা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

ইচ্ছা বা সংকল্প সম্পর্কে বলা যায়, মানুষ প্রথমে কোন একটি জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করে, যাবতীয় উপায়-উপাদানের পরিমাপ করে, অবস্থা ও পরিবেশ যাচাই করে, বাঞ্ছিত জিনিস লাভ করা সম্ভবপর মনে হলে তা অর্জনের সংকল্প করে। অতঃপর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পালা আসে। যদি তা স্বভাবের মধ্যে ঢুকে যায় তখন তার নাম দেওয়া হয় স্বভাব। অতএব জানা গেল আভ্যন্তরীণ শক্তির এক আলামের উপর অপর আলামের বিজয়ী হওয়ার নাম হচ্ছে সংকল্প।

মনোবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে কবীরা গুণাহ্ বারবার করাটা এমনিভাবেই হয় না। এর পূর্বে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়, যার পরিণতি হচ্ছে কবীরা গুনাহ। যেখানে এক স্তর শেষ হয় সেখানে পরবর্তী স্তরের সূচনা হয়। এভাবে সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে যায়।

অতএব যখন আমরা জানতে পারলাম যে, কোন সাময়িক ঝোঁক-প্রবণতা অথবা কোন দুর্বার ইচ্ছার পরিণতিতে যে অপরাধ সংঘটিত হয় তা ঈমানকে অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে পৌছে দেয়। তা তার দেহে এত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর তওবার কাঁটা ফুটানো না হয় এবং অনুশোচনার ব্যাণ্ডেজ না লাগানো হয়, ততক্ষণ তা নিরাময় হয় না। —নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

ব্যভিচারী যখন যেনায় লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। (অর্থাৎ তার ঈমানী প্রত্যয়ে দুর্বলতা এসে যায়, অন্যথায় সে পাপে লিপ্ত হতে পারে না)। চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না। মদখোর যখন শরাব পান করে তখন সে মুমিন থাকে না।

—ইবনে মাজাহ ঃ ফিতান অধ্যায়।

অতএব যে ব্যক্তি মারাত্মক অপরাধের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তার ঈমানের অবস্থা কি হতে পারে ? আর অপরাধ করাটা যার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ঈমান সম্পর্কেই বা কি বলা যায় ? এরূপ অবস্থায় ঈমান বাকি থাকাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি তা অবশিষ্ট থাকতে পারে তাহলে বিতর্ক-প্রিয়দের খুপরির মধ্যেই অবশিষ্ট থাকতে পারে।

বারবার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার একটি মেজাজ-প্রকৃতিও আছে। তা জেনে নেয়া দরকার। বরবার অপরাধ লিপ্ত হওয়ার ক্ষতি শুধু এতটুকুই নয় যে, তা দুষ্কর্মের অন্তরালে ঈমানের সৌন্দর্যকে ঢেকে ফেলে, বরং তা মানুষকে দুষ্কর্মের মধ্যে এমনভাবে বিভোর করে দেয় যে, অতঃপর সে আর কোন ভাল কাজ করা বা কল্যাণের দিকে অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। গুনাহের কাজে অবিরত লিপ্ত ব্যক্তিদের অবস্থা ঠিক সে ধরনের নয়—যা কুরআন মজীদ উল্লেখ করেছে ঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صٰلِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠

> আরো কিছু লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল মিশ্রিত ধরনের—কিছু ভাল আর কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করবেন। তিনি ক্ষমাকারী ও করুণাময়। —সূরা তওবা ঃ ১০২

কখনও নয়, খারাপ কাজের উপর অবিচল থাকার অর্থ হচ্ছে, অন্তরের মধ্যে কল্যাণকর কাজ করার যে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত ছিল তা শুকিয়ে যাওয়া এবং এখন আর তার মধ্যে ভাল কাজ করার তৃষ্ণা থাকতে পারে না। এজন্যই নীতিশাস্ত্রের স্বীকৃত সত্য এই যে, যে চরিত্র বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, কোন একটি অবস্থার উপর যার স্থায়িত্ব নেই তাকে চরিত্র বলা যায় না। উস্তাদ মুহাম্মাদ ইউসূফ মূসা বলেন ঃ

> যে দর্শন নৈতিকতাকে আপেক্ষিক জিনিস বলে তার উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া আমাদের মোটেই উচিত নয়। অর্থাৎ মানুষের উপর যখন যে ধরনের ঝোঁক-প্রবণতা প্রভাব বিস্তার করবে তার পরিপেক্ষিতে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে। যেমন কোন ব্যক্তির উপর দানশীলতার আবেগ প্রভাবশীল এবং তার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ করার প্রবণতা রয়েছে, কচিৎ সে কৃপণতা করে—তাহলে তাকে দানশীলই বলা হবে।

সত্য-মিথ্যা, ভাল ও খারাপ সব কাজের ক্ষেত্রেই এই অবস্থাই বিরাজমান। কিন্তু উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরত্ব দেওয়া আমাদের জন্য সঠিক নয়। এজন্য যে, চরিত্র-নৈতিকতার মধ্যে দৃঢ়তা ও অবিচলতার বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এর ফলে আমলের আকারে তার ফলাফল সর্বদা প্রকাশ পেতে থাকবে।

ঈমানের আওতায় যখন আমরা এই নৈতিক মূলনীতিকে সংযুক্ত করব তখন আমাদের মানতেই হবে যে, যেখানে পরিপূর্ণ ঈমান আছে সেখানে

অবশ্যম্ভাবীরূপে নেক আমলও রয়েছে। যখনই আমলে ঘাটতি দেখা দেবে, ঈমানেও ঘাটতি দেখা দেবে। অতএব যেখানে অপকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না সেক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতেই হবে যে, এখান থেকে ঈমান বিদায় নিয়েছে। এজন্যই আমরা বলেছি, দুষ্কর্মে অনবরত লিপ্ত থাকাটা ব্যাপক অর্থে কখনো কোন মুমিনের চরিত্রে পাওয়া যেতে পারে না।

কুরআন-হাদীস এবং এর সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা যায় যে, শরীআত কাজের অনুপ্রেরণা ও চালিকাশক্তির উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করে থাকে, যে আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রভাব থেকে কোন কাজই মুক্ত নয় এবং যার কারণে কোন কাজ অবিরত চলতে থাকে অথবা বন্ধ হয়ে যায়—যখন সে সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়া যায় তখন শরীআত ঈমান ও তার শুভ পরিণাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে থাকে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ·

আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করেছে, অতএব সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। —সূরা ত্বাহা ঃ ১২১

ইবনে কুতায়বা এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, একথা বলা যেতে পারে যে, আদম (আঃ) নাফরমানী করেছেন, কিন্তু একথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে, তিনি নাফরমান ছিলেন। কেননা নাফরমান কেবল সেই ব্যক্তিকেই বলা যায়, যে নাফরমানীর মধ্যে ডুবে থাকে এবং নাফরমানীকেই নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। যেমন কোন ব্যক্তি কাপড় সেলাই করছে, তখন বলা হয়, সে নিজের কাপড় সেলাই করছে, কিন্তু একথা বলা হয় না যে, সে একজন দর্জি—যতক্ষণ সে এটাকে পেশা বানিয়ে না নেয়।

অনুরূপভাবে হযরত আদম (আঃ)-এর দ্বারা নাফরমানী হয়েছিল বটে, কিন্তু মাত্র একবার, তাও ভুলবশত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এখনো অপরাধ করেনি ঠিকই, কিন্তু সে তা করার সংকল্প রাখে, সে নিশ্চিতরূপেই অপরাধী। তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে এবং এজন্য শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ ۰ قِيْلَ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ انَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ ۰

যখন দুই মুসলমানরা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখের উপযোগী হয়ে যায়। বলা হল, ঠিক আছে। সে তো হত্যাকারী, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ ? তিনি বললেন ঃ সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিয়ে থাকবে। —নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্

নিঃসন্দেহে অপরাধ এবং পদস্খলনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে নিয়াতকে উপেক্ষা করা যায় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়াতের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ঈমানের উপর গুনাহের যে কু-প্রভাব পড়ে তা নিরূপণ করতে গিয়ে আমাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নজর রাখতে হবে।

এক. যাবতীয় গুনাহ্ একই প্রকৃতির নয়, সব গুনাহের প্রতি সমান আকর্ষণ থাকে না এবং সব লোক একই ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয় না। যেমন, আমাদের দেশের কোন মুসলমান শূকরের গোশত খায় না। এর পরিবর্তে তারা আনন্দ সহকারে গরু-ছাগলের গোশত খেয়ে থাকে। অনুরূপভাবে গরীব ও নিঃস্ব লোকেরা রেশমের কাপড় পরিধান করে না এবং সোনার ব্যবহারও করে না। শূকরের গোশত খাওয়া এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করা গর্হিত কাজ—যা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু একদিকে শূকরের গোশত খাওয়া একটি খারাপ কাজ, অন্যদিকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করাটাও একটি খারাপ কাজ। শেষোক্তটির সম্পর্কে জৈবিক লালসার সাথে। এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা জৈবিক ভারসাম্যহীনতার শিকার হয়। তারা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও কামাবেগকে বশ করতে পারে না। এই দৃষ্টিতে দেখা হলে এই দুই ধরনের অপরাধী এক সমান হতে পারে না।

দুই. এখানে এমন পরিবেশও আছে যা খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং এমনও পরিবেশ আছে যা খারাপ কাজে লিপ্ত করে। অনেক লোক আছে— যারা খারাপ কাজকে চরমভাবে ঘৃণা করে। কিন্তু খারাপ পরিবেশের কারণে তাদের পা ফসকে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিবেশ তাদের দীন ও আখলাখের জন্য আশংকাজনক। আবার এমন অনেক লোক রয়েছে যারা দুষ্কর্মের প্রতি প্রলুব্ধ। কিন্তু তারা নিজেদের সামনের সমস্ত দরজা বন্ধ দেখতে পায়। তা খোলার কোন পথ নেই। তারা এমন এক উন্নত ও পবিত্র পরিবেশে বাস করে যেখানে খারাপ কাজ করার কোন সুযোগ নেই।

তিন. পতনেরও বিভিন্ন পর্যায় আছে। কেউ পাহাড়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে পতিত হয়, আবার কেউ পথ চলতে চলতে পা ফসকে গিয়ে পতিত হয়, কেউ গভীর গর্তে গিয়ে পতিত হয়। এদের সবার পতন এক রকমের নয়। গুনাহের গর্তে পতিত হওয়ার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। এক ব্যক্তি অনুকূল পরিবেশ পেয়ে যায়, মনের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে এবং সে অপরাধ করে বসে। অপর ব্যক্তি আনন্দ-উৎসাহের সাথে অপরাধে লিপ্ত হয়। অপর ব্যক্তি সংকল্প ও চেতনা সহকারে অপরাধে লিপ্ত হয়। চতুর্থ এক ব্যক্তি খারাপ কাজ করার সংকল্প করে, অনবরত খারাপ কাজ করতে থাকে, ধীরে ধীরে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সে বার বার গুনাহ্ করে এবং তাতেই আনন্দ পায়। এই কয়েক ধরনের লোক একই সমতলে অবস্থান করছে না। তাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

চার. স্বয়ং গুনাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা যেন পরস্পর সংযুক্ত একটি বৃত্ত। মিথ্যাবাদী খেয়ানতকারী হয়ে থাকে এবং খেয়ানতকারী ঘুষখোর হয়ে থাকে। ঘুষখোর জাতির কল্যাণ ও নিরাপত্তার দুশমন। সে তার দীন, ঈমান, মর্যাদা, দেশ সবকিছু পূর্ব থেকে ক্রেতার হাতে তুলে দেয়। অনুরূপভাবে মদখোর ব্যভিচারী হয়ে থাকে এবং ব্যভিচারী নরঘাতক হয়ে থাকে। নরঘাতক এমন এক হিংস্র পশু যে দীন ও আখলাকের ভান্ডার তছনছ করে দেয়।

সত্যকথা এই যে, ব্যক্তি ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে মাসিয়াত (অপরাধ) শব্দের অর্থের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। যেমন 'সফর'

(ভ্রমণ) শব্দটি কাছের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সারা পৃথিবী পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথবা 'রোগ' শব্দটি যেমন সাধারণ মাথা ব্যথার জন্যও ব্যবহৃত হয়। 'মাসিয়াত' শব্দটিও তদ্রূপ। এর অর্থের মধ্যেও দুটি দিক রয়েছে—যার মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। এর কারণ এই নয় যে, কতগুলো হচ্ছে ছোটখাট অপরাধ আর কতগুলো হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ। বরং মারাত্মক অপরাধের সবগুলো সমান নয়। অন্তরের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। কত বড় ভুল হবে যদি আমরা বলে বেড়াই যে, ঈমান থাকলে কবীরা গুনাহের দ্বারা কোন ক্ষতি হতে পারে না অথবা যদি খারিজীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে ঈমান চলে যায়! এই নাজুক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বকালের একজন কবি বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَمُتْ وَلَا يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ ۔

فَأَمْــرُهُ مُفَــوَّضٌ لِــرَبِّــهِ ۔

যে ব্যক্তি মারা গেল।
কিন্তু তওবা করল না তার গুনাহের জন্য।
তার ব্যাপারটি আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত।

কবি নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন ঃ

إِنَّ الـــلّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ۔

আল্লাহ্ কখনো শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না, এ ছাড়া যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করল, সে অতি বড় মিথ্যা রচনা করল এবং কঠিন গুনাহের কাজ করল। —সূরা নিসা ঃ ৪৮

এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'শিরকের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়।' শিরকের সমপর্যায়ের আরো অনেক কথা আছে। যেমন আল্লাহ্কে অস্বীকার করা

অথবা আল্লাহ্‌কে স্বীকার করা হয় কিন্তু তাঁর বিধান প্রত্যাখ্যান করা এবং তা অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা ইত্যাদি।

শিরক ছাড়া আর যত গুনাহ্ আছে তার মধ্যে কতক গুনাহ্ তিরস্কারের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু এমন অনেক মারাত্মক গুনাহ্ আছে যা ঈমানের জন্য জীবন সংহারক। যেমন আমরা পেছনে উল্লেখ করে এসেছি। এই ধরনের গুনাহ্ শিরকের চেয়ে কম নয়। এসব মারাত্মক অপরাধের দিকেই নিম্নোক্ত আয়াত ইঙ্গিত করছে ঃ

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٠

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করে—আল্লাহ্ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। এটা হবে তার জন্য অপমানকর শাস্তি। —সূরা নিসা ঃ ১৪

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ٠

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। এই ধরনের লোকেরা তাতে চিরকাল থাকবে। —সূরা জিন ঃ ২৩

সাধারণ গুনাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ٠

আর যাদের অবস্থা এই যে, তারা যদি কোন অশ্লীল কাজ করে বসে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে বসে, তাহলে সাথে সাথেই আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে নিজেদের পাপের ক্ষমা চায়। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে ? এই লোকেরা জেনে-বুঝে নিজেদের অন্যায় কাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না।
—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৫

অপরাধ প্রবণতা কি একটি রোগ ?

আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মহল থেকে বরাবর আওয়াজ উঠছে—পাপ এবং পথভ্রষ্টতাকে অন্তরের রোগের ফল মনে করা উচিত। অনুরূপভাবে অপরাধের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, তা রোগের লক্ষণ। অতএব শক্তির ভয় দেখানো এবং উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে স্নায়বিক দুর্বলতা ও মানসিক রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা হওয়া উচিত—যার পরিণতিতে এই অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে।

'অপরাধ-প্রবণতা' একটি রোগ। তাকে অপরাধ মেনে নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করার আগে এর চিকিৎসার চিন্তাভাবনা করা উচিত। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। এ সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা এবং ইসলামের শিক্ষার আলোকে তার মূল্যায়ন করা আমাদের কর্তব্য।

হয়ত জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, অপরাধ-প্রবণতা সত্যিই কি একটি রোগ? কুরআন মজীদ বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছে তার আলোকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। হাঁ, অপরাধ-প্রবণতা একটি রোগ বিশেষ। সূরা বাকারায় নিফাকের (কপটতা) জন্য 'রোগ' (   ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا .

তাদের মনে একটি রোগ রয়েছে। এ রোগকে আল্লাহ্ আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।
—সূরা বাকারা ঃ ১০

এখানে 'মনের রোগ' বলতে কলবের গতি দ্রুত অথবা ধীর হয়ে যাওয়া বোঝানো হয়নি। আরো অনেক সূরা আছে যাতে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আহ্যাবে এই শব্দটি তিনবার এসেছে এবং কথার ধরন থেকেই বোঝা যায়, কোন্ স্থানে তা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উম্মুল মুমিনদের (নবী-পত্নীগণ) উপদেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ ۔

তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না। তাতে রোগগ্রস্ত মনে কোন ব্যক্তি লালসা করতে পারে।
—সূরা আহ্যাব : ৩২

এখানে রোগ অর্থ মনের সেই অবস্থা যা চরম জৈবিক উত্তেজনার পরিণতিতে সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানুষের মন এমন চারণভূমিতে বেড়াতে চায় যা তার চারণভূমি নয় এবং যেখানে তার সভ্য, ভদ্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত সেখানেও সে লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীর স্ত্রীদের এমন স্থানে দেখতে চান, যেখানে মানসিক ওয়াসওয়াসা অনুপ্রবেশ করতে না পারে। তিনি এর সমস্ত ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিতে চান। আর এ কথা প্রমাণিত যে, জৈবিক ভারসাম্যহীনতা অসংখ্য চৈন্তিক, নৈতিক ও স্নায়বিক রোগের উৎস। ইসলামের দুশমনরা আহ্যাব যুদ্ধের সময় যখন মদীনাকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে রেখেছিল, তখন দুর্বল ঈমানের অধিকারী এবং সংশয়বাদী লোকদের যে ভূমিকা ছিল—সে সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا ۔

যখন মুনাফিক এবং রোগগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা পরিষ্কারভাবে বলছিল যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। —সূরা আহ্যাব : ১২

ব্যক্তিত্ব যতই দুর্বল এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে—এই রোগের পংকিলতা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোন ব্যক্তি এই সভায় এক কথা

বলে এবং অন্য সভায় আরেক কথা বলে। এখানে তার কথার ধরন হয় একরূপ, আবার অন্যখানে হয় আরেক রূপ। শেষ পর্যন্ত এটাই তার স্বভাবে পরিণত হয় এবং সে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের অসংখ্য মুনাফিক ছিল যারা ইসলামী সমাজের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা কট্টর কাফিরদের চেয়েও মারাত্মক বিপদ ছিল।

এখানে আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, "সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন সেই মুনাফিকরা—যাদের অন্তরে রোগ ছিল—বলেছিল।" এও হতে পারে যে, اَلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ - দ্বারা অন্য কোন দলকে বোঝানো হয়েছে, যারা শত্রুদের ভয় করার ব্যাপারে, যুদ্ধে কাপুরুষতা প্রদর্শনে এবং রাসূলের পয়গাম ও তার শুভ পরিণতি সম্পর্কে সংশয় পোষণ করার দিক থেকে মুনাফিকদের সাথে তুলনীয় ছিল। এভাবে তারা মুনাফিকদের সাথেই থেকে থাকবে এবং তাদের মধ্যেই গণ্য হয়ে থাকবে।

যাদের চেহারায় যুদ্ধে না যাওয়ার ভাব ফুটে উঠেছিল তাদেরকেও রুগ্নদের সাথে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যেন তাদের মুখোশ উন্মোচিত হতে পারে। সূরা আহ্যাবের নিম্নোক্ত আয়াতে এই ধরনের সব লোকদের একত্র করা হয়েছে :

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً ‎٠

মুনাফিক লোকেরা এবং যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে— তারা যদি নিজেদের একাজ থেকে বিরত না থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আমরা তোমাকে দায়িত্বশীল করে তুলব। পরে এই শহরে তোমার সাথে তাদের বসবাস কঠিনই হবে। —সূরা আহ্যাব : ৬০

এই তিরস্কার এবং হুমকির পূর্বে মুসলিম নারী সমাজকে হিদায়াত দান করা হয়েছে যে, তারা যেন পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সততা, পবিত্রতা ও মানসম্ভ্রমের যাবতীয় নীতিমালার অনুসরণ করে। এ থেকে

জানা যায় যে, এখানে اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ বলতে সেই যুবকদের বোঝানো হয়েছে, যারা ভবঘুরের মত রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াত এবং লাম্পট্যের সুযোগ খুঁজে বেড়াত। এসব যুবকের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন :

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

> হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং ঈমানদার লোকদের পরিবারের মহিলাদের বলে দাও—তারা যেন নিজেদের উপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অতি উত্তম নিয়ম-যেন তাদের চেনা যায় ও তাদের উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
>
> —সূরা আহযাব : ৫৯

কিন্তু মনের রোগের মধ্যে লঘুত্ব ও প্রচণ্ডতার মাত্রা অনুযায়ী পার্থক্য হয়ে থাকে। সাথে সাথে এর প্রভাবে শরীআত ও ইসলামী আইনের যে বিরোধিতা হয়ে থাকে এবং মূল্যবোধ ও রীতিনীতির যে লংঘন হয়ে থাকে, তার মধ্যেও মাত্রার পার্থক্য রয়েছে। অনন্তর অপরাধী যদি মনের রোগী হয়ে থাকে তাহলে তাকে অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করা ও কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়াও ঠিক হবে না। ইসলাম রোগের এই বিভিন্ন অবস্থাকে দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে।

এক. ইসলাম শাস্তির ব্যবস্থাও করে থাকে। যেসব জিনিসের উপর সমাজের শান্তি-শৃংখলা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল এবং যেগুলোর সাহায্য ছাড়া সমাজে সৌন্দর্যের পরিবৃদ্ধি ঘটানো, তার উন্নত মূল্যবোধের সংরক্ষণ এবং তার অসম্মানকারীদের পরাভূত করা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম বেত্রাঘাতও করায়, রজমেরও (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) ব্যবস্থা করায়, হাতও কাটায় এবং মৃত্যুদণ্ডেরও ব্যবস্থা করে।

দুই. ইসলাম এই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে অপরাধকারীকে রোগী মনে করে তার প্রতি সহানুভূতি ও দয়ার দৃষ্টিও নিক্ষেপ করে। সে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হয়। সে বিচারককে শিক্ষা দেয় যে, ভুলক্রমে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া হলে ঠিক আছে, কিন্তু অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া যাবে না। ইসলাম অপরাধীর জন্য কল্যাণের দোয়া করার শিক্ষা দেয়, কিন্তু বদদোয়া করতে নিষেধ করে।

একবারকার ঘটনা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে এক মদখোরকে উপস্থিত করা হল। সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, তোমার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ! তোমাকে কতবারই না গ্রেফতার করা হয়েছে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِلاَّ اَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ٠

তাকে অভিসম্পাত করো না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যতদূর জানি সে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। —বুখারী-কিতাবুল হুদূদ

অপর বর্ণনায় আছে ঃ

لاَتَقُوْلُوْا هٰذَا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ٠

এরূপ বলো না। বরং তোমরা বল, হে আল্লাহ্‌! তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ্‌! তার তওবা কবুল কর।

এই অনুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি অপরাধীকে নিজের আঁচলের মধ্যে টেনে নেয়, তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেয় এবং ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সুপারিশও করা যেতে পারে। এর ফলে হয়ত সে গোমরাহী থেকে ফিরে আসতে পারে অথবা মনের রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে।

অন্তরের যেসব রোগ বিবেচনাযোগ্য এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার যোগ্য তা এই যে, মানুষ যখন পূর্ণতা অর্জন ও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছার জন্য অবিরত চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু তার সংকল্প রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার কারণে বারবার অকৃতকার্য হয়ে যায়—এই ধরনের রোগের সহানুভূতির সাথে চিকিৎসা করতে হবে।

মানুষ যখন ক্ষতিকর জিনিস থেকে বাঁচতে চায়, নিকৃষ্টতা থেকে বের হয়ে আসতে চায় এবং উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন মাটিজাত প্রকৃতির অসংখ্য অনুভূতি তাকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা দেয়া তা তাকে কল্যাণের পথে পা বাড়াতে দেয় না। শেষ পর্যন্ত তা তাকে নৈরাশ্যের পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে তার আকাঙ্ক্ষা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তার সংকল্প দুর্বল হয়ে যায়। এ সময় আল্লাহ্‌র দীন তার শিক্ষা নিয়ে এই হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে হাযির হয় এবং তার আকাঙ্ক্ষাকে রোগমুক্ত করে দেয় ও তার সংকল্পকে শক্তিশালী করে তোলে। অতঃপর সে মৃত্যু পর্যন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

মানসিক রোগের এই নাজুক স্থানের চিকিৎসা করার জন্যই উৎসাহমূলক আয়াত এবং হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো অন্তরকে আল্লাহ্‌র রহমত ও ক্ষমা লাভের আশায় পরিপূর্ণ করে দেয় এবং তাকে কখনো নিরাশার শিকার হতে দেয় না। যেমন পাপীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٠

বল, হে আমার বান্দাগণ—যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ—তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল এবং দয়াময়।

—সূরা যুমার ঃ ৫৩

এ ধরনের আশার বাণী সম্বলিত ও সুসংবাদ প্রদানকারী আয়াতগুলোকে সংকীর্ণমনা ও অপরিণামদর্শী লোকেরা ক্রটিপূর্ণ কাজ করার এবং পাপে লিপ্ত থাকার হাতিয়ারে পরিণত করে নিয়েছে। এই ধরনের অলীক ধারণা তাদেরকে ভ্রান্ত পথেই নিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের যত আয়াত এসেছে তার উদ্দেশ্য এই যে, যেসব লোক নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবিরত জিহাদ করছে—তাদের যোগ্যতা ও সাহসকে বাড়িয়ে তোলা। তারা যেন সামনেই অগ্রসর হতে থাকে এবং কোন প্রতিবন্ধকতা যেন তাদের প্রতিরোধ করতে না পারে। কোন গিরিসংকট সামনে পড়লে তাদের গতিপথ যেন ঘুরে না যায়। তাদের দ্বারা কখনো অসংখ্য অপরাধ

সংঘটিত হলেও যেন ভাল কাজ করার আগ্রহ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে না যায়। তখন থেকে যদি সে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে এ পর্যন্ত সে যত অপরাধই করে থাকুক—আল্লাহ্র রহমত থেকে যেন নিরাশ না হয়ে যায়।

অসংখ্য আয়াত এবং হাদীস বলে দিচ্ছে যে, এই দুনিয়ায় আমলই হচ্ছে সবকিছু। যার আমল (সৎকর্ম) নেই তার কিছুই নেই। আবার এমন অনেক আয়াত এবং হাদীস রয়েছে যা সামান্য নেক কাজের বিনিময়ে রহমত ও মাগফিরাত লাভের সুসংবাদ দেয়।

লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যে উত্তম জিনিসটি সাধারণত আমাদের সামনে থাকে তা হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের নিম্নোক্ত বাণী ঃ

لاَ تَنْظُرُوْا فِيْ اَعْمَالِ النَّاسِ كَاَنَّكُمْ اَرْبَابٌ . بَلِ انْظُرُوْا فِيْ اَعْمَالِكُمْ عَلٰى اَنَّكُمْ عَبِيْدٌ فَاِنَّمَا النَّاسُ رَجُلاَنِ مُبْتَلِيْ وَمُعَافِيْ فَاعْذِرُوْا اَهْلَ الْبَلاَءِ وَاحْمَدُوا اللّٰهَ عَلَى الْعَافِيَةِ .

> তোমার প্রভু হয়ে মানুষের যাবতীয় কাজ দেখো না। বরং তোমরা আল্লাহ্র বান্দাহ, অতএব নিজেদের কাজের উপর দৃষ্টি দাও। মানুষ দুই ধরনের হয়ে থাকে। কিছু লোক পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়ে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদেরকে অপারগ মনে কর। কিছু লোক নিরাপদে থাকতে পারে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রশংসা কর।

ইসলামের মধ্যে এ ধরনের বহু ইতিবাচক শিক্ষা রয়েছে যার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি অন্তরের সুস্বাস্থ্য এবং রূহানী শক্তি অর্জন করতে পারে।

যেসব লোক মনে করে যে, ইসলামের ইবাদতসমূহ এক ধরনের প্রাণহীন রসম-রেওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এগুলো অবচেতনভাবে ও না বুঝে-শুনে আদায় করা হয়ে থাকে—তাদের একথা মোটেই ঠিক নয়। কেননা ইসলামের প্রাথমিক কর্তব্যসমূহের ভিত্তিই হচ্ছে, জ্ঞান ও চেতনাকে জাগ্রত করা। এসব করণীয় কর্তব্য যখন অন্তর ও মন-মগজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার

করতে সক্ষম হয়, তখনই বলা যায় তা গৃহীত হয়েছে। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের উপর ইবাদত-বন্দেগীর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা তাদের আত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি স্থায়ী বুনিয়াদের গুরুত্ব রাখে। এসব ইবাদত বাধ্যতামূলক করার পেছনে যে হিকমত নিহিত রয়েছে তা এই যে, এগুলো ময়লা দূর করে দেয়, গুনাহের কাজ থেকে বাঁচায় এবং মানুষ ভুল করে বসলে তা সংশোধনের উপায় হয়ে থাকে। তা দুষ্কর্মের দাগগুলো ধুয়ে-মুছে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে।

এই ইবাদতসমূহ মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে, এর মলিনতাকে পরিষ্কার করে এবং এই দুইটি জিনিসই নিরাপত্তার উপায় এবং কলব ও আত্মার রোগ থেকে মুক্তি পাবার পথ। যেমন কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য কেবল এই নয় যে, মুখে পুত-পবিত্র বাক্যগুলো সুমধুর স্বরে পাঠ করা হবে। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র ওহীর সাথে আত্মার সাথে সাধন করা, যাতে পাঠকারী পবিত্র জীবনযাপন করতে সক্ষম হয় এবং সে যখন নিজের প্রতিপালকের কাছে মুনাজাত করবে তখন যেন দুনিয়ার আকর্ষণ ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٠

আমরা কুরআন নাযিলের ধারবাহিকতায় এমন কিছু জিনিস নাযিল করছি যা ঈমানদারদের জন্য নিরাময় ও রহমত। —সূরা ইসরা ঃ ৮২

অনুরূপভাবে নামায গুনাহের কাজ থেকে প্রতিরোধ করে, ওয়াসওয়াসা দূর করে এবং অপরাধের দাগ লেগে গেলে তার চিকিৎসা করে। বড়ই তত্ত্বপূর্ণ কথা বলেছেন কেউ ঃ "যদি তুমি নিজের আত্মাকে ভাল কাজে ব্যাপৃত না রাখ তাহলে তা তোমাকে খারাপ কাজে নিয়োজিত করবে।"

ইসলামেরও এই মূলনীতি। এই মূলনীতির সাহায্যে সে ব্যক্তি এবং সমাজকে বিপদসংকুল বাতেনী রোগ থেকে নিরাপদ রাখে। যে ব্যক্তি অলস এবং যে জাতির কোন দিকদর্শন নেই তাদের অন্তর ও বুদ্ধিবিবেক সহজেই নিকৃষ্টতম রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। মুসলিম সমাজের কাছে যে কঠোর শ্রম আশা করা হয় এবং তার উপর ইবাদতের যে দায়িত্ব চাপানো হয়েছে—যদি সে তাতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে অলসতা ও বেকারত্বের ফলে যে অপরাধ সংঘটিত হয়—তাতে

লিপ্ত হওয়ার সুযোগই তার হবে না এবং ইসলামী সমাজ বাস্তব কর্মক্ষেত্রে যে জটিলতার সম্মুখীন হয় তাও দূর হয়ে যাবে।

আমার ধারণামতে লোকদের থেকে যে অপরাধ প্রকাশ পায় তার জন্য জাতীয় সরকারই অনেকাংশে দায়ী। কেননা সরকার এমন কোন পরিবেশ ও জীবনবিধান সহজলভ্য করেনি যা তাদেরকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখতে পারে। যে আভ্যন্তরীণ রোগে মানবজীবন বিপথগামী এবং ভারসাম্যহীন হয় তার সংখ্যা অনেক। যদি আমরা মনস্তত্ত্ববিদদের বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দেই তাহলে তাদের মতে আভ্যন্তরীণ জটিলতা অন্তসারশূন্যতা এবং মানসিক রোগ থেকে মুক্ত কোন মানুষ নেই। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, কাউকে পাগলামীর রোগে আক্রান্ত বলা হয় আর কারো সম্পর্কে বলা হয় যে, তার থেকে পাগলসুলভ কাজ সংঘটিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি এরূপ কাজ করে বসে তাহলে বলা হয়, তোমার কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই। মহান আল্লাহ্ তাআলাও ইহুদী আলেমদের সম্পর্কে বলছেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ۰

> তোমরা অন্য লোকদের ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদের তোমরা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করছ, তোমাদের বুদ্ধি কি কোন কাজেই লাগাও না? —সূরা বাকারা ঃ ৪৪

অনন্তর বাতেনী রোগের তীব্রতা ও দুর্বলতার দিক থেকেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ যে পর্যায়ে থাকে শেষ পর্যায়ে তা সেই অবস্থায় থাকে না। অধিকন্তু কতগুলো রোগ তো মহামারীর আকার ধারণ করে এবং তা গোটা মানবসত্তাকে প্রভাবিত করে ফেলে। আর কতিপয় রোগ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার বলেছে যে, আত্মিক রোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংক্রামক রোগ হচ্ছে—যা জৈবিক শক্তিকে উত্তেজিত করার

কারণ হয়ে থাকে। অথবা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যে ব্যাধি অহংবোধ অথবা হীনমন্যতার কারণ হয়ে থাক। জৈবিক শক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তা যেনা ব্যভিচার, পায়ুকাম, বিপথগামিতা, উন্মাদনা, অবৈধ প্রেম ইত্যাদির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অহংবোধের রোগ হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মপ্রশংসা এবং একগুঁয়েমির উন্মাদনা সৃষ্টি করে। হীনমন্যতার রোগ নীচতা, তোষামোদ এবং বহুরূপী স্বভাব সৃষ্টি করে। আবার কখনো হীনমন্যতাবোধ গর্ব-অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষমূলক প্রবণতার প্রতিপালন করে থাকে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ইসলাম আত্মাকে ইবাদতে মশগুল রাখে এবং এভাবে তাকে যাবতীয় রোগ থেকে নিরাপদ রাখে, আর যদি এই রোগ আক্রমণ করে থাকে তাহলে এর প্রভাবকে দূর করে দেয়। তা অবিরতভাবে আত্মার চিকিৎসা করতে থাকে এবং একে রোগমুক্ত করে ছাড়ে অথবা এর কাছাকাছি নিয়ে আসে। অর্থাৎ মানুষ যতটা চেষ্টা সাধনা করে এবং নিজেকে প্রশিক্ষণে ব্যস্ত রাখে সে ততই রোগমুক্ত হতে থাকে।

আমরা অপরাধের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানি না। এর কতগুলো বাহ্যিক রূপই আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এজন্য আমরা এ সম্পর্কে কোন সাধারণ নির্দেশ দান করতে পারি না। আমরা এ পার্থিব জগতে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন পন্থা সম্পর্কে বলতে পারি যে, এটা ঈমান অথবা ফিসক অথবা কুফর। কিন্তু আখেরাতে কার কি অবস্থা হবে এ সম্পর্কেই কেবল আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন। অপরাধীদের চিরকাল দোযখে অবস্থান অথবা তাদের অপরাধের আংশিক মাফ হয়ে যাওয়া, অথবা কারো একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার ব্যাপারটি যে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট—আমরা ইতিপূর্বে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আমরা এ ব্যাপারে বিতর্ক যুদ্ধ, কূটতর্ক বা পূর্বকালের তর্কশাস্ত্রের কোন গুরুত্ব দেই না। এ বিষয়ের উপর উস্তাদ ইসমাঈল হামদী ব্যাপক আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি ঃ

আদল হচ্ছে একটি মৌল জিনিস। শাস্তি হচ্ছে তার একটি অংশ। অতএব এ দুটি জিনিসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু কোন্ অপরাধীর সাথে পূর্ণ আদল

ও ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবহার করা হবে ? কোন্ অপরাধীর সাথে আদল এবং অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করা হবে ? কোন্ অপরাধীকে রুগ্ন বিবেচনা করে একান্ত দয়ার্দ্র ব্যবহার করা হবে ? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা আত্মার অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার তুলনায় অসংখ্য ভাগে বিভক্ত। চেতনা ও সংকল্পই এই পার্থক্যের ভিত্তি।

এক ব্যক্তি পূর্ণ চেতনা ও সংকল্পের সাথে অপরাধে লিপ্ত হয়। সে এর ফলাফল সম্পর্কে অবহিত। সে ইচ্ছা করলে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু সে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার জন্য উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে, পরিবেশকে অনুকূল বানায় এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য তৈরি থাকে।

আরেক ব্যক্তির উপর ক্রোধ অথবা ভালবাসা অথবা স্বজনপ্রীতির ভূত সওয়ার হয়ে বসে, অথবা অন্য কোন ধরনের আবেগ-উত্তেজনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অতঃপর সে একটি উন্মাদের মত অথবা বুদ্ধিজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির মত অপরাধের গর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এই দুই ধরনের অপরাধীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

তৃতীয় এক ব্যক্তির সামনে রিযিকের সব দরজা বন্ধ। সে দু'মুঠো খাবারের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। এক সময় তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং সে চুরিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

অথবা কোন ব্যক্তি উত্তম প্রতিপালন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উপায় উপকরণ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এ কারণে সে বিপথগামী হয়ে পড়ে। এ কথা পরিষ্কার যে, এই ধরনের অপরাধী এবং প্রথমোক্ত দুই ধরনের অপরাধীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমাদের একথা বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, এদের প্রত্যেকে কিরূপ ব্যবহার পাবার অধিকারী হবে। কারণ ব্যাপারটি পরিষ্কার।

মানবীয় সিদ্ধান্তও কখনো এটা অস্বীকার করতে পারে না যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ অনুগ্রহ পাবার অধিকারী, তাকে পূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই উচিত। আর যে ব্যক্তি কেবল ইনসাফ পাবার অধিকারী তার সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করাই উচিত। আর যে ব্যক্তি ইনসাফ এবং অনুগ্রহ উভয়টিই পাবার হকদার তাকে তা-ই দেওয়া

উচিত। কেননা আইন প্রণয়নকারীই হোক অথবা বিচারকই হোক—আইন প্রণয়ন অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় তারা মূক-অন্ধ-বধির মেশিন মাত্র নয়। তারাও মানুষ, মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে এবং সেই গুণের মাধ্যমে তারা পথ নির্দেশ পেতে পারে। যারা আইন প্রণয়ন করে অথবা যারা রায় প্রদান করে তাদের মধ্যে অবশ্যই সেই গুণাবলী বর্তমান রয়েছে। বরং তারা সাধারণ মানবীয় স্তর থেকে অনেক উন্নত হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে আদল, ইনসাফ, পবিত্র মনোবৃত্তি, দয়া-অনুগ্রহ, ব্যক্তির মন-মানসিকতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুধাবন ক্ষমতা ইত্যাকার যেসব গুণ রয়েছে তা অত্যন্ত উন্নতমানের বৈশিষ্ট্য।

কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তাআলার যে গুণাবলী বর্ণনা করে তা সর্বোত্তম গুণ বৈশিষ্ট্য। যেমন তিনি গোটা সৃষ্টিকুল সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, পূর্ণরূপে ইনসাফ করেন, বান্দাকেও অনুরূপ ইনসাফ করার নির্দেশ দেন, তাঁর অনুগ্রহ সীমাহীন, তিনি ক্ষমা ও উদারতার ভাণ্ডার এবং দয়া ও অনুগ্রহের সাগর। এগুলো কোন নিষ্প্রাণ, শীতল অথবা নেতিবাচক গুণ নয়। তা কেবল দুনিয়ার জীবনের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে এটাই আমাদের ধারণা। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে কখনো স্থবিরতা বা শূন্যতা থাকতে পারে না। এর ঝর্ণাধারা কখনো শুকিয়ে যেতে পারে না, তার ধারবাহিকতা কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, তা দুনিয়া এবং আখেরাতকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। আল্লাহ্ তাআলা যে আইন-বিধান রচনা করেছেন এবং লোকদের মাঝে যে ফয়সালা দান করেন তার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

যে অবস্থা ও পরিবেশ নম্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ আদায়ের দাবি রাখে এবং যেসব কারণ ও অনুপ্রেরণা বিচারকের মধ্যে সহানুভূতিশীল ডাক্তারের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে এবং তা মানবসমাজে যেরূপ বিবেচনাযোগ্য হয়ে থাকে—আল্লাহ্‌র দরবারেও তা বিবেচনাযোগ্য হবে। আল্লাহ্ তাআলা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় দয়ালু। তিনি তো সহানুভূতি ও রহমতের উৎস এবং দয়া ও অনুগ্রহের সাগর। আসমান-যমীনের সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস তিনিই।

যাই হোক, ঈমান থেকে আমল বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যেমন সূর্য থেকে আলো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কখনো অর্ধ দিবস অতিবাহিত হয়ে যায়, ঘন মেঘ এসে আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু তারপরও দিন দিনই থেকে যায়। তা রাত হয়ে যায় না। কেননা এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, স্থায়ী ব্যাপার নয়। ভোরবেলা রাতের অন্ধকার দূর হয়ে যায়, সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ে এবং আলো ও গরমে সারা দুনিয়া পরিপূর্ণ করে দেয়।

ঈমানের নূরেরও এই একই অবস্থা। কিছু সময়ের জন্য সাময়িক লালসার মেঘ ছেয়ে যায়, অন্তরের কোণগুলো অন্ধকার হয়ে যায়, একজন মুমিনের সঠিক রাস্তা নজরে পড়ে না, তারপরও ঈমান তার নিজের কাজ করে যায় এবং তার অবস্থান হয় যা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝

> প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী তাদের অবস্থা এই যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোন খারাপ খেয়াল তাদের স্পর্শ করলেও তারা সাথে সাথে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য কল্যাণকর পথ পন্থা কি তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। —সূরা আরাফ ঃ ২০১

অনবরত অপরাধ এবং অপরাধের ঘন অন্ধকার তখনই হয় যখন কুফরের রাত তাঁবু গেড়ে বসে, ঈমানের সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, অপরাধী দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং এখন তার সৎপথ পাবার আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ أَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ أَعْمٰى وَأَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

> আর যারা এই দুনিয়ায় অন্ধ হয়েছিল তারা আখেরাতেও অন্ধ হয়ে থাকবে। বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে এরা অন্ধের চেয়েও অধিক ব্যর্থকাম। —সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭২

যেসব লোক নাজাত পেতে চায় তাদের ভূমিকা আমাদের আদি পিতা আদম আলায়হিস সালামের মতই হয়ে থাকে—"অপরাধ এবং সাথে সাথে তওবা।" আর যারা ধ্বংস হতে চায় তাদের ভূমিকা অভিশপ্ত শয়তানের অনুরূপ হয়ে থাকে—"অপরাধ এবং এজন্য অনুতপ্ত হতে অস্বীকৃতি।"

এখন তোমার যে পথ পছন্দ হয় তা বেছে নাও। একথাও মনে রেখ, আখেরাতে মানতিক বা যুক্তিশাস্ত্রের মারপ্যাচ কোন কাজে আসবে না। সেখানে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতের সাথে আর হাসিঠাট্টা চলবে না। সেখানে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে এবং হিসাব গ্রহণকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا .

হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। — সূরা নিসা ঃ ৬

অনভিপ্রেত বিরোধ

নিষ্ঠাবান আলেমদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে এটা সাময়িকভাবে হওয়া উচিত, তা স্থায়ী ও দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়। মতবিরোধ সৃষ্টি হবে এবং শেষ হয়ে যাবে। যদি সে বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে এটা যেন কোনক্রমেই অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করতে না পারে।

যদি এ ধরনের কিছু ঘটে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাতে বাইরের কোন প্রভাব থেকে থাকবে অথবা তাতে অজ্ঞতার দখল থাকবে অথবা ইন্দ্রিয় লালসার মলিনতা থাকবে অথবা এ দু'টোরই প্রভাব থাকবে। আমরা অসংখ্য মতবিরোধের মূল্যায়ন করে দেখেছি যে, এর গভীরে এমন সব জিনিস রয়েছে যা নির্মল জ্ঞান, অনুসন্ধান এবং সত্যপ্রীতির একদম পরিপন্থী।

যদি জৈবিক লালসার অপমৃত্যু ঘটত, আত্মম্ভরিতার পরিসমাপ্তি ঘটত, কোন মতবাদের সমর্থন অথবা কোন মাযহাবের প্রচারের পেছনে অন্য যেসব উদ্দেশ্য থেকে থাকে তা খতম হয়ে যেত—তাহলে শত শত ফেরকা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই মরে যেত, প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই ম্লান হয়ে যেত। অথবা অন্তত কিতাবের পাতায় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকায় সীমাবদ্ধ থাকত। স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয়ে থাকে। বিভিন্ন মত সামনে আসে। কিন্তু তার শোরগোল আলোচনার বৈঠক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। আলোচনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত হট্টগোল শেষ হয়ে যায়।

জ্ঞানের প্রশস্ততা চিন্তাচেতনায় ব্যাপকতার জন্ম দেয়, সৎ উদ্দেশ্য উদার মনের অধিকারী বানায় এবং খাঁটি ঈমান উম্মাতের ঐক্য ও এককেন্দ্রিকতাকে

সযত্নে সংরক্ষণ করে। অতঃপর যে দীন এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তির প্রশ্ন উঠতে পারে কি ?

এজন্য নবুয়াত যুগে যেসব লোক ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার গোলাম এবং বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার আকাঙ্খী ছিল, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসূলকে তাদের সাথে সম্পর্কহীন ঘোষণা করেন এবং বলে দেন, তাদের সাথে আপনারও কোন সম্পর্ক নেই এবং আপনার সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। একদিন তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হতে হবে—যিনি অন্তরের অন্তস্থলের খবরও রাখেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ .

যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে নিশ্চয়ই তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণত আল্লাহ্‌র উপরই সোপর্দ রয়েছে। তারা যা কিছু করছিল সে সম্পর্কে তিনি তাদের অবহিত করবেন।

—সূরা আনআম ঃ ১৫৯

তুমি প্রশ্ন তুলতে পার, মুসলমানরাও তো অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ? তারা শত শত বছর ধরে এই বিরোধের আগুনে ফুঁ দিয়ে আসছে। আপনি যে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন তা যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এদের অবস্থাটা কি দাঁড়ায় ? আমার জবাব হচ্ছে, যেসব লোক হকের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে—যদি হকের কাঁচি তাদেরকে ছেঁটে ফেলে দেয়, তাহলে এতে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। কেননা যেসব রায় ও মতবিরোধকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে যেসব ফেরকার আত্ম-প্রকাশ ঘটে—এ ধরনের মতবিরোধ ফিক্‌হবিদ সাহাবীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তাদের সমাজেও এর চর্চা হত ঠিকই, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থান করে। এ কারণে তাদের সমাজ-পরিবেশে কোন সংঘাত সৃষ্টি হতে পারেনি।

আল্লাহ্‌র দীদার প্রসঙ্গ

যেমন আখেরাতে আল্লাহ্ তায়ালার দর্শনলাভ। অর্থাৎ আখেরাতে আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন লাভ করা যাবে কি-না ? এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুতাযিলা ও আহলে সুন্নাতের মধ্যে চরম বিরোধ চলে আসছে। উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে অনেক কাদা ছুড়েছে। জনসভা, রাস্তাঘাট ও বাজার সর্বত্রই বিরোধের সয়লাব বইয়ে দিয়েছে। অথচ এ প্রশ্নটি প্রথম যুগেও উত্থাপিত হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনাও হয়েছে। অতঃপর তা খতম হয়ে যায়। মনের আয়নায় এর কোন প্রতিফলন হয়নি। পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পূর্ববৎ কায়েম থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যসব সাহাবী আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের প্রবক্তা ছিলেন। তাদের এ মতের সমর্থনে তাদের কাছে দলীল-প্রমাণও ছিল। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَبَّهٗ لَيْلَةً عُرِجَ بِهٖ ٠

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে তাঁর রবের দর্শন লাভ করেন।

অপরদিকে হযরত আয়েশা (রা) বলতেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেননি। মাসরূক (রহঃ) বলেন ঃ

قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا اُمَّاهْ هَلْ رَاٰى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهٗ؟ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرُ رَاْسِىْ مِمَّا قُلْتَ اَيْنَ اَنْتَ مِنْ ثَلٰثٍ؟ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ ٠ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهٗ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ : لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ٠ " وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ٠ " وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهٗ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ :

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَا ذَاتَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ" . وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ اَمْرًا فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ : يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ . " وَلٰكِنَّهٗ رَاٰى جِبْرِيْلَ فِىْ صُوْرَتِهٖ مَرَّتَيْنِ .

আমি আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম, হে আম্মাজান! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর রবকে দেখেছেন ? তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার শরীরের পশম কাটা দিয়ে উঠেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও ? এই তিনটি কথার কোন একটি কেউ তোমাকে বললে সে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি তোমাকে বলে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন, সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। বরং তিনিই সব দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।
—সূরা আনআম ঃ ১০৩

কোন মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ্ তাঁর সামনাসামনি কথা বলবেন। এবং তাঁর কথা হয় ওহী (ইশারা)-রূপে হয়ে থাকে, অথবা পর্দার আড়াল থেকে। —সূরা শূরা ঃ ৫১

আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে, আগামী কাল কি হবে বা না হবে তা তিনি (নবী) জানেন, তাহলে সে মিথ্যা কথা বলেছে। অতঃপর তিনি (আয়েশা) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

কোন ব্যক্তিই জানে না সে আগামী কাল কি করবে এবং কোন ব্যক্তিই জানে না সে কোথায় মারা যাবে। —সূরা লোকমান ঃ ৩৪

আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে, তিনি (নবী) কোন কথা গোপন রেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যা কথা বলেছে। অতঃপর তিনি (আয়েশা) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

হে রসূল ! তোমার নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার সবটাই তুমি লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। যদি তা না কর তাহলে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব তুমি আদায় করলে না।

—সূরা মাইদা ঃ ৬৭

আয়েশা (রাঃ) বলেন, কিন্তু তিনি জিবরীলকে তাঁর নিজস্ব অবয়বে দু'বার দেখেছেন। —বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, তৌহীদ, বাদউল খালক; মুসলিম, তিরমিযী।

তিরমিযীর বর্ণনায় আরো আছে ঃ

وكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْظِرِيْنِي وَلاَ تَعْجِلِيْنِي أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى. " وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ" ؟ قَالَتْ أَنَا وَاللّٰهِ أَوَّلُ مَنْ سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذَا. قَالَ إِنَّمَا ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ مَا رَأَيْتُهُ فِي الصُّوْرَةِ الَّتِيْ خُلِقَ فِيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عُظْمَ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

(মাসরূক বলেন) আমি হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। (তাঁর কথা শুনে) সোজা হয়ে বসে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন ! আমাকের সুযোগ দিন এবং তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ্ তায়ালা কি বলেননি ঃ নিশ্চয়ই মুহাম্মদ তাঁকে পুনর্বার দেখেছে—(সূরা নাজম ঃ ১৩) এবং সে সেই পয়গাম বাহককে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে—(সুরা তাকবীর ঃ ২৩) ? আয়েশা (রাঃ) বললেন আল্লাহ্‌র শপথ। এ ব্যাপারে আমিই সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন, এসব, আয়াতে দেখার অর্থ হচ্ছে জিবরাঈলকে দেখা। জিবরাইলকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই আকৃতিতে তাকে ঐ

দু'বারই আমি দেখেছি। আমি তাকে আসমান থেকে অবতরণ করার সময় দেখেছি, তার দেহের পরিধি আসমান যমীনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে ফেলেছে।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَئَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ ؟

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন ? তিনি বললেন, তিনি তো নূর, তাঁকে আমি কি করে দেখব ?

—মুসলিম ঃ ঈমান, নাসাঈ ঃ যাকাত, ইবনে মাজাহ্ ঃ যুহদ

সাহাবাদের পরস্পর বিরোধী এই মতামতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কোন কঠিন কাজ নয়। এসব রায় এবং উল্লিখিত হাদীসসমূহ সাহাবাদের সামনেই ছিল। কিন্তু এ নিয়ে তাঁরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করতেন না, নিজেদের চিন্তাশক্তি ব্যয় করতেন না, সাধারণ লোকেরাও এর ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হত না এবং বিশিষ্ট লোকেরাও এ নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত হত না। এরপর শুরু হল বিচ্ছিন্নতা ও অবনতির যুগ। বিভিন্ন ফেরকার আত্মপ্রকাশ ঘটল। তারা ফেরকাগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এসব বিরোধকে কাঁপিয়ে তুলল এবং এটাকেই নিজেদের পেশা বানিয়ে নিল।

মুমিন হত্যা প্রসঙ্গ

মুমিন ব্যক্তিকে হত্যার প্রসঙ্গটিও উদাহরণ হিসেবে আনা যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, যায়দ ইব্ন সাবিত ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে তার তওবা কবুল হবে না। তারা নিম্নের আয়াত নিজেদের মতে সপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম; তাতে সে চিরদিন থাকবে। তার উপর আল্লাহ্র গযব ও অভিসম্পাত ; এবং তিনি তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। —সূরা নিসা ঃ ৯৩

হযরত সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রহ) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে তার তওবা কি কবুল হবে ? তিনি বললেন, না। আমি সূরা ফুরকানের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করলাম ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ الٰـهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ۔ اِلاَّ مَنْ تَابَ ۔

যারা (দয়াময় রহমানের বান্দাগণ) আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে মাবুদ ডাকে না, আল্লাহ্র হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে ধ্বংস করে না এবং যেনায় লিপ্ত হয় না। যারা এসব কাজে লিপ্ত হবে তারা নিজেদের গুনাহের প্রতিফল পাবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে অব্যাহত শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতেই তারা লাঞ্ছনা সহকারে পড়ে থাকবে, কিন্তু যারা তওবা করেছে তারা ব্যতীত। —সূরা ফুরকান ঃ ৬৮ -৭০

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "এটা মক্কায় নাযিলকৃত আয়াত। মদীনায় নাযিল হওয়া আয়াত এটাকে মানসূখ (রহিত) করে দিয়েছে।"

এ সম্পর্কে আরো একটি মত এই যে, "ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেসব লোক উল্লিখিত গুনাহে লিপ্ত হয়েছে—সূরা ফুরকানের এ আয়াত তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট।"

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে ভালভাবে বুঝে নিয়েছে, অতঃপর হত্যার অপরাধ করেছে—তার তওবা কবুল হওয়ার কোন সুযোগ নেই।"

হযরত যায়দ (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অবশিষ্ট সব সাহাবার মতে হত্যাকারীর জন্যও তওবার সুযোগ আছে। কেননা হত্যাকাণ্ড কুফরীর চেয়ে মারাত্মক অপরাধ তো নয়। অতএব কুফরীর গুনাহ্ ক্ষমার যোগ্য হলে হত্যার গুনাহ কেন ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না ? যদি কাফিরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দরজা খোলা থাকতে পারে, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ‎.

হে রাসূল ! এই কাফিরদের বল ? এখনো যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে যা কিছু হয়েছে তা মাফ করে দেওয়া হবে।

—সূরা আনফাল ঃ ৩৮

তাহলে হত্যাকারীর জন্য তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবার কোন কারণ থাকতে পারে না।

দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য হওয়াটা মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার। এতে এবং এ ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে সাহাবীদের রায় বিভিন্ন রূপ ছিল। কিন্তু এই মতবিরোধ তাদের সমাজে কোন শোরগোল সৃষ্টি করতে পারেনি। তাদের জীবনকে কলুষিত করতে পারেনি এবং এসব ব্যাপারে কখনো দীর্ঘ বিতর্কও হয়নি।

অবশ্য যখন ইলম ও ইখলাসের ঝর্ণাধারা শুকিয়ে যায়, ঈমান ও তাকওয়ার আলোকবর্তিকা নিভে যায় এবং অপরিচিত মুখ ময়দানে এসে যায় তখন মতবিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

জ্ঞান, নিষ্ঠা এবং ঈমানের সম্পর্ক যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সরকারী ক্ষমতা লিপ্সা, রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি এবং শাসকগোষ্ঠীর অসঙ্গত কার্যকলাপের অনুপ্রবেশ ঘটে। তখন জিরা গম্বুজের রূপ নেয় এবং সরিষার দানা পাহাড়ে পরিণত হয়। এ সময় কিছু সংখ্যক লোকের এক জায়গায় বসে নিশ্চিন্ত মনে

এবং গুরুত্বসহকারে চিন্তা-ভাবনা করা, কোন বিরোধের সার্বিক দিকের উপর মত বিনিময় করা আর সম্ভব হয়ে উঠে না। বরং এ সময় যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির হাতিয়ার আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত থাকে, যে দিকেই তাকাবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অসহনশীলতার দৃশ্যই নজরে পড়বে।

এসব মতবিরোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি হয় এবং নিকৃষ্ট রাজনৈতিক চক্রান্তে তা আরো ব্যাপক হতে থাকে। অতঃপর কালের প্রবাহে এসব ফেরকার অপমৃত্যু ঘটল এবং আজ মুসলমানদের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকল না। কিন্তু একটি বিরোধের এখনো কোন সুরাহা হয়নি এবং নিকৃষ্ট রাজনৈতিক চক্রান্ত তার সমাধান হতে দিচ্ছে না। তা হচ্ছে শিয়া-সুন্নী বিরোধ।

আকায়েদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাও নির্বাপিত হয়ে গেছে। কতগুলো খুঁটিনাটি বিষয়েও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা তার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি। অতএব আজ যদি তুমি অনুসন্ধানে লেগে যাও যে, শেষ পর্যন্ত কোন জিনিস মুসলমানদের শীয়া-সুন্নী নামে পরস্পর বিরোধী ও শত্রুভাবাপন্ন দুটি শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছে— তাহলে হয়রান হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হবে। কেননা তুমি মতবিরোধের বিশেষ কোন উপাদান খুঁজে পাবে না।

ধ্বংস হোক ফেরকাগত গোঁড়ামির, দলীয় স্বার্থের এবং ধোঁকাবাজ নেতৃত্বের নিচ মানসিকতার। এসব উপাদানই এই মতবিরোধের পরিসমাপ্তি হতে দিচ্ছে না। তাদের আকাংখা হচ্ছে, উম্মাতের মধ্যে এই মতভেদ আবহমান কাল ধরে চলতে থাকুক এবং এর ছত্রছায়ায় অরাও জীবিত থাকুক।

তুমি হয়ত শুনে থাকবে, ইটালীতে এককালে একটি দল এ্যানটোনিয়াস *(Antoniuis)* ও ক্লিওপেট্রার *(Cleopatua)* সমর্থন করত এবং অপর দলটি অকটোভিয়াসের *(Octovius)* সমর্থন করত। এটা ছিল সেই সুদূর অতীতের রাজনৈতিক খেলা। আজ যদি আবার সেই খেলা শুরু হয়ে যায়, তাহলে অতীতে যে তামাসা হয়েছে আজো তাই হবে। যে ছলচাতুরি ইতিহাসের পাতায় দাফন হয়ে আছে তা আজ আবার কাফন ছিড়ে বের হয়ে আসবে। আবার কতিপয় দলের আবির্ভাব ঘটবে—যারা এই বিশ শতকে পুরনো দিনের সেই যখমকে তাজা করে তুলবে এবং তার প্রভাবাধীনে নব্য ইটালীর প্রশাসন চালাবে।

বাস্তবিকই যদি এরূপ হয় তাহলে সে জাতি সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত কি হতে পারে ?

এসব লোকের উদ্দেশ্যও তাই এরা খিলাফতের প্রশ্নে মুসলমানদের নব্য বংশধরদের জটিলতার শিকারে পরিণত করতে চায়। আজ চৌদ্দশত বছর অতীত হওয়ার পরও তারা এই প্রশ্ন তুলতে চায় যে, খিলাফতের জন্য অধিকতর যোগ্য কে ছিল? তারা এই প্রশ্নের সমাধান এমন লোকদের দিয়ে করাচ্ছে যারা আপাতত এ সমস্যার সাথে পরিচিত নয়। মুসলমানরা আজ এই অনর্থক কাজ করছে। তারা নিজেদের বর্তমান জীবনের ভিত্তি অতীতের পুরোনো মতবিরোধের অবাঞ্ছিত স্মৃতি বিজড়িত আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার উপর স্থাপন করতে চায়।

যে কুটিল রাজনীতি হাজারো ফেরকার জন্ম দিয়েছিল এবং নিজের কোলে লালন-পালন করেছিল তা ঐ রাজনীতির অপমৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়ার পাতা থেকে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানেও বিষাক্ত রাজনীতি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করছে, যেন তারা ইসলামের পতাকাবাহীদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করতে পারে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে। কিভাবে ? কতগুলো অলিক ধারণা-বিশ্বাসকে পুঁজি করে।

আমি দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী সব মুসলমানকে সতর্ক করে দিতে চাই— তারা যেন কুরআন ও হাদীসের সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন না করে। তারা যেন স্বার্থের দাস ও লালসার প্রতিভূদের এমন সুযোগ করে না দেয় যাতে তারা মতবিরোধকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে, নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে ব্যবহার করতে পারে এবং লেলিহান শিখায় আমাদের সম্পর্কের পরিচ্ছদকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধূলায় লুটিয়ে দিতে পারে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা এই সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য জোর দিয়েছেন। আমাদের অতীত আমাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের পুস্তক স্বরূপ এবং বর্তমান কাল শিক্ষা গ্রহণের পুঁজি।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ·

এই ইতিহাসে অত্যন্ত শিক্ষামূলক উপদেশ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যার অন্তর আছে অথবা যে কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনে। —সূরা কাফ ঃ ৩৭

৮

রিসালাত

নবুয়াত ও দর্শন

মহান ও উন্নত পর্যায়ের জ্ঞানের কিছু নির্দিষ্ট উৎস রয়েছে যা ছাড়া অন্য কোন উৎসের উপর আস্থা আনা যায় না। যদি মানবীয় জ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তা অংকশাস্ত্র অথবা বিজ্ঞানের নির্ধারিত মূলনীতি থেকে গৃহীত হতে হবে। যেমন বর্তমান যুগে আমরা জীবন ও জগতের সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, অথবা যে জ্ঞান জড় পদার্থের ধরন ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত অথবা মানবীয় জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট—তার বেলায় দেখতে পাই।

কিন্তু যদি এই জ্ঞান আধিভৌতিক উপাদানের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে যা বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্রের আওতা বহির্ভূত, তা হলেও এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার একটি উপায় আছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ওহী। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ওহী ছাড়া আর কোন কিছুকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ্‌র গুণাবলী এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কে যত কথাই বলা হোক না কেন—এর মধ্যে কেবল নবী-রসূলদের সূত্র থেকে পাওয়া কথাই আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি কোন নবীর সপক্ষে পরিষ্কার দলীল-প্রমাণ পাওয়া যায় যা তাঁর সত্যতা প্রমাণ করে—তাহলে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য জিনিসের মর্যাদা লাভ করবে এবং এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগ বাকি থাকবে না।

হাজার হাজার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থ ও আধিভৌতিক পদার্থ সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে অভিমত ব্যক্ত করে আসছেন। তারা আমাদের জন্য যে মূলধন রেখে গেছেন তা সঠিক ও রুগ্ন এবং শুষ্ক ও আর্দ্রতার সংমিশ্রণ ছাড়া আর

কিছুই নয়। বিশেষজ্ঞগণ এ নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পান যে, এর কিছু জিনিস নির্ভুল কিন্তু অবশিষ্ট সবই ভ্রান্ত। নির্বিবাদে বলা যায়, আধিভৌতিক বিষয় বা অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পর্কে যত অভিমত রয়েছে—চাই তা প্রাচীনপন্থীদের হোক অথবা আধুনিকপন্থীদের—তার মধ্যে সত্যতার উপাদান খুবই নগণ্য। কেননা আল্লাহ্‌র ওহীর সাথে তার কোন মিল নেই। এর অবস্থা এই যে, তা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী এবং হাস্যকর বক্তব্যে পরিপূর্ণ।

ইখওয়ানুস সাফা বলেন, "যত নবী-রসূল অতীত হয়ে গেছেন, তাদের পরস্পরের মধ্যে সময়ের যত বড় ব্যবধানই থাক, যুগের ব্যবধান, ভাষার পার্থক্য, শরীয়াতের পার্থক্য যতই থাক না কেন—তাঁরা মানবজাতির সামনে যে দাওয়াত পেশ করেছিলেন—তা ছিল এক ও অভিন্ন। তাদের প্রাণসত্তা, মন-মানসিকতা ও উদ্দেশ্য—লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ এক।

"দার্শনিকদের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্নতর। তাদের এখানে কোন বিষয়েই ঐকমত্য নেই, তাদের কর্মপ্রস্থা ধর্ম, অভিমত,বক্তব্য সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে বিরোধ। তারা নিজেদের অনুসারীদের এমন অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে যে, তা থেকে মুক্তি লাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

"অতএব কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি দার্শনিকদের কথাবার্তাকে কি করে অগ্রাধিকার দিতে পারে ? অথচ তাদের মধ্যেকার মতবিরোধ এত চরমে পৌছেছে, যেন মনে হয় একে অপরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে। নবীদের আনীত আসমানী কিতাবসমূহ উপেক্ষা করা এবং এর উপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা না করা তাদের জন্য কি করে সম্ভব হতে পারে ? অথচ তার শিক্ষা একই এবং পরস্পরের সাথে এক সূত্রে গ্রথিত।

"অধিকাংশ দার্শনিকের বাস্তব সত্য পর্যন্ত না পৌছতে পারার কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহ্‌র ওহী ও আসমানী কিতাবসমূহের সাথে অপরিচিত রয়ে গেছেন। তারা এসব কিতাব কখনো পাঠ করেননি এ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি সে পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়নি।"

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। জড়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা কম শোচনীয় নয়। পরবর্তী কালে বিজ্ঞান যখন পরীক্ষা-

নিরীক্ষা শুরু করে দেয় এব অতি সূক্ষভাবে প্রতিটি জিনিস পরখ হতে থাকে, তখন প্রাচীন দর্শন নিজের সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। তার অধিকাংশ দাবি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

সত্য কথা এই যে, চিন্তাবিদদের অধিকাংশ চিন্তা, দার্শনিকদের অধিকাংশ রায় এবং সাহিত্যিকদের অধিকাংশ বক্তব্যের পেছনে বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। এ সবের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যেমন কোন কবি তার কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়ায়। অথচ বলা যায়, এগুলো কতিপয় লোকের আত্মিক অনুভূতি অথবা জীবনের বিভিন্ন বিধান—যা কেবল এভাবেই সমর্থন করা যেতে পারে যে, তা কতিপয় লোকের ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতার সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তাকে সাধারণ আকীদা-বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। মানব মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানের এই শাখার ফলাফলের মধ্যে এত মারাত্মক সংঘর্ষ বিদ্যমান রয়েছে যে, এটাকে আমরা এর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতে পারি না।

আমরা যদি ব্রাহ্মণ্যবাদী, খৃস্টবাদী ও গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন করি এবং প্রতিটি যুগে এর মধ্যে যে পরিবর্তন হতে থাকে তার মূল্যায়ন করি, তাহলে এটাকে কোন যুগেই একটি গোপন সত্যের ব্যর্থ অনুসন্ধানের অধিক কিছু মনে করা যায় না। অনেক কাল্পনিক কথা ধরে নেওয়া হয়েছে—বাস্তবতার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। এ এক অজ্ঞাত ভ্রমণ। তা কোন একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না। একদিকে দর্শনের এই গোলক ধাঁধা, অন্যদিকে ওহীর সাহায্যে পেশকৃত সুনির্দিষ্ট মূলনীতি, পরিষ্কার ধ্যান-ধারণা ও উজ্জ্বল আকীদা-বিশ্বাস। তা এত সহজ পন্থায় ও বোধগম্য উপায়ে পেশ করা হয়েছে, যেন ফলিত বিজ্ঞানের বুনিয়াদি মূলনীতি।

আমরা পূর্বে বলে এসেছি, কেবল সেই পার্থিব জ্ঞানই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য—যা হবে বিজ্ঞানসম্মত। অনুরূপভাবে কেবল সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও মূল্যবান বিবেচিত হবে না যা কোন নবীর মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি, যার সত্যতা সম্পর্কে আমরা যেকোন দিক থেকে সুনিশ্চিত। এ সময় তা আমাদের অন্তর ও চিন্তাচেতনায় যে আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বীজ বপন করবে এবং ব্যক্তি ও সমাজকে যে নকশার উপর নির্মাণ করবে- সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারব। কেননা আমরা ঈমান এনেছি যে,

এই রূহানী জ্ঞান আল্লাহ্‌ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এসেছে এবং আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে যা কিছু আসে তা সবই সত্য। এছাড়া যা কিছু তা সবই অলিক ধারণা-কল্পনা। তা গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে ভিত্তিহীন কল্পনার অনুসারী হওয়া। নিশ্চিত জিনিসকে পরিত্যাগ করে কোন ধারণা-কল্পনার পেছনে ছুটে বেড়ানোর অনুমতি ইসলামে নেই।

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً ۔

এমন কোন জিনিসের পেছনে লেগে যেও না যে বিষয়ের জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চিত যেন-চোখ, কান ও অন্তর সবকিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। —সূরা ইসরা ঃ ৩৬

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۔ فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۔ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۔

এ ব্যাপারে তাদের কিছুই জানা নেই। তারা নিছক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করছে। আর সত্যের সাথে ধারণা-অনুমানের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব যে লোক আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বৈষয়িক জীবন ছাড়া যার আর লক্ষ্য নেই তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। তাদের জ্ঞানের দৌড় শুধু এই পর্যন্তই।

—সূরা নাজম ঃ ২৮-৩০

ওহী

নবীদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ওহী। আদম সন্তানদের মধ্যে তাঁরা সবচেয়ে সম্মানিত এবং পূত-পবিত্র মানুষ। ঐশী শক্তি প্রথম থেকেই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাদেরকে মানবীয় স্বভাবের কদর্যতা থেকে সুরক্ষিত রাখে, তাদেরকে উন্নতি ও পূর্ণতার স্তরসমূহ অতিক্রম করার এবং তাদের অন্তরকে এমনভাবে

প্রশিক্ষণ দেয় যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ তাঁর দরবার থেকে যে পয়গাম নিয়ে আসেন তা ধারণ করতে তাঁরা সক্ষম হন।

অতএব তাদের মুখ দিয়ে হিকমতে পরিপূর্ণ বাক্য নির্গত হয় এবং তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে উত্তম আদর্শের নমুনা ফুটে উঠে। কথা হোক, চিন্তা-চেতনা হোক সবকিছুর মধ্য দিয়ে পবিত্রতার আবে কাওসার প্রবাহিত হয়।

যে ওহীর বদৌলতে আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তর জ্ঞান ও মারিফাতের আলোকচ্ছটায় চকচক করে থাকে তার বিভিন্ন শ্রেণী এবং বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরকে সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়। সাধারণ মানুষের স্বপ্নের মত নবীদের স্বপ্নের মধ্যে অস্থিরতার কোন চিহ্ন থাকে না। সাধারণ মানুষ অর্থহীন ও অপবিত্র স্বপ্নও দেখে থাকে। মানবীয় পূর্ণতার দিক থেকে নবীগণ এত উন্নত পর্যায়ে অবস্থান করেন যে, তাদের দেহ ঘুমিয়ে পড়লেও হৃদয় সদা জাগ্রত থাকে। তাদের অন্তর খবর গ্রহণ করার জন্য টেলিপ্রিন্টারের মত সব সময় সজাগ ও সতর্ক থাকে। ফেরেশতা যা কিছু ঢেলে দেয় তাদের অন্তরে তা তাঁরা ধারণ করে নেন এবং সাথে সাথে মানুষের মধ্যে প্রচার করে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও প্রাথমিক পর্যায়ে সত্য স্বপ্ন দেখতেন ঃ

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فَكَانَ لاَيَرٰى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ·

প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী আসত তা ছিল স্বপ্নের আকারে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের শুভ্র রেখার মত প্রতীয়মান হয়ে সামনে আসত। —বুখারী

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হৃদয় আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত ছিল, শোয়া এবং জাগ্রত অবস্থায় এর মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হত না, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও শান্তি তাঁকে সর্বদা ঢেকে রেখেছিল। হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালামকে যবেহ করার জন্য হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম যে নির্দেশ লাভ করেন তা ওহীর মাধ্যমে এবং স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় লাভ করেন।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى.قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ·

সেই ছেলেটি যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার বয়স পযর্ন্ত পৌঁছল তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বলল, হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি বল, তোমার কি মত ? সে বলল, আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করুন। ইনশা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

—সূরা সাফফাত ঃ ১০২

অবশ্য বেশীর ভাগ ওহীই ইলহামের আকারে এসে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসে, নবীর কলবে ইলহাম করে, অন্তর তা সংরক্ষণ করে এবং মুখে তার প্রকাশ ঘটে। হাদীসসমূহে এ ধরনের ইলহামের বহু উদাহরণ রয়েছে। কখনো তাতে মাধ্যমেরও উল্লেখ থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ جِبْرِيْلُ نَفَثَ فِىْ رُوْحِىْ اَنَّهٗ لاَ تَمُوْتُ نَفْسٌ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَاِنْ اَبْطَاَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ ·

রব্বুল আলামীনের বার্তাবাহক জিবরাঈল আমার হৃদয়ে এই ইলহাম করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার বরাদ্দের রিযিক শেষ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অবশ্য রিযিক পেতে কখনো বিলম্ব হতে থাকলে আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক এবং তা অর্জনের জন্য উত্তম ও পছন্দীয় পন্থা অবলম্বন কর।[১]

---

১. ইবনে মাজার কিতাবুল বুয়ুতে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস রয়েছে।

আবার কখনো কখনো ফেরেশতার নাম উল্লেখ থাকে না, শুধু হাদীস বর্ণনা করে দেওয়া হয়। যেমন আমরা অন্যান্য রিওয়ায়াতে দেখতে পাই। কুরআনও নিজের শব্দ ভাণ্ডারসহ ওহীর আকারে নাযিল হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি এমন জ্ঞান লাভ করলেন যা তিনি জানতেন না। এতে জিবরাঈলের কোন দখল নেই। শুধু এতটুকু যে, তিনি আল্লাহ্‌র দরবার থেকে তা নিয়ে এসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে পৌছে দিতেন।

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۔

এটা নিয়ে তোমার কলবে আমানতদার রূহ্ নাযিল হয়েছে, যেন তুমি সেই লোকদের মধ্যে শামিল হতে পার, যারা (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সব মানুষের জন্য) সাবধানকারী, স্পষ্ট ও পরিষ্কার আরবী ভাষায়।

—সূরা শুআরা ঃ ১৯৩

আবার কখনো ওহীর ধরন এরূপ হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা সরাসরি কথা বলেন, মাঝখানে কোন মাধ্যম থাকে না। যেমন হযরত মুসা আলায়হিস সালামের সাথে কথা হয়েছিল ঃ

فَلَمَّا اَتَاهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَّامُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۔

সে যখন সেখানে পৌছল, প্রান্তরের ডান কিনারে অবস্থিত পবিত্র ভূখণ্ডে একটি গাছের আড়াল থেকে আওয়াজ উঠল ঃ হে মূসা ! আমি আল্লাহ্, সমগ্র বিশ্বের মালিক। তুমি নিজের লাঠি নিক্ষেপ কর।

—সূরা কাসাস ঃ ৩০-৩১

মিরাজ রজনীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও এই বিরল সম্মান লাভ করেন। একদল আলেমেরও এই মত। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীদের সাথে যে কথাবার্তা বলেন তার ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

এর ধরন আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলার ধরনের মত মোটেই নয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَايَشَاءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۔ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْاِيْمَانُ ۔

> কোন মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে সামনাসামনি কথা বলবেন। হয় তাঁর কথা ওহী (ইশারা)-রূপে হয়ে থাকে, অথবা পর্দার আড়াল থেকে, অথবা তিনি কোন পয়গাম বাহক পাঠান এবং সে তাঁর নির্দেশে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ওহী করে। তিনি মহান ও সুবিজ্ঞানী। আর এভাবে আমরা আমাদের প্রাণ সঞ্চারকারী নির্দেশের ওহী তোমার কাছে পাঠিয়েছি। তুমি কিছুই জানতে না কিতাব কাকে বলে এবং ঈমান কি জিনিস। —সুরা শূরা ঃ ৫১-৫২

ওহী এমন কোন জিনিস নয় যা জ্ঞানের পক্ষে অবোধগম্য এবং যা অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে জড়বাদীদের যে সংশয় সন্দেহ রয়েছে তা স্বয়ং ধূলোবালির মত উড়ে যায়—যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালা বর্তমান রয়েছেন, তাঁর অস্তিত্ব সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্বে এবং তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, তিনি নিজের কতিপয় বান্দাকে মানবজাতির কাছে তাঁর ওহী পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেছে নিতে পারেন, যারা তাঁর প্রতি বিদ্রোহী তাদের সঠিক পথ দেখাবেন এবং অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসবেন।

এই পৃথিবী একান্তভাবেই নবী-রাসূলদের মুখাপেক্ষী। মানবীয় চিন্তার সংকটকে যদি মানবীয় গবেষণা ও অনুসন্ধানের উপর ছেড়ে দেওয়া হত তাহলে মানুষ হেদায়েতের পথ থেকে বঞ্চিত থেকে যেত। তারা কখনো এমন একটি সত্যের উপর একত্র হতে পারত না, যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে পরিপাটি করতে পারে। আমরা যখন দুনিয়ার প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস অধ্যয়ন

করি তখন নবীদের আনীত শিক্ষা ছাড়া এমন কোন জিনিস আমাদের নজরে পড়ে না, যার আঁচলে মানুষ আশ্রয় নিতে পারে অথবা যার ছত্রছায়ায় কল্যাণ ও বরকত তালাশ করতে পারে।

নবীদের শিক্ষার এমন কিছু অংশ রয়েছে যার আবিষ্কার মানববুদ্ধির কক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেবল জ্ঞানবুদ্ধি তার দ্বারোদঘাটন করতে পারে না। তাদের শিক্ষার আর কিছু অংশ আছে—যে পর্যন্ত মানবজ্ঞান পৌছতে পারে বটে, কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার এক সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পর। অতঃপর মানবমস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান যতটুকু আবিষ্কার করতে পারে তা অস্পষ্টতার পর্যায়েই থেকে যায়। আমরা যা কিছু চিন্তা করি তার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি থেকে যায়। সর্বত্রই এর মধ্যে অপূর্ণতা ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

আমি মনে করি যদি আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসুল না আসতেন, তাঁরা যদি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত না করতেন তাহলে আমরা নিজেরাই এই মহান সত্তার অনুসন্ধান করতাম এবং এই বিশ্বের সম্পর্কের উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম। সুষ্ঠু চিন্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা নিশ্চিতই এই সত্যে উপনীত হয়ে যেত যে, এই বিশ্ব ধারণা-কল্পনা এবং অনুমান ও খেয়ালের সৃষ্টি নয়, এই বিশ্বব্যবস্থা আপনাআপনিই এভাবে চলছে না। নিশ্চিতই এ মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি গোটা সৃষ্টিলোকের উৎস। এক মহান শক্তি এই বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করছেন।

কিন্তু এই নির্ভুল চিন্তার মর্যাদা নড়বড়ে ও অনুমিতির পর্যায়েই থেকে যেত। ভিন্নমত ও নাস্তিক্যবাদী দর্শন খুব সহজেই তাকে নিজের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত। যদিও বা এই চিন্তাধারা স্বস্থানে অবিচল থাকত তাহলে ওহী না আসা অবস্থায় তার মর্যাদা ধারণ-অনুমানের অধিক কিছু হত না। এর মধ্যে হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ থাকত।

এ কারণে নবী-রসুলদের আগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল। যেন মানুষ আলোকোজ্জ্বল পথ খুঁজে পেতে পারে এবং তাকে যেন হতবুদ্ধি হয়ে ভয়ংকর পথে ঘুরে বেড়াতে না হয়। অতএব নবী-রসুলগণ অন্তর ও চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটানোর ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করেছেন এবং অনাগত মানব সভ্যতার জন্য তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার নিগূঢ় সত্যকে অত্যন্ত সহজ ও সজীব

অবস্থায় রেখে গেছেন। তাদের পবিত্র হাতে এই সত্যকে লাভ করার পর আর মানসিক অবসন্নতা কখনো অনুভূত হবে না—যা দার্শনিকদের চিন্তায় অবশ্যম্ভাবীরূপে অনুভূত হয়ে থাকে যখন তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বের রহস্য সম্পর্কে আলোচনায় লিপ্ত হন।

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আমরা যেভাবে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার ব্যাপারটি বিশদভাবে জানতে পেরেছি, অনুরূপভাবে আখেরাতের উপর ঈমান আনার শিক্ষাও তাদের কাছ থেকে লাভ করেছি। আখেরাতে মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের যে হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি অথবা পুরস্কার দেওয়া হবে—সে সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি। যদি ওহী না আসত তাহলে আমাদের জ্ঞানের পক্ষে এই কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীর সর্বশেষ মনযিল খুঁজে বের করা কখনো সম্ভব হত না।

হাঁ, মানুষ এটা মেনে নিতে অস্বীকার করতে পারে যে, এই পার্থিব জীবনই সবকিছু। বিশেষ করে যখন তারা দেখতে পায় যে, এখানে কেউই পূর্ণ প্রতিদান লাভ করতে পারছে না অথবা অপরাধের শাস্তি ভোগ করছে না। কত নেককার ও বদকার লোক মরে যাচ্ছে। নেককার লোকেরা তাদের পুরস্কার পাচ্ছে না এবং বদকার লোকেরাও তাদের শাস্তি ভোগ করছে না। কত যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হচ্ছে যাতে হয়ত বাতিলপন্থীরা বিজয়ী হচ্ছে এবং হকপন্থীরা মার খেয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়াতে প্রতিদান ও শাস্তির দাঁড়িপাল্লা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। ফলে মনের মধ্যে আশার সৃষ্টি হয় যে, অবশ্যই কখনো এমন একটি দিন আসবে যখন পূর্ণ ইনসাফ পাওয়া যাবে এবং আদলের সমস্ত দাবি পুরা করা হবে। স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতি যে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে তাও মানুষের মধ্যে আখেরাতের অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং মানুষ তার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে বিভিন্নভাবে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

এটা কেবল আসমানী নবুয়াতেরই অবদান যে, আখেরাত ও মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে যত সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা যায় এবং যেতে পারে, নবুয়াত তার সবকিছুরই মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং এই জীবনের পর মানুষকে যেসব পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করতে হবে সে সম্পর্কেও নবুয়াত তাদেরকে পূর্ণরূপে অবহিত করেছে।

নবী-রসূলদের দায়িত্ব কেবল এতটুকুই ছিল না যে, তাঁরা মানবজাতিকে জীবনের মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত করবেন। বরং এই মূলনীতি অনুযায়ী তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়াও তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব। প্রশিক্ষণ এমন কোন জিনিস নয় যা বই-পুস্তকে পাওয়া যেতে পারে। মন-মগজে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সারবস্তু পুঞ্জীভূত হওয়ার নাম প্রশিক্ষণ নয়। অথবা সামরিক বিধানের জিঞ্জিরে জীবনকে শক্ত করে বেঁধে দেওয়ার নামও প্রশিক্ষণ নয়, বরং নবী রসূলগণ মানবজাতিকে জীবনযাপনের সে পদ্ধতি হাতে কলমে শিখিয়েছেন, যার মাধ্যমে তাঁরা মানবেতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন- এখানে প্রশিক্ষণ বলতে তাই বোঝানো হচ্ছে। মানুষের মনে যখন অত্যন্ত গভীর পরিবর্তন সূচিত হয় তখনই এই প্রশিক্ষণ কার্যকর হয়। এটা এমনই পরিবর্তন যেন মাটির মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হল।

জাহিলী যুগের সেই লম্পট ও উদ্ধত রূহগুলো—যাদের জীবনটা নরহত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত ছিল, দেখতে তা আল্লাহ্‌র দাসত্বের জীবন্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। তারা নিজেদের জানমাল এবং সন্তানদের আল্লাহ্‌র পথে কোরবানী করে দেওয়ার মধ্যে গৌরব বোধ করতে লাগল। এমনটা কি করে সম্ভব হল ? এটা নবুয়াতের জীবন্ত প্রশ্বাসেরই অবদান। এটা রিসালাতের প্রাণ সঞ্চারক জীবন-কাঠিরই স্পর্শ। এই কাঠি তাদের নীতি নৈতিকতার মৃত কাঠামোর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিল এবং তা জীবন ও জনগণের উদ্দীপনায় বিহবল হয়ে গেল।

ব্যক্তি ও সমাজকে পথ প্রদর্শন করা এবং যেকোন দিক থেকে নসীহত করা ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করা রাসূলদের দায়িত্ব। সুতরাং তাঁরা মলিন ও অপবিত্র অন্তরসমূহকে নবুয়াতের ঝর্ণাধারায় ধৌত করে তাকে পরিচ্ছন্ন করেন এবং নিজেদের নূরের আলোকে নির্বাপিত চিন্তায় চেতনার বিজলী ছড়িয়ে দেন। এভাবে আলোকিত হয়ে তা অন্যদের জন্যও আলো ও হিদায়াতের সুউচ্চ মিনারে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে নবী রাসূলদের এতটা পূর্ণতা দান করা হয় যে, কেউ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সাহস পায় না। দর্শন যতটা পূর্ণতা ও উন্নতি লাভ করুক না কেন তা এই পথে কয়েক বিঘতও সামনে অগ্রসর হতে পারে না, পথিমধ্যেই হোঁচট খেয়ে যায়।

নবী-রাসূলগণ মাসুম (নিষ্পাপ)

নবী-রাসূলদের জীবনযাত্রা সব সময়ই উচ্চতার চরম শিখরে উন্নীত থাকে। সেখান থেকে তা কখনো নিম্নগামী হয় না।

> একজন সাধারণ মুমিনের ঈমানের উষ্ণতা অনবরত হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার উন্নতির সর্বশেষ পর্যায় হচ্ছে 'ইহসান'। এখান পর্যন্ত পৌঁছে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইহসানের অর্থ এই যে, "তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদিও তুমি তাঁকে না দেখছ, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন।"
>
> —বুখারী, মুসলিম

(اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ)

কিন্তু এই ইহসান যা মানুষের উন্নতির সর্বশেষ মনযিল, যেখানে অনেক প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও কঠিন শ্রম-সাধনার পর পৌঁছতে পারে—এখান থেকেই নবীদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। অর্থাৎ ইহসান হচ্ছে নবীদের উচ্চতার শিখরে আরোহণ করার সূচনা বিন্দু। অতঃপর তাঁরা নিজেদের সেই বিশিষ্ট ও স্থায়ী আসনে পৌঁছে যান, যার নিম্ন পর্যায়ে তাঁরা কখনো নেমে আসেন না। অতঃপর আল্লাহর সাথে তাদের যে উচ্চতম-উন্নততম সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এর রহস্য উদঘাটন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তায়ালা যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের প্রত্যেকেই চূড়ান্তভাবে মাসুম, নিষ্পাপ। এ ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাতের ঐকমত্য রয়েছে। তাদের দ্বারা কখনো কোন কবীরা গুনাহ্ সংঘটিত হয়নি। কেননা এটা তাদের পদমর্যাদার পরিপন্থী। নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও কোন কবীরা গুনাহ্ প্রকাশ পায়নি এবং পরেও সংঘটিত হয়নি। তাদের দ্বারা এমন কোন সগীরা গুনাহ্ও সংঘটিত হয়নি যার কারণে তাদের ব্যক্তিত্বে কোনরূপ আঁচড় লাগতে পারে অথবা তাদের বিশ্বস্ততা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, কখনো কখনো তাদের ভুলভ্রান্তি হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা সঠিক পথে এসেছেন। অনন্তর এই ভুলভ্রান্তি আকীদাগত এবং

নৈতিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। এজন্য তাদের ইসমাতের বৈশিষ্ট্যের উপর তা কোন দাগ ফেলতে পারে না। বরং এসব ভুলভ্রান্তি পার্থিব ব্যাপার ও জাতীয় সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এসব ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হওয়াটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

কখনো কখনো নবীদের উপর আল্লাহ্-ভীতির তীব্রতা প্রকট হয়ে উঠে। তাঁরা আল্লাহ্র অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার ব্যাপারে নিজেদের অপারগ মনে করেন। কেননা সাধারণ লোকদের তুলনায় তাঁরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক বেশি অবহিত। আল্লাহ্র মহত্ব, তাঁর মহিমা, তাঁর মর্যাদা এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কে তাঁরা অধিক জ্ঞাত। তাঁরা সব সময়ই অনুভব করেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় যত শ্রম-সাধনা করুক না কেন, তাঁর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করতে সক্ষম নয়।

অতএব নবী-রসূলগণ যদি এই অনুভূতির প্রভাবে ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং অধিক পরিমাণে তওবা ও ইসতিগফার করতে থাকেন তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা আমাদের মত ভুলভ্রান্তি করে থাকেন এবং আমাদের মতই গুনাহে লিপ্ত হন। যদি কোন আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ ধারণা হয়ে থাকে তাহলে মনে করতে হবে, এটা বোধশক্তিরই ত্রুটি এবং ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র। এর সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই।

মুজিযা

যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র নবী বলে দাবি করে, তাহলে তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তার দাবির সপক্ষে তার কাছে কি প্রমাণ আছে ? কিভাবে তার দাবি আমরা সত্য বলে মেনে নিতে পারি ? সে যদি তার দাবির সপক্ষে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাঁকে রসূল বলে মেনে নেওয়া এবং তার কথা মনোযোগ সহকারে শোনা। সামূদ জাতির কাছে হযরত সালেহ আলায়হিস সালাম এসে দাবি করলেন যে, তিনি আল্লাহ্র নবী ; অতঃপর তিনি তাদের ভালভাবে বোঝালেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ‧ وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ‧ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ‧

আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। যেসব লোক যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং সংশোধন হয় না—এই ধরনের সীমালংঘনকারীদের অনুসরণ করো না। —সূরা শুআরা : ১৫০-১৫২

কিন্তু সামুদ জাতির লোকেরা এই উপদেশে কর্ণপাত করল না। তারা হযরত সালেহ্ আলায়হিস সালামের কাছে তাঁর নবুয়াতের সপক্ষে প্রমাণ দাবি করল। কুরআন মজীদের ভাষায় :

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۚ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۚ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۚ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۚ

তারা জবাব দিল, তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে কোন নিদর্শন পেশ কর। সালেহ্ বলল, এই উষ্ট্রী—পালাক্রমে একদিন এর পানি পান করার জন্য নির্দিষ্ট এবং একদিন তোমাদের সকলের পানি নেবার জন্য নির্দিষ্ট। একে তোমরা কখনো উত্যক্ত করো না। অন্যথায় এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে। —সূরা শুআরা : ১৫৩-১৫৬

সামুদ জাতির এই দাবি অসঙ্গত ছিল না। তাদের দাবি মেনে নেয়া হয়েছিল এবং একটি উষ্ট্রী নিদর্শন হিসাবে উপস্থিত হয়ে গেল। এই উষ্ট্রী যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছিল এবং এটা যেভাবে চলাফেরা করত তা তাদের জন্য ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার। তার অবয়ব ও দৈহিক গঠনই বলে দিত যে, এটা একান্তই আল্লাহ্‌র কুদরতের এক অতুলনীয় নিদর্শন। তা কোন মানবীয় প্রতারণা অথবা মানবীয় শক্তির নিদর্শন নয়।

এ ধরনের প্রমাণ থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায়—যে ব্যক্তি কথা বলছে-সে ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছে। সে নিজের ব্যক্তিগত কথা বলছে না,বরং বিশ্বপ্রভুর প্রতিনিধিত্ব করছে। অতএব সে সীমিত মানবীয় শক্তির ব্যবহার করছে না, বরং মহান আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের নিদর্শন

পেশ করছে। ফিরাউন যখন মূসা আলায়হিস সালামের রিসালাতের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাঁকে শাস্তির হুমকি দিচ্ছিল, তখন তিনিও এ ধরনের দলীল পেশ করেছিলেন ঃ

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ۰ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ۰ قَالَ فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۰ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۰ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۰

ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ মেনে নাও তবে তোমাকেও সেই লোকদের মধ্যে গণ্য করব, যারা জেলখানায় বন্দী অবস্থায় আছে। মূসা বলল, আমি যদি তোমার সামনে এক সুস্পষ্ট জিনিস নিয়ে এসে থাকি তাহলেও ? ফিরাউন বলল, আচ্ছা তাহলে তুমি তা নিয়ে এসে উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। মূসা নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই একটা সুস্পষ্ট অজগর সাপে পরিণত হল। পরে সে নিজের হাত (বগলের মাঝখান থেকে) টেনে বের করল, তা সব দর্শকের সামনে ঝকমক করছিল।

—সূরা শুআরা ঃ ২৯-৩৩

হযরত ঈসা আলায়হিস সালামও যখন বনী ইসরাঈলদের কাছে আসেন এবং নবুয়াতের দাবি পেশ করেন তখন তার সপক্ষে প্রমাণও পেশ করেন ঃ

اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۰

আমি তোমাদের সামনেই মাটি দিয়ে একটি পাখিবৎ জিনিস তৈরি করি এবং তাঁতে ফুঁক দেই, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে পাখি হয়ে যায়। আমি

আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দেই এবং মৃতকে জীবন্ত করি। তোমরা নিজেদের ঘরে কি খাও এবং সঞ্চয় কর—আমি তাও তোমাদের বলে দিতে পারি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে—যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

—সূরা আল ইমরান ঃ ৪৯

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, অনেক জাতি সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও হককে কবুল করেনি। তারা নবীদের রিসালাতকে মেনে নেয়নি। তার কারণ এই নয় যে, উপস্থাপিত নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল, বরং শুধু জেদ এবং হঠকারিতাই ছিল এর প্রতিবন্ধক। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٠

যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা কোন ব্যক্তিকে রসূল বলে মেনে নেব না—যতক্ষণ না সে আমাদের সামনে একটি কোরবানী পেশ না করবে—যা (অদৃশ্য হতে) আগুন এসে খেয়ে ফেলবে। তাদের বল, তোমাদের কাছে পূর্বে আমার অনেক রাসূলই এসেছে, তারা বহু উজ্জ্বল নিদর্শনও এনেছিল এবং তোমরা যে নিদর্শনের কথা বলছ তাও তাঁরা এনেছিল। এতদসত্ত্বেও (ঈমান আনার জন্য এই শর্ত আরোপ করার ব্যাপারে) তোমরা যদি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হতে তাহলে সেই রসুলদের তোমরা কেন হত্যা করলে ?

—সূরা আল ইমরান ঃ ১৮৩

কোন দাবি সত্য হওয়ার জন্য কখনো তার সপক্ষে বাইরের প্রমাণ বর্তমান থাকে, আবার কখনো সেই দাবিই তার তাৎপর্যের দিক থেকে নিজের সপক্ষে দলীল হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি দাবি করছে যে, সে একজন প্রকৌশলী। সে তার দাবির সপক্ষে এই প্রমাণ পেশ করছে যে, সে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে

পারে বা শূন্যলোকে উড়তে পারে। সে যদি তা করে দেখাতে পারে তাহলে আমরা তাকে প্রকৌশলী বলে মেনে নেই। আবার কখনো সে বলে, আমি খুব মজবুত দালান নির্মাণ করতে পারি অথবা নদীর উপর একটা সুন্দর সেতু নির্মাণ করে দিতে পারি। যদি সে তা করে দেখাতে পারে, তাহলে আমরা তাকে একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী হিসাবে মেনে নিই।

বলতে গেলে পূর্বোল্লেখিত অলৌকিক দলিলসমূহের তুলনায় এই প্রমাণগুলোকে অধিক সফল ও সন্তোষজনক বলতে হয়।

আল্লামা ইবনে রুশদ (রহ) বলেন, "নিঃসন্দেহে কুরআন তার বাহকের নবুয়াতের সপক্ষে এক শক্তিশালী দলিল। কিন্তু তার রয়েছে একটা ভিন্নতর ধরন। লাঠি অজগর সাপে পরিণত হওয়া, মৃতের জীবিত হওয়া অথবা রুগ্নদের সুস্থ করে তোলার মধ্যে যে বিশিষ্টতা রয়েছে তা কুরআনের মধ্যে নেই। কেননা এসব অলৌকিক ব্যাপার যদিও নবীদের মাধ্যমেই প্রকাশ পেতে পারে এবং সাধারণ লোকদের কুপোকাত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু নবুয়াতের কার্যাবলী শরী'আতের প্রাণসত্তা এবং ওহীর উদ্দেশ্যের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না।

কুরআনের ব্যাপারটি এই যে, তা নবুয়াতের বৈশিষ্ট্য এবং দীনের বাস্তব সত্যের ইঙ্গিতবহ, যেমন রোগীর সুস্থতা ডাক্তারের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দিকে ইঙ্গিত করে। এর দৃষ্টান্ত এই যে, দুই ব্যক্তি নিজেদের ডাক্তার বলে দাবি করল। একজন বলল, আমার দাবির সপক্ষে দলীল এই যে, আমি বাতাসে ভর করে উড়তে পারি। অপরজন বলল, আমি রোগের চিকিৎসা জানি এবং রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারি। অতএব এদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারবে তার ডাক্তার হওয়ার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারব। আর অপর ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা এতটুকুই বলতে পারি যে, আমরা তার দাবি মেনে নিলাম।

অনুরূপভাবে মুজিযা কখনো মূল নবুয়াতের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, আবার কখনো মূল নবুয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। অনন্তর যুগ ও পরিবেশের দিক থেকে এসব মুজিযার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধানও থাকতে পারে। পূর্বকালের মুজিযাসমূহ ছিল জড় প্রকৃতির বা বস্তুভিত্তিক। দীনের মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য লুক্কায়িত ছিল তা দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদা পেত। কিন্তু ইসলাম আসার পর সে জড় প্রকৃতির মুজিযাসমূহের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। সে বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযা ও নবুয়াতের তাৎপর্যগত মূল্যবোধকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

ইসলাম পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে যে, পূর্ববর্তী যুগে দীনে হকের সমর্থনে যেসব মুজিযা পেশ করা হয়েছিল তা স্বচক্ষে দেখার পরও লোকেরা আল্লাহ্‌র দীন এবং তাঁর রসুলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকেনি। আজো যদি সেই ধরনের মুজিযা পেশ করা হয়, তাহলে এর প্রভাবের মধ্যে কি কোন পার্থক্য সূচিত হবে ? অতীতে যদি এই মুজিযা কাফেরদের মধ্যে ঈমানের আকাংখা সৃষ্টি করতে না পেরে থাকে তাহলে আজ তার মাধ্যমে এই আকাংখা কি করে সৃষ্টি হতে পারে ?

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ۔ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيَاتِ اِلاَّ تَخْوِيْفًا ۔

> আর নিদর্শন পাঠাতে আমাকে কেউই নিষেধ করেনি। তবে শুধু এ কারণেই পাঠাইনি যে, এদের পূর্বেকার লোকেরা তা মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। সামুদকে আমরা প্রকাশ্য উষ্ট্রী এনে দিলাম, আর তারা এর প্রতি অত্যাচার করল। আমরা নিদর্শন তো এজন্যই পাঠাই যে, লোকেরা তা দেখে ভয় পাবে। —সূরা ইসরা ঃ ৫৯

এজন্যই নবুয়াত ও রিসালাতের সাহায্য-সমর্থনের জন্য ভিন্নতর পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

পূর্ববতী নবুয়াত এবং সর্বশেষ নবুয়াতের মুজিযা

আল্লাহ্‌তাআলার এই নিয়ম চলে আসছিল যে, তিনি প্রকাশ্য মুজিযার মাধ্যমে তাঁর নবীদের সাহায্য করেছেন। তিনি তাঁদের হাতে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন যা দৃষ্টিশক্তিকে আকর্ষণ করতে পারে, হৃদয়কে ঝুঁকিয়ে দিতে পারে এবং স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যয়, শান্তি ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে পারে। পূর্ববর্তী যুগের নবীগণ যে নবুয়াতের সুসংবাদ শোনাতেন এবং যে সত্যের দিকে দাওয়াত দিতেন, তাদের মুজিযাসমূহ এর চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল।

যেমন, ঈসা আলায়হিস সালামের নিরাময় ব্যবস্থা এমন একটি জিনিস, যার সাথে ইনজীলের কোন সম্পর্ক ছিল না। আবার মূসা আলায়হিস সালামের লাঠি এমন এক মুজিযা, যার সাথে তাওরাতের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু

আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা হল সর্বশেষ নবুয়াতের মুজিযা এমন এক জিনিস হবে যা নবুয়াতের সৌন্দর্য থেকে ভিন্নতর হবে না।

সুতরাং একই কিতাব যার মধ্যে নবুয়াতের সত্যতাও রয়েছে এবং এই সত্যতার সমর্থনে প্রমাণও রয়েছে। এই দীনের মূলনীতি এবং এই দাওয়াতের ধরনকেই আল্লাহ্ তায়ালা রিসালাতের দাবির সবচেয়ে বড় প্রমাণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতার সর্বশ্রেষ্ঠ সনদ আখ্যা দিয়েছেন। কুরআন মজীদের আয়াতগুলোই—যা নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যাবতীয় প্রকারের আইনের সমষ্টি এবং যা স্বভাব প্রকৃতিকে উন্নত প্রশিক্ষণ দান করে, তাকে উত্তম চরিত্র ও ভাল কাজের ছাঁচে ঢালাই করে—একাধারে ইসলামের শিক্ষা, পয়গাম ও মুজিযা।

এসব আয়াতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে মানব প্রকৃতি জীবনের প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা লাভ করে, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এর পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা পরিবেশ মানব প্রকৃতি শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে। তা একথাই প্রমাণ করে যে, কুরআন মজীদ একটি স্বভাবসুলভ কিতাব, তার বাহক নবী একজন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ মানুষ এবং ইসলামের শিক্ষা তাঁর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে মানব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

কুরআন মজীদ সব সময়ই সরাসরি মানবজ্ঞান ও তার বিবেককে সম্বোধন করে। সে তাকে জিঞ্জিরমুক্ত করে এবং তার হারানো আস্থা তাকে ফেরত দেয়। সে বারবার একথার উপর জোর দিয়েছে যে, যারা বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী তারাই এটা বুঝতে পারে এবং এর দাবি ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ

যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার উপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, সে কি অন্ধ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে ? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই কবুল করে থাকে। —সূরা রাদ ঃ ১৯

কেবল এই বুদ্ধিমান লোকেরা জীবন ও জগতের ইঙ্গিত এবং বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

আসমান ও জমীনের সৃষ্টি এবং রাত-দিনের আবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নির্দশন রয়েছে। —সূরা আল ইমরান ঃ ১৯০

যত দিন জ্ঞান-বুদ্ধির মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে, এসব মুজিযার মর্যাদা ও মূল্য ততদিন অবশিষ্ট থাকবে। যতদিন জ্ঞানবুদ্ধি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান সম্পদ বিবেচিত হতে থাকবে ততদিন এই মুজিযার মূল্য ও মর্যাদা বাকি থাকবে, জ্ঞানবুদ্ধির আলোকেই যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং উন্নতি ও পূর্ণতার ধাপসমূহ অতিক্রম করতে থাকবে।

কাফের সুলভ দাবি

কিন্তু আরব উপদ্বীপের বেদুইন, বিগত জাতিসমূহের কাহিনীকার ও ধারণা-কল্পনার পূজারীদের দৃষ্টিতে এই মুজিযাসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। তাদের বুদ্ধির দৌড় তাদেরকে দিয়ে মরুভূমিকে সমূদ্রে অথবা সবুজ-শ্যামল বাগানে পরিণত করে দেখানোর মুজিযা দাবি করাল। এছাড়া তারা ইসলামের সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের দাবি এমন কোন দুরুহ ব্যাপার ছিল না যে, তা পুরা করা কঠিন। আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের জন্য তা অতি সহজ কাজ। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার দাবি ছিল ভিন্নরূপ। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, লোকেরা যে জ্ঞান-বুদ্ধির মর্যাদা খাটো করে দিয়েছে তাকে আবার মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে হবে।

আল্লাহ্‌র কুদরত মানুষকে এমন বুদ্ধিজ্ঞান দান করতে অস্বীকৃতি জানাল, যার সাহায্যে সে যখনই ইচ্ছা অলৌকিক মুজিযা প্রদর্শন করতে পারে। কারণ এতে সে একটা বিরাট দানকে অযথা ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত। যেসব নির্বোধ নিজেদেরও চিনতে পারেনি, নিজেদের অসম যোগ্যতার মূল্যায়ন করতেও

পারেনি, বিবেকের সিদ্ধান্তকে পদাঘাত করে আসছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের সত্যতার জন্য জড় প্রকৃতির মুজিযা দাবি করছিল—তারা এদের প্রবৃত্তির দাবি অনুযায়ী প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করে বেড়াত। এজন্য এমন একটি পন্থা অবলম্বন করা জরুরী ছিল, যাতে তারা বুদ্ধি-বিবেকের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনে বাধ্য হয় এবং অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, এর মধ্যেই তাদের জন্য এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

তাই আল্লাহ্ তায়ালার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বড় মুজিযা এই কুরআন মজীদ দান করা হয়েছে। সুতরাং কুরআনকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এটাই ছিল তাঁর আজীবনের কর্মপন্থা। তাঁর ইন্তিকালের পর এই কুরআনই ইসলামের কিতাব হিসাবে পরিগণিত হয়। তা তাঁর প্রদর্শিত পথের দিকে আহবানও জানায় এবং তাঁর নবুয়াতের সাক্ষ্যও বহন করে।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসুলকে এমন কিছু মুজিযা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিলেন, যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবীদেরও সাহায্য হতে পারে। এসব অলৌকিক মুজিযার একটি বিশেষ মেজাজ-প্রকৃতি রয়েছে। এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাতে এর সঠিক মর্যাদা দৃষ্টির আড়াল থেকে না যায়। এসব মুজিযা নিঃসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রিসালাত প্রমাণ করে এবং তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু এর মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে দ্বিতীয় পর্যায়ের।

যে ভঙ্গীতে এসব মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আল্লাহ্তায়ালার কর্মকৌশল একে অধিক গুরুত্ব দেয়নি। এগুলোর প্রভাবে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযার মূল্যমানে কোনরূপ পার্থক্য সূচিত হওয়ার সুযোগ দেননি। বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে অনেক মুজিযা মুমিনদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে—যাদের হৃদয়ে ঈমান বসে গিয়েছিল। তাঁরা নিজেদের বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করেছেন এবং নিজেদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

কিছু সংখ্যক মুজিযা কাফেরদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। তার ধরনটা এরূপ ছিল যে, কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। তারা দাবি করত এ ধরনের মুজিযার, কিন্তু প্রকাশ পেত অন্য ধরনের মুজিযা। অথবা তারা যে মুজিযা দাবি করত তা হয়ত কয়েক বছর পর প্রকাশ পেত। তা এমনভাবে প্রকাশ পেত যে, তাতে মনে হত তাদের দাবির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আবার কখনো এমনও হত যে, তাদের সকল দাবি প্রত্যাখ্যান করা হত এবং এর প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হত না। এর তাৎপর্য কি ? এর মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে ? তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়।

বস্তুভিত্তিক মুজিযার তাৎপর্য

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কিতাবে ঈমানের যাবতীয় দলীল এবং নবুয়াতের সমস্ত সাক্ষ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু লোকেরা এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়নি। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُوْرًا ۰

আমরা এই কুরআনে লোকদের জন্য বিভিন্নভাবে নানা রকম দলীল পেশ করেছি। কিন্তু তারা কুফরের উপরই অবিচল থাকল।

—সূরা ইসরা ঃ ৮৯

আবার কুফরী করার পর তারা কি করল ? তারা নানা রকম দাবি উত্থাপন করল। তারা বলল, আমাদের দাবি পূরণ হলেই কেবল আমরা ঈমান আনতে পারি।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا ۰ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۰ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاۤءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ۰

তারা বলল, আমরা তোমাদের উপর ঈমান আনব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য যমীনকে দীর্ণ করে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত না করবে; অথবা তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান রচিত না হবে, আর তুমি তাতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত না করে দেবে ; অথবা তুমি আকাশমণ্ডলকে টুকরা টুকরা করে আমাদের উপর আপতিত না করবে—যেমন তুমি দাবি করছ—। —সূরা ইসরা ঃ ৯০-৯২

রেখে দাও তাদের এই লম্বা-চওড়া দাবি যা তাদের বিদ্রোহের ফলেই উত্থাপিত হয়েছে। যমীনের বুকে একটি ঝর্ণাদারা প্রবাহিত করা কি এমন কোন কঠিন কাজ—যার জন্য আসমানী শক্তির প্রয়োজন হতে পারে ? যদি তাই হয় তাহলে মানবীয় শক্তি কি কাজে লাগবে ?

ছোট বেলায় কোন জিনিস সংগ্রহ করার জন্য যেকোন ব্যক্তি পিতার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কোন কিছুর প্রয়োজন হলেই তার দৃষ্টি পিতার উপর পতিত হয়। কিন্তু সে যখন বাল্যকালের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তার শক্তি-সামর্থ কাজে লাগানোর জন্য তাকে স্বাধীনতা দেওয়া কি পিতার কর্তব্য নয় ? সে নিজেই চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করবে, নিজের পথ নিজেই তৈরি করবে, নিজের পথ নিজেই অতিক্রম করবে এবং তার বয়স যতই বাড়তে থাকবে, নিজের বোঝা নিজেই বহন করার যোগ্য হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে এই নীতিই রেখেছেন। মানবজাতি যতদিন শৈশবে ছিল, তিনি তাদের সামনে একাদিকক্রমে মুজিযা প্রকাশ করতে থাকেন যাতে তাদের হৃদয়ের হক বসে যেতে পারে এবং তারা নবীর সত্যতার প্রবক্তা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মানবজাতি যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং তাদের চিন্তায় পরিপক্কতা আসল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর জন্য তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। তারা নিজেরাই যেন সঠিক ও ভুল পথের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। মানুষ নিজেই এখন চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেবে যে, তার ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত না মুক্তির পথে।

আল্লাহ্র ইচ্ছার সামনে এ কথা মোটেই গোপন ছিল না যে, যেদিন মানবজাতি তার বুদ্ধিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাবে এবং যেদিন সে কোন

দীনকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে পথ খুঁজতে থাকবে সেদিন সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, কিভাবে সে নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুয়াতকে স্বীকার করে নেয়ার ক্ষেত্রে আরব উপদ্বীপের বেদুঈনরা যেসব দাবি উত্থাপন করেছিল তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

তাদের একটি দাবি এই ছিল যে, তিনি আসমানে আরোহণ করে সেখান থেকে কোন নিদর্শন নিয়ে আসবেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা ছিল, তাদের এই মানসিকতা পরিশুদ্ধ করা, তাদের চেতনা শক্তিকে জাগ্রত করা এবং নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধির মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবনে সক্ষম করে তোলা। তারা যেন মানবতার মর্যাদা অনুধাবন করতে পারে, তারা মানুষ রসূলের উপর ঈমান এনে নিজেদের মানব পরিচয়কে উন্নত করে তুলতে পারে এবং এই রসূল (সঃ)-এর বিরোধিতা থেকে নিজেদের বিরত রাখে। কারণ তিনি মানবীয় জ্ঞানকে উন্নত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্যই এসেছেন। এজন্য কুরআন মজীদ যেখানেই এই দাবির উল্লেখ করেছে, সেখানে জোরেশোরে বলেছে ঃ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً ۔

বল! আমার প্রতিপালক অতীব পবিত্র। আমি একজন পয়গাম বাহক মানুষ ছাড়া আরো কি কিছু ? —সূরা ইসরা ঃ ৯৩

এই দাবি উত্থাপন করার এক যুগ পর ঠিকই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে আসমানে উঠেছিলেন। এভাবে আসমানে আরোহণ করার তাৎপর্য কি ? আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের দাবির প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি—সেদিকেই এ ঘটনার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের দাবির কোন গুরুত্বই দেননি। বরং মিরাজের রাতে মহানবী (সঃ)-এর আসমানে আরোহণের ব্যাপারটিই ছিল মূলত ঃ একটি মুজিযা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী (সঃ)-কে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা এখানে কারো ইচ্ছার পরোয়া করেননি। এজন্য তখন কারো ঈমান আনা অথবা কুফরীর উপর অবিচল থাকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। বরং সত্যকে মেনে নেয়া বা না নেয়ার প্রসঙ্গটি কুরআনের অতুলনীয় মুজিযার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ .

এখন যার ইচ্ছা মেনে নেবে, আর যার ইচ্ছা অমান্য করবে।

—সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৯

মুশরিকরা একবার শপথ করে বলল, যদি কোন বস্তুভিত্তিক মুজিযা প্রকাশ পায়, তাহলে তারা ঈমান আনবে। ব্যাপারটা যেন এরূপ যে, কোন যুবক তার পিতার সাথে জেদ ধরে বসল যে, সে প্রথমে তার বালসুলভ আকাংক্ষা পূর্ণ করবে, অতঃপর তাকে যুবক ভাববে।

এবারও আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও তাদের হৃদয়ের কাছে ছেড়ে দিলেন। তারা এর সাহায্যে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুক, সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হোক। কেননা বিবেক-বুদ্ধি ও হৃদয়ের মাঝে আল্লাহ্ তায়ালা যে মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন, তা যদি নিভে গিয়ে না থাকে তাহলে তারা এই গোটা বিশ্বকে মারেফাতের এক বিশাল দফতর রূপেই দেখতে পাবে। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুই এক একটি মুজিযা। এসব মুজিযার সাহায্যে সত্যের সন্ধান করা বা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারাটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ . وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ .

এরা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, আমাদের সামনে যদি কোন নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলে আমরা এর উপর অবশ্যই ঈমান আনব। তুমি বল, আল্লাহ্‌র কাছে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তোমরা কি জান! নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেলেও এরা ঈমান আনবে না। তারা যেমন প্রথমবারে ঈমান আনেনি, তেমনিভাবে আমরা তাদের দিল ও

> দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে দেব। আমরা তাদেরকে তাদের বিদ্রোহের মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকার জন্য ছেড়ে দেব। —সূরা আনআম ঃ ১০৯-১০

কুরআন মজীদের এই তিরস্কার বাণী আমাদের সামনে থাকলে এই সত্য আরো প্রতিভাত হয়ে উঠে। কাফেরদের হৃদয় ও দৃষ্টিশক্তির উপর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার যে পর্দা ঝুলে আছে তা উন্মোচন করতে গিয়ে কুরআন মজীদ বলছে ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ . لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ .

> আমরা যদি তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দিতাম, আর তারা দিনমানে তাতে আরোহণ করতে থাকত, তখনও তারা এটাই বলত, আমাদের চোখকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। বরং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে। —সূরা হিজর ঃ ১৪, ১৫

বস্তুভিত্তিক মুজিযাই বা এ ধরনের লোকদের কি উপকারে আসতে পারে ? তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাদের হৃদয় ও জ্ঞানের দরজায় তালা ঝুলে আছে। যদি তাদের হৃদয়ের দরজা খুলে যায় তাহলে কুরআনের উপস্থিতিতে আর কোন মুজিযার প্রয়োজন হবে না। কুরআনের চেয়ে বড় মুজিযা ও নিদর্শন আর কি হতে পারে ?

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا . إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ .

> তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না ? না তাদের হৃদয়ে তালা পড়ে গেছে ? আসল কথা এই যে, হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে গেছে তাদের জন্য শয়তান

এই আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্খার মোহকে তাদের জন্য দীর্ঘ করে রেখেছে। —সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৪, ২৫

নবী একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ

কুরআন মজীদ যদি সেই কিতাব হয়ে থাকে যা মানবজাতির সামনে পূর্ণতার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছে—তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই মানুষ, যাঁর ব্যক্তিত্ব মানবতার কাঙ্খিত এই উন্নততম মূল্যমানের ধারক ও বাহক। তাঁর জীবনের কার্যাবলীই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সেদিনই অন্তর ও বিবেকের মর্যাদা অনেক উন্নত করে দিয়েছেন যখন ঘোষণা করলেন—তাকওয়া হচ্ছে সেই আলোকবর্তিকা—পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে যার অবস্থান। যদি তাকওয়াই না থাকে তাহলে বাহ্যিক ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে। তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির মর্যাদা দান করলেন এবং একে দ্বিনের মূল ঘোষণা করলেন।

এর উপর মুসলমানরা এমন এক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করল যা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমষ্টি। এর বদৌলতে মানবীয় চিন্তা-গবেষণার স্তব্ধ স্রোতধারা আবার বইতে শুরু করল। এরই বোনা বীজ থেকে নতুন সভ্যতার সূচনা হল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি সঠিক অর্থে মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন এবং তাদের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি গোটা বিশ্বকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অধীন-নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই নেতৃত্বের অধিকারী। তাকে এই জগতের যাবতীয় জিনিসের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। সে কেবল আল্লাহ্‌র বান্দা। সে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার নয় বা কোন ফের্কার ক্রীড়নকও নয়।

ইসলামের বার্তাবাহক নবী আরবীভাষী কিন্তু তাঁর আনীত দীন শুধু আরবদের জন্য নয়। তাঁর কোন নির্দিষ্ট জাতি-পরিচয় নেই। আর যে দীন মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের কাছে আবেদন জানায়, যে দীনের দলীল-প্রমাণের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বজগতের অধ্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ—তার আবার কিসের জাতি পরিচয়!

নবুয়াত ও প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব (Genius)

মানবেতিহাসে এমন অসংখ্য ব্যক্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা অসম শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। মানবজাতি তাদের অবদানকে নিজেদের স্মৃতিপটে এবং ইতিহাসের পাতায় বন্দী করে রেখেছে—যাতে অনাগত মানব সভ্যতা তাদের প্রতিভার নির্দশনসমূহ অবলোকন করতে পারে এবং এসব ঘটনা থেকে নিজেদের মধ্যে বলবীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করতে পারে। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী অসংখ্য মানুষ যশ ও খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছে। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান।

শূন্যলোকের নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, তার একটি অপরটি থেকে আয়তনে হাজারো লাখো গুণ বড়। কিন্তু মণি-মুক্তা আয়তনে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তা নুড়ি পাথর তো আর নয়। অতএব আমরা যখন এই মহামানবদের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই তাদের মধ্যে নবী-রসূলগণও রয়েছেন, যাঁদেরকে রিসালাতের পদে সমাসীন করা হয়েছে, দার্শনিকগণও রয়েছেন যারা চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বৈজ্ঞানিকগণও রয়েছেন যারা নিত্য নতুন আবিষ্কারে পৃথিবীকে চমকিত করেছেন, রাষ্ট্রনায়কগণও রয়েছেন যারা নিজ নিজ দেশের জনগণকে শাসন করেছেন, সাহিত্যিকগণও রয়েছেন যারা সাহিত্যের জ্ঞানকে অলংকার পরিয়েছেন। এরকম আরো কত অসংখ্য লোক রয়েছেন।

আমরা যদি তাদের ইতিহাসের মূল্যায়ন করি, তাদের মধ্যে তুলনা করি, একজনকে অপরজনের উপর অগ্রাধিকার দেই তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা তাদের কারো প্রতিভাকে গোপন করতে চাই, অথবা তাদেরকে মহত্ত্বের আসন থেকে নামিয়ে এনে সাধারণের পর্যায়ে দাঁড় করাতে চাই।

প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব

মানবীয় গৌরব ও মহত্ত্বের তাৎপর্য এই যে, তার যাবতীয় যোগ্যতার মধ্যে যেকোন একটি দিকের যোগ্যতা অধিক প্রতীয়মান হয়ে থাকে। বরং বলতে গেলে কোন একটি বিশেষ দিকের যোগ্যতার বিকাশ অন্য সব দিকের যোগ্যতার

মৃত্যুধ্বনি হয়ে থাকে। তার অন্য সব যোগ্যতা হয়ত বা সাধারণ মানুষের যোগ্যতার পর্যায়ে থেকে যায়। বরং কখনো কখনো তা সাধারণ স্তরের চেয়েও নিচে থেকে যায়।

অতএব এসব মনীষী গৌরব ও মহত্ত্ব এবং তাদের জীবন-চরিত পাঠ করলে দেখা যায়, তাদের জীবনের কোন কোন দিক একেবারেই অন্ধকার রয়ে গেছে। নেপোলিয়ান একজন শক্তিমান নেতা ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কে অনেক বদনাম রয়েছে।

জ্যাক রুশো একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। দুনিয়ায় যেসব লোক স্বাধীনতার আইন রচনা করেন, তিনি তাদের প্রথম সারির একজন। কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

বিসমার্ক রাজনৈতিক ময়দানের একজন অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ডাহা মিথ্যুক।

এরকম কত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি-সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ রয়েছেন যাদের জীবনাচার অনুসন্ধান করলে অনেক কুৎসিৎ তথ্য বেরিয়ে আসে। এ ধরনের জঘন্য কাজ কেমন করে সংঘটিত হল তা চিন্তা করলে স্তম্ভিত হতে হয়। এসব সত্ত্বেও তাঁরা মহামনীষী, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। কেননা তাদের চিন্তা, সাহিত্যকর্ম ও উজ্জ্বল অবদান তাদেরকে সাধারণ স্তর থেকে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে গেছে।

অপরদিকে যেসব লোকের জীবন-চরিত উল্লিখিত দোষত্রুটি থেকে মুক্ত তারাও একদিক থেকে প্রখ্যাত হলেও অন্য দিক থেকে সাধারণের পর্যায়ে রয়ে গেছেন। অথবা তারা এমন রোগে আক্রান্ত যার দ্বারা তাদের যাবতীয় চিন্তা প্রভাবিত হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমন লোকও পাওয়া যাবে যিনি মানসিক জটিলতা অথবা জৈবিক লালসার শিকার, অথবা চরম আত্মকেন্দ্রিক। এমন লোকও পাওয়া যাবে যারা যশ ও খ্যাতির পাগল। এমন লোকও দেখা যায় যিনি কোন বিশেষ জিনিসের প্রতি ঘৃণা পোষণ অথবা ভালবাসার ব্যাপারে অন্ধ।

এজন্যই তাদের জীবন ভণ্ডামি ও কপটতার শিকার। তাদের ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত কলুষিত। কিন্তু বাহ্যিক চাল-চলন আচার-ব্যবহার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এই দ্বৈততার শিকারে পরিণত হয়েছে। এজন্যে সে এতে কোন আশ্চর্য বোধ করে না। অসাধারণ ব্যক্তিদের ভণ্ডামিকে সে কোন অপরাধ মনে করে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, জাতি তাদের যোগ্যতার দ্বারা উপকৃত হবে এবং তাদের ক্রটিসমূহ উপেক্ষা করবে।

ইংরেজদের জানা আছে যে, নেলসন অপরের মান-সম্ভ্রমে হস্তক্ষেপরত অবস্থায় মারা যান। কিন্তু তারা তার এ অন্যায় হস্তক্ষেপকে উপেক্ষা করে থাকে। চার্চিল অনেক ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চুক্তি লংঘন করেছেন। কিন্তু তারা সেটাকে পাশ কাটিয়ে যায়।

এসব বিশেষ ব্যক্তিত্বের আলোচনা এখানে শেষ করে আমরা আরো উপরের স্তরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব, যাঁদের জীবন, চরিত্র ও কর্মকাণ্ড নিখুঁত, নিষ্কলুষ, পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর। তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রসূল।

নবী-রসূল

প্রতিভাধরগণ যেখানে একটি বা কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকেন, সেখানে নবী-রসূলগণ প্রতিটি বিষয়ে যোগ্যতার শীর্ষদেশে অবস্থান করেন। পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী, পরিচ্ছন্ন চিন্তায় সঞ্জীবিত, দেহ প্রস্ফুটিত, হীনতা-নীচতা থেকে পবিত্র, যাবতীয় গুণে সু-সজ্জিত, নেকী, সৌজন্য ও আভিজাত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার প্রতীক, দেখতে একজন ফেরেশতা সদৃশ। কবি বলেন ঃ

এরা যেন প্রদীপের মত
মনে হয় জীবন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র থেকে
ঢেলে সাজানো এদের অবয়ব,
এদের চরিত্র যেন আলোর তরঙ্গমালা
যেদিকেই দেখ ঔজ্জ্বল্য ছিটিয়ে চলে।

যাঁদেরকে নবুয়াতের জন্য বাছাই করা হয় তাঁরা মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উর্ধ্ব জগতের সাথে সংযুক্ত, উন্নত রুচির অধিকারী,

দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী, নিগুঢ় তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত, ভ্রান্তি থেকে দূরে বহু দূরে, পথভ্রষ্টতা থেকে সুরক্ষিত। দার্শনিকগণ যেখানে হোঁচট খেয়ে গেছেন তাঁরা সেখানে অবিচল রয়েছেন। চলার পথে তাঁদের পা কখনো পিছলে যায়নি। শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী, যেসব রোগকে মানুষ ঘৃণা করে অথবা যেসব রোগ দৈহিক বিকৃতি ঘটায় তা থেকে তাঁরা নিরাপদ ছিলেন। মানব দরদী, জনগণের কল্যাণকামী, সৎকাজের প্রতীক, তাকওয়ার আধার, লেনদেনে সত্যবাদী এবং আচার-ব্যবহারে আন্তরিক।

কোন নবী সম্পর্কেই এরূপ ধারণা করা যায় না যে, তিনি ভদ্রতা, সৌজন্য ও মনুষ্যত্বের দাবিসমূহ উপেক্ষা করেছেন। তাঁর দ্বারা এমন কোন কাজও সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় যা সম্মান ও মর্যাদাকে কলংকিত করতে পারে। নবীগণ তো আসমানী ওহী ও আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন-বিধানের ধারক ও বাহক। তাঁদের কথাবার্তা হিকমতও জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং তাদের জীবন অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁদের ভেতর ও বাহির এবং গোপন ও প্রকাশ্য জীবন সবই উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত। তাদের গোটা জীবন যেন একটা উম্মুক্ত কিতাব। এর কিছু পৃষ্ঠা বন্ধ এবং কিছু পৃষ্ঠা খোলা তা নয়।

তাদের ব্যক্তিগত জীবন তাদের আনীত পয়গামের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। তাদের জীবন-চরিত তাদের দাওয়াতেরই সত্যিকার প্রতিচ্ছবি এবং তাদের কার্যাবলীর ব্যাখ্যা। তাঁরা যখন জনগণের মধ্য অবস্থান করেন তখন রহমত ও অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। আর তাঁরা যখন বিদায় নেন নিজেদের পেছনে বরকত ও প্রাচুর্যের কাফেলা রেখে যান। আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ·

আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত কাকে দান করবেন তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। —সূরা আনআম ঃ ১২৪

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও পয়গামবাহক নির্বাচন করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও। তিনিই সব শুনেন এবং সব দেখেন। যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের থেকে লুকায়িত রয়েছে তার সবই তিনি জানেন। সমস্ত ব্যাপার তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। —সূরা হজ্জ ঃ ৭৫-৭৬

শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের দিক থেকে নবীদের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেউ ছোট্ট একটি সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, কেউ হাজারো বা লাখো মানুষের একটি বসতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন, আবার কেউ গোটা জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন। তাদের কেউ স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীআত নিয়ে এসেছেন, আবার কেউ পূর্ববতী শরীআতের অধীনে প্রেরিত হয়েছেন। এজন্য তাদের সবার মর্যাদা সমান নয়।

এভাবে আমরা যতই উপরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি, যতই উচ্চতার শিকরে আরোহণ করতে থাকি, মানবীয় পূর্ণতার স্তরসমূহ অতিক্রম করতে থাকি, এভাবে এমন এক জায়গায় পৌছে যাই যেখানে মহৎ প্রতিভাধরদের খুবই ক্ষুদ্র মনে হয় এবং যেখানে সব নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব হালকা মনে হয়—সেখানেই আমরা নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দীপ্তিমান দেখতে পাই। সারা জাহানের নবী, যাবতীয় গুণবৈশিষ্ট্যের সঙ্গমস্থল, সৌন্দর্যের প্রতীক। কল্পনা—শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের একটি প্রতিকৃতি আঁকলো, আর কুদরতের হাত তার মধ্যে রূহ ফুকে দিল। সাথে সাথে তা এক জীবন্ত-জাগ্রত মানুষে পরিণত হয়ে গেল। এমন এক মানুষ যাঁর দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই।

ইনিই হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর উপর আল্লাহ্র রহম ও করুণা বর্ষিত হোক। সব নবীদের ইমাম এবং সব প্রতিভাধরদের নেতা। সম্মান ও মর্যাদার এক সুউচ্চ মিনার। প্রেম-প্রীতি, আন্তরিকতা, বুদ্ধিমত্তা, উদারতা, কল্যাণকামিতা, প্রজ্ঞা সবকিছুর আধার। তাঁর

বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মহান ব্যক্তিই মহান ব্যক্তির মূল্যায়ন করতে পারে। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর মত মহান ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়টি আর কোথায়!!

কস্তুরীর মোহর

পূর্ববর্তী নবীগণ হেদায়াতের আলোকবর্তিকা ছিলেন। সমগ্র বিশ্বে কুফর ও শিরকের যে ঘণীভূত অন্ধকার বিরাজিত ছিল, তার মধ্যে তাঁরা আলোর মশাল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অতঃপর যখন ইসলামের সূর্য উদিত হল, ঘণীভূত অন্ধকার দূর হতে শুরু করল। বিশ্বনবীর আলোকবর্তিকা যখন প্রজ্জলিত হল, বিশ্বের চেহারায় বিবর্তন শুরু হয়ে গেল। কবি বলেন ঃ

প্রসঙ্গ উথাপন কর না এর
আগের কিতাবগুলোর
প্রভাতের আলো প্রস্ফুটিত হল যেই
নিবিয়ে দিল সবগুলো হারিকেন।

যে মহান সত্তা নবুয়াতের এই ভারবোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তাঁর মহত্বের বর্ণনা শেষ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে সমস্ত নবীদের গুণবৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা আঠার জন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে অবিচল হৃদয়ের অধিকারী এবং নতুন শরীআতের প্রবর্তক নবীদের নামও শামিল রয়েছ। তাদের সবার নাম উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ ۰ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعَالَمِيْنَ ۰

এরাই ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমরা কিতাব, হিকমত এবং নবুয়াত দান করেছি। এখন যদি তারা এটা মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে কোন পরোয়া নেই, আমরা অন্য কিছু লোককে এই নিয়ামত সোপর্দ করেছি, যারা এর অস্বীকারকারী নয়। এদেরকেই আল্লাহ্ তায়ালা হেদায়াত দান করেছেন। তোমরাও তাদের পথেই চল। হে মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও, আমি (তাবলীগ ও হেদায়াতের) কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছি না। এতো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য এক সাধারণ নসীহত বিশেষ।

—সূরা আনআম ঃ ৮৯, ৯০

আনুগত্য ও অনুসরণের এই যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনে সব সময়ই জাগ্রত থাকত। একবারকার ঘটনা। তিনি গনীমাতের মাল বন্টন করছিলেন। এক মুনাফিক ব্যক্তি অপবাদ দিয়ে বলল, "এই বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের রাগ সংবরণ করে বললেন ঃ

মুসা (আঃ)-এর উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হোক। তাঁকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

—বুখারী-কিতাবুল আদাব

অতএব এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেছেন, এই আয়াতে পূর্ববর্তী সব নবীদের তুলনায় রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী নবীদের যেসব গুণবৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মাঝে তার সবগুলোরই সমাবেশ ঘটেছে।

হযরত নূহ আলায়হিস সালাম ছিলেন ধৈর্য-সহ্য, অবিচলতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মূর্ত প্রতীক।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন দানশীল, দয়ালু এবং আল্লাহ্‌র পথে নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা কারী।

হযরত দাউদ (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র দানের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং যথাযথ হক আদায়কারী।

হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন সংসার-বিরাগী এবং পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি বিমুখ।

হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন সুখে-সম্পদে কৃতজ্ঞশীল এবং দুঃখে-বিপদে ধৈর্য্যশীল।

হযরত ইউনুস (আঃ) ছিলেন অনুতপ্ত, বিনয়ী ও বিগলিত হৃদয়ের অধিকারী।

হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন বীরত্ব, শৌর্যবীর্য ও শক্তিমত্তার প্রতীক।

হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী।

অতঃপর আমরা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে তাঁকে এক বিরাট মহাসাগর হিসাবে দেখতে পাই, যার মধ্যে সাগর-উপসাগরগুলো একাকার হয়ে গেছে।

সব ময়দানের বীর সৈনিক

একদল প্রতিভাবান লোক রয়েছেন যারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পছন্দ করেন। সাধারণ লোকদের সাথে অবাধে মেলামেশা করলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হবে এই আশংকায় তারা তাদের এড়িয়ে চলেন।

আবার এমন কিছু লোক রয়েছে যারা জীবন-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সাফল্যের সব চাবিকাঠি হাতের কাছে পেয়ে যায়। তাদের এখানে চিন্তার গভীরতা আছে, জ্ঞানের প্রাচুর্য আছে এবং তারা দূরদৃষ্টিরও অধিকারী। তারা জরিত প্রকৃত রোগ নির্ণয়ে সিদ্ধহস্তও। কিন্তু এই ধরনের যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মন অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাদের প্রেম-প্রীতি ও মনুষ্যত্ববোধের সীমা অত্যন্ত সীমিত। যেসব লোক তাদের রুচি ও উদ্দেশ্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে কেবল তারাই তাদের প্রিয়পাত্র।

আবার এমনও কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি আছেন, যারা অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী। তাঁদের আচার-ব্যবহার মানুষকে সহজেই আপন করে নেয়। তবে আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাঁরা জনগণকে বশীভূত করার মত শক্তির অধিকারী হয়ে গেছেন এবং তারা তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে; এখন তারা যেভাবে চায়, যেদিকে চায় তাদের ঘুরপাক খাওয়াতে পারে।

আমরা এখানে উন্নত মন-মানসিকতা সম্পন্ন প্রতিভাধর ব্যক্তিদের দিকে ইঙ্গিত করছি, যাদের চারপাশে প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই সমবেত হয়ে থাকে। তারা তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদের বড়ত্ব ও মহত্বকে মেনে নেয়। দুনিয়ার মঞ্চে এ ধরনের ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব খুব কমই হয়েছে। তবে তাঁরা ইতিহাসের পাতায় নিজেদের অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন।

কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তাঁদের সুদীর্ঘ অতীতে এমন কোন ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না—যার সামনে কোন জাতির বীর পুরুষ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ মাথা নত করে দিয়েছে, আকীদা-বিশ্বাসে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে গেছে এবং তাঁর জন্য অন্তরের ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছে। একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেই এই ব্যতিক্রম। ঘোরতর যুদ্ধের সময় নামকরা বীর-যোদ্ধাগণ তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দিত। কারণ যুদ্ধ চলাকালে তারা তাঁর সাহস ও বীরত্ব দেখে বিমোহিত হয়ে যেত। বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তি ও রাজনীতিজ্ঞ তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। কারণ তিনি তাদের সামনে এমন তথ্য তুলে ধরতেন যেখানে তাদের চিন্তা কখনো পৌঁছতে সক্ষম হত না।

দানবীরগণ তাঁর দানের মহিমা দেখে হতভম্ব হয়ে যেত। সকাল বেলা তাঁর কাছে হাজারো উট-বকরী, অঢেল অর্থ-সম্পদ এসে জমা হত, কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই তা বিলি-বন্টন হয়ে যেত। তা বেকার, অক্ষম, বিধবা ও দরিদ্রের দরজায় পৌঁছে যেত।

ইবাদত-বন্দেগীতে রত ব্যক্তি তাঁকে ইবাদত অনুশীলনে বহুদূর অগ্রসর দেখতে পেত। দুনিয়ার আকর্ষণ-বিমুখ ব্যক্তি তাঁকে এ ব্যাপারে তার সামনে

দেখতে পেত। ভাষা, প্রকাশভঙ্গী এবং অলংকরণের দিক থেকে কেউই তার নাগালে পৌঁছতে পারত না। তার বক্তব্যে যেন যাদু ছড়িয়ে রয়েছে। এমনকি সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী লোকেরা দেখতে পেত, তিনি অনায়াসে নামকরা মল্লযোদ্ধাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রতিভাধর ব্যক্তিরা তাঁর মধ্যে যাবতীয় প্রতিভার সমাবেশ দেখতে পেত এবং নিজেদের প্রতিভাকে এর সামনে মূল্যহীন মনে করত। সাধারণ মানুষ যেভাবে পাহাড়ের আকাশচুম্বী চূড়ার দিকে মাথা উঁচু করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে—প্রতিভাধর ব্যক্তিগণও তাঁকে সেভাবেই দেখেছেন।

অপরদিকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র স্বভাবের অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রত্যেকের অতি নিকেটর মানুষ। বিধবাই হোক অথবা মিসকীন, তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তাদের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হত না। বরং তাঁর প্রশস্ত হৃদয়, প্রশস্ত প্রতিভা ও আন্তরিকতার কারণে তারা তাঁকে নিজেদের একান্ত আপনজন মনে করত। সমাজের এই অসহায় মানুষগুলোকেই তিনি অধিক ভালবাসতেন।

তিনি যেন একটি সূর্য, যার আলোক থেকে সবাই সমভাবে উপকৃত হয়, প্রত্যেকেই এর মাধ্যমে নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণ করে নেয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আলো ও উত্তাপ সংগ্রহ করে। কেউই মনে করে না যে, অপর কেউ তার শরীক আছে, অথবা তাঁর সাথে ঝগড়া করার কেউ আছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর সাথীদের জন্য স্নেহ-ভালবাসার একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

প্রতিভার প্রশংসা

নবুয়াত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি সুমহান দান, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অর্জিত কোন জিনিস নয়। এটা কারো নির্দিষ্ট অংশ নয় যে, দাবি করে আদায় করা যাবে অথবা চেষ্টা তদবীর করে অর্জন করা যাবে। এটাই সঠিক আকীদা এবং কুরআনের সাথে সম্পূর্ণ সমাঞ্জস্যশীল।

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ؟

তোমার রবের রহমত কি এই লোকেরা বন্টন করবে ?

—সূরা যুখরুফ : ৩২

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ؟ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ .

তোমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি এদের মুঠোর মধ্যে কিংবা এর উপর তাদের শাসন চলে ? এদের নিকট কোন সিঁড়ি আছে না কি, যার উপর চড়ে এরা উর্ধ্ব জগতের কথা গোপনে শুনে নেয় ? এদের মধ্যে যে ব্যক্তিই গোপনে কিছু শুনে নিয়েছে, সে নিয়ে আসুক না কোন অকাট্য দলীল। —সূরা তুর : ৩৭, ৩৮

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ঘটনাচক্রে হাতে এসে যাওয়ার মত নিয়ামত এটা নয়। এটা কোন অন্ধ বন্টন নয় যে, ভাগ্যক্রমে কারো ভাগে পড়ে যাবে।

জাহিলী যুগের এক কবি আল্লাহ্ সম্পর্কিত আলোচনাকে নিজের বিষয়বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল। তার আশা ছিল হয়ত এভাবে সে একদিন নবুয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। কিন্তু তার সে আশা কোন দিন পূরণ হয়নি। রাহেব ও পাদ্রীরে একটি দলও এই মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা এই মহান পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেন। যারা মনে করে নবুয়াতের এই পদ নির্বিচারে অর্পণ করা হয়, এজন্য কোনরূপ যাচাই বাছাই করা হয় না, অথবা নবীদের মর্যাদা শুধু এটুকুই যে, তাঁরা ওহীর ধারক ও বাহক, তাঁদের দায়িত্ব শুধু তা মানুষের কাছে পৌছে দেয়া, তাঁরা যেন একটি লাউড স্পীকার, ফেরেশতা এসে এর মধ্যে কথা বলে যায়, ব্যক্তিগতভাবে তাদের কোন যোগ্যতা নেই, তারা পূর্ণতা ও উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন—এরা নবীদের সম্পর্কে চরম ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। নবীগণ যে গুণ-

বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতার অধিকারী হয়ে থাকেন সে সম্পর্কে এদের কোন ধারণাই নেই। তাঁরা যে মহত্ত্ব ও বিশেষত্বের কারণে এত উপরে অবস্থান করেন যে, দুনিয়ার বড় বড় দার্শনিকও তার কুলকিনারা করতে পারেননি — এ সম্পর্কে তারা অনবহিত।

অনুরূপভাবে অসংখ্য বিশিষ্ট লেখক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত লিখেছেন। কিন্তু তারা তাঁকে একটি প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁকে প্রতিভা বলতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কতগুলো সীমা-শর্ত অবশ্যই মানতে হবে। আমরা তাঁকে এই শর্তে প্রতিভা বলতে পারি যে, আমাদের উদ্দেশ্য হবে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা, তাঁর পরিপূর্ণতাকে আলোক উদ্ভাসিত করে তোলা।

তাঁকে প্রতিভা বলতে কোন দোষ নেই, যদি আমরা ওহীকে স্বীকার করে নেই যা বস্তুজগত এবং অবস্তু জগতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এটাই নবুয়াতের প্রথম ভিত্তি। কিন্তু প্রতিভা বলতে যদি তাঁকে দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিদের একজন মনে করা হয়, তাহলে আমরা তাঁর জন্য 'প্রতিভা' শব্দ ব্যবহার করার কখনো অনুমতি দিতে পারি না। তাঁর প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আসল মর্যাদা হচ্ছে, তিনি আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। যেসব লেখক ও ঐতিহাসিক তাঁর জীবন-চরিতের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের এবং মুসলিম লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এখানেই হবে পার্থক্য।

সব নবীদের উপর ঈমান আনা ফরয

আল্লাহ্ তায়ালা সব নবীদের উপর ঈমান আনাকে দীনের অন্যতম রুকন (স্তম্ভ) হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং নিজের নামের সাথে তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর উপর ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন সমস্ত নবীর উপরও ঈমান আনা হবে। কুরআন মজীদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং নিষ্ঠাবান ঈমানদার সম্প্রদায়ের এই আদর্শই বর্ণনা করেছে ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۔

রসূল সেই জিনিসের উপর ঈমান এনেছে যা তার উপর তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং মুমিনরাও এর উপর ঈমান এনেছে। তারা সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে। তাদের কথা হচ্ছে ঃ আমরা আল্লাহ্র রসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং তা মেনে নিয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমাদের তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

সূরা বাকারা ঃ ২৮৫

অনুরূপভাবে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা ইসলামের কলেমা শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ। এছাড়া কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না।

নবীদের উপর ঈমান আনা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ? এর কারণ এই যে, আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় জানার জন্য তাঁরাই হচ্ছেন একমাত্র মাধ্যম। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাছে কি চান ? তিনি তাদের কি অবস্থায় দেখতে চান ?

নবী-রসূলদের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক তা নির্ভেজাল মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এই সম্পর্ক তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বাহ্যিক দেহের সাথে নয়। এ সম্পর্ক মূলত তাঁদের কাছে আসা ওহীর সাথেই হয়ে থাকে, তারা যে হেদায়াত নিয়ে আসেন তার সাথেই হয়ে থাকে। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ۔

তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারো না, যতক্ষণ তার কামনা-বাসনা আমার আনীত আদর্শের অনুগত না হবে। —শারহুস সুন্নাহ

মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ ۔

যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং নবী-রসূলদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করব। আমরা পূর্ণবিজ্ঞতা-সহকারে সমস্ত কাহিনী তাদের কাছে পেশ করব। আমরা তো কোথাও লুকিয়ে ছিলাম না। —সূরা আরাফ ঃ ৬, ৭

ইসলাম ছাড়া আরো দুটি ধর্ম রয়েছে—ইহুদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম। এ দুটিই ইসলামের পূর্ববর্তী যুগের ধর্ম। কিন্তু আজ এ দু'টি ধর্মের কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। এই দুই ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্মকে নিকৃষ্টভাবে কদাকার করে রেখে দিয়েছে। তাদের আসমানী কিতাবসমূহ যথেচ্ছভাবে তাহরীফ (পরিবর্তন) করা হয়েছে। অতএব আজ সঠিক ঈমানের জন্য যদি কোথাও কোন পথনির্দেশ থেকে থাকে, তাহলে কেবল ইসলামেই তা বর্তমান আছে।

আজ কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত কিতাবেই হেদায়েতের আলো পাওয়া যেতে পারে এবং তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চাবিকাঠি আজ আর ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের হাতে নেই। আজ কেবলমাত্র ইসলামই মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দিতে পারে।

আজ কেবল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েই আল্লাহ্ তায়ালার সঠিক পরিচয় লাভ করা সম্ভব। এর প্রবর্তক হচ্ছেন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর পাঠানো সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন এবং চিরস্থায়ী শরীআত যা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। ইসলামের প্রদর্শিত পথ সহজ, সরল ও পরিষ্কার। এখান থেকেই স্পষ্টভাবে জানা যায়, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কাছে কি চান এবং তিনি তাদের উপর কি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এখানে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই।

এজন্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলেই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই সত্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন ঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ٠ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ٠ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ٠ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ٠

> যেসব লোক কুফরী করেছে এবং (জনগণকে) আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দিচ্ছে, আল্লাহ্ তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল করে দিয়েছেন। আর যারা ঈমান এনেছে, ভাল কাজ করেছে এবং মুহাম্মাদের উপর যা কিছু নাযিল করা করা হয়েছে তার উপরও ঈমান এনেছে—তা সত্য এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে—আল্লাহ্ তাদের দোষত্রুটি দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সুষ্ঠু ও সঠিক করে দিয়েছেন। তা এই কারণে যে, অবাধ্যাচরণকারীরা বাতিলের অনুসরণ করেছে এবং ঈমান গ্রহণকারীরা তাদের প্রভুর কাছ থেকে আগত হকের অনুসরণ করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ তায়ালা লোকদেরকে তাদের আসল অবস্থা বলে দিয়ে থাকেন। —সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১-৩

কারো এরূপ ভুল ধারণার শিকার হওয়া উচিৎ নয় যে, এটা নিজেদের নবীর (সঃ) প্রশংসায় অযথা বাড়াবাড়ি, অথবা এতে স্রষ্টার কোন অধিকার খর্ব হচ্ছে অথবা পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের উপর বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। মোটেই তা নয়। নিঃসন্দেহে মুসা ও ঈসা আলায়হিস সালামের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কিতাব এসেছে এবং তাঁরা লোকদের যে পথে পরিচালিত করেছিলেন তা সত্য ন্যায়েরই পথ ছিল। কিন্তু তাদের পরে তাদের অনুসারীরা এই দীনে হকের উপর

কি জুলুম করেছে—সে সম্পর্কে তাদের কি কোন খবর আছে ? যদি তাঁরা আজ দুনিয়ায় ফিরে আসতেন, তাহলে নিজেদের কিতাবের এই করুণ অবস্থা দেখে চরমভাবে ব্যথিত হতেন, সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামের কিতাবকেই সাদরে গ্রহণ করতেন এবং কুরআনের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন।

অতএব যেভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর সব নবীদের উপর ঈমান আনা ফরয, তেমনিভাবে যদি তাদের কোন একজনকে প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর সব নবীদের প্রত্যাখ্যান করারই শামিল। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۔

> যেসব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের অমান্য করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায় আর বলে, 'আমরা কতককে মানব আর কতককে মানব না' তারা কুফর ও ইসলামের মাঝে একটি পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে। এরাই হচ্ছে পাক্কা কাফের। এই কাফেরদের জন্যই আমরা লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। অপর দিকে যেসব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের মানে এবং তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করে না—তাদেরকে আমরা অবশ্যই তাদের পুরস্কার দেব। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী।—সূরা নিসা ঃ ১৫০-৫২

মুহাম্মাদ (সঃ) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। তার মাধ্যমেই নবুয়াত নামক প্রাসাদের নির্মাণ কাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং রিসালাতের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ٠

আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ যেমন কোন ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করল এবং খুব সুন্দর করে নির্মাণ করল, কিন্তু এক কোণায় একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। লোকেরা এই প্রাসাদের চারদিকে প্রদক্ষিণ করত এবং এর সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করত। কিন্তু তারা বলত, এখানের এই ইটখানি লাগানো হয়নি কেন ? জেনে রাখ, আমিই সেই ইট এবং আমিই সমস্ত নবীদের শেষ নবী।

—বুখারী, মানাকিব অধ্যায়

অতএব রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে নবুয়াতের দাবি করলে সে মিথ্যাবাদী এবং যে ব্যক্তি তাকে নবী বলে মানবে সে কাফের। বাহাউল্লাহ্ এবং গোলাম আহমাদ নামে দুই ব্যক্তি নিজ নিজকে নবী বলে দাবি করেছে এবং নির্বোধদের একটি দল এদের পেছনে সারিবদ্ধ হয়েছে। এরা ইসলামের সাথেও নিজেদের সম্পর্ক প্রমাণ করে এবং অন্যান্য সব ধর্মকেও সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। ইসলামের ছদ্মাবরণে তারা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে নিজেদের বাতিল মতবাদ প্রচার করছে। আল্লাহ্র দীনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

তারা যে বাহাউল্লাহ্ ও গোলাম আহমাদের উপর ঈমান এনেছে এদের উভয়ই দাজ্জাল এবং কাজ্জাব ((ডাহা মিথ্যাবাদী)। তাদের সমস্ত শিক্ষাই মিথ্যা এবং প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন মজীদের বর্তমানে কোন প্রকারের ওহী নাযিল হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَلُ ‎.

মহাসত্যের পর গোমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে।

—সূরা ইউনূস ঃ ৩২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই এই ধরনের প্রতারকদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ اُمَّتِيْ اُنَاسٌ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلاَ اٰبَاؤُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لاَيُضِلُّوْنَكُمْ وَلاَيَفْتِنُوْنَكُمْ ‎.

শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে অনেক দাজ্জাল ও কায্যাবের আবির্ভাব হবে। তারা তোমাদের এমন সব কথা শুনাবে যা তোমরা কখনো শুননি এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও শুনেনি। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে। সাবধান! তারা যেন তোমাদের বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে না পারে।

অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّهُ سَتَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ ثَلٰثُوْنَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَدَّعِيْ اَنَّهُ نَبِيٌّ وَّاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ لاَيَضُرُّهُمْ مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ‎.

অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে তিরিশজন কায্যাবের আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সব সময় হকের উপর কায়েম

থাকবে। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ফয়সালা এসে যাবে এবং তখনো তারা হকের উপরই অবিচল থাকবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের আরো কতিপয় জিনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, যা আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তা জেনে নেয়া বা এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু জানা সম্ভব ছিল না। কেননা এর সম্পর্ক রয়েছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সাথে যা আমাদের দৃষ্টিসীমার অন্তরালে রয়ে গেছে। মানবীয় জ্ঞান-গবেষণা ও অনুসন্ধান করে কিছু তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে হয়ত, কিন্তু এই গবেষণার পর যে চিত্র আমাদের সামনে আসবে তা হবে খুবই অস্পষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গ।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট হেদায়াত দান করেছেন। তার আলোকেই আমরা এ আলোচনা করি এবং তাঁর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে আমরা এসব কথার উপর ঈমান রাখি!

৯

আখেরাত

াই জীবন

এই দুনিয়ায় আমাদের আসার পূর্বে কত লক্ষ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ্যা কে জানে ? এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর না জানি আবার এখানে ্ত জাতির আবির্ভাব ঘটবে ? যে অজানা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং ামনে যে অনাগত সময় রয়েছে তার সাথে আমাদের এই সীমিত জীবনের কি ্লনা হতে পারে ? এ জীবন বড়ই সীমিত, অসীমের সাথে এর কোন তুলনাই ়য় না। এই সংকীর্ণ জীবনই হচ্ছে পার্থিব জীবন। পূর্বে এ জীবনের কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং পরে তা ধ্বংস হয় যাবে। এই জীবনই হচ্ছে এই জগতের ্যকচিক্য, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা।

জীবনের দীর্ঘ পথে মানবগোষ্ঠী অনন্তর সফররত। ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে তারা যখন ্থেমে যায়, তখন তাদের মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দেয়া হয়। কিন্তু এই হাঁপিয়ে যাওয়া চেহারা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বে, এই অবসন্ন পাগুলো থেমে যাওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় একটি জাতি দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। তারা আবার নতুনভাবে সফর শুরু করে এবং নিজেদের কর্মতৎপরতার প্রদর্শনী করে। আর সেই শ্রান্তক্লান্ত জাতিকে দুনিয়ার চলমান সমাজ থেকে বের করে নিয়ে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করা হয়, কাফনে পেঁচিয়ে মাটির নিচে গোপন করে দেয়া হয়।

এখন এই নতুন জাতি নতুন উদ্যমে জীবনের কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে থাকে। অতঃপর তারা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন তাদেরকেও দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় করে দেয়া হয় এবং তাদের স্থান দখল করে আরেকটি নতুন গোষ্ঠী। বিবর্তনের এই ধারা নিরন্তর চলতে থাকে। এই হচ্ছে জীবন পথের যাত্রীদল।

জীবনের তার ছিন্ন হচ্ছে, জীবন-পথের অভিযাত্রীদল থমকে যাচ্ছে, কিন্তু এই জগতের কর্মচাঞ্চল্য বরাবর তাকে গতিশীল করে রাখছে। তার গতিতে কোনরূপ পার্থক্য সূচিত হচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে— কর্মরত মানুষগুলো তাদের কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছে, কিন্তু তারা কখনো অনুভব করতে পারে না যে, তারাও উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতায় একদিন হারিয়ে যাবে। ফুল যেমন ফোটে আবার ঝরে যায়, তারাও একদিন এই পৃথিবীর পাতা থেকে ঝরে যাবে। অনেক সময় এই দুনিয়ার ছলনা তাকে এমনভাবে বিমোহিত করে রাখে যে, সে চিন্তাও করতে পারে না-- সে কোথা থেকে এসেছে, যেভাবে একাকী এসেছে সেভাবেই নিঃসঙ্গ ফিরে যেতে হবে।

দুনিয়ার ভোগ-লালসা তাকে এতই বিভোর করে ফেলে যে, মনে হয় সে যেন অনন্তকাল ধরে এখানে আছে এবং অনন্তকাল এখানে থাকবে। সুতরাং যখন মৃত্যু এসে হানা দেয়, তখন সে হতবাক হয়ে যায়। মনে হয় মৃত্যু যেন নতুন কোন জিনিস। কিন্তু হতভম্ব হলে কি হবে! মৃত্যুদূত আর খালি হাতে ফিরে যায় না। হাত কচলাতে কচলাতে তাকে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হয়। মানুষ যে দুনিয়ায় বসবাস করে তার মেজাজ-প্রকৃতি সম্পর্কে অমনোযোগী না হওয়ার মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তারা যেন টলটলায়মান থামের উপর আকাশচুম্বী ইমারত নির্মাণ না করে।

কিন্তু এ কথার অর্থ কি ? মানবজাতির এই জগতে আসার উদ্দেশ্য কি তাই ? আমরা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলব, না, মোটেই না। এই দুনিয়ার জীবনের অবস্থা যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আখেরাতের অন্ত জীবনই আমাদের কাম্য। এই দুনিয়ার জীবনই যদি সবকিছু হত তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়ার মধ্যেই মানবজাতির কল্যাণ নিহিত থাকত। সত্য কথা এই যে, আসল জীবন এবং চিরস্থায়ী জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন। যারা সেই অনন্ত জীবনের প্রস্তুতির জন্য এই সংকীর্ণ জীবনকে কাজে লাগায়—তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। কবি বলেন ঃ

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে
চিরন্তন জীবনের জন্য
কিন্তু তারা মনে করেছে

সৃষ্টি তারা অস্থায়ী জীবনের জন্য,
তাদের কেবল পৌঁছিয়ে দেয়া হয়
আমলের জগত থেকে
দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যের জগতে।

যেসব লোক দুনিয়া ও আখেরাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তদনুযায়ী উভয়ের হক আদায় করেছে—প্রকৃতপক্ষে তারাই সৌভাগ্যবান। এখানে মানুষের জীবনকাল যত সংকীর্ণ তদনুযায়ী তার সময় ব্যয় করা উচিত। আর আখেরাতের জীবন যত দীর্ঘ হবে—তার জন্য তত দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালাতে হবে!

এই জীবনের পর

প্রত্যেকেই জানে একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে। এটা এমন এক ঘাঁটি যেখানে সবাইকে হাযির হতে হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। কিন্তু মৃত্যু কি জিনিস ? এর রহস্যই বা কি ? এ সম্পর্কে অধিকাংশ লোকেরই ধারণা নেই। তারা মৃত্যু সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার শিকার। তারা মনে করে মৃত্যুর সাথে সাথেই সবকিছু শেষ। এখান থেকে অবস্থান্তর শুরু হয়ে যায়, যার সাথে চেতনা বা অনুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। তারা মনে করে—একটি মৃত জীব যভাবে মাটিতে মিশে যায়, অথবা যবেহকৃত পশুর গোশত পাকস্থলীতে গিয়ে যেভাবে হজম হয়ে যায় এবং এরপর আর কিছুর অবশিষ্ট থাকে না—মানুষের অবস্থাও তাই।

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মৃত্যু নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নাম নয়, নিঃশেষ হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। মৃত্যুকে আমরা একটা দীর্ঘ নিদ্রা এবং একটি সংক্ষিপ্ত মৃত্যু বলতে পারি। কুরআনের দৃষ্টিতে মৃত্যু এবং ঘুম একই শ্রেণীভুক্ত জিনিস। এ হচ্ছে দুটি আপতিক অবস্থা, মানবাত্মার উপর এর প্রভাব খুব একটা বেশি নয়।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ـ

তিনিই তো আল্লাহ্, যিনি মৃত্যুর সময় রূহগুলোকে কবজ করেন এবং যারা এখনো মরেনি, ঘুমের মধ্যে তাদের রূহ কবজ করে নেন।

> অতঃপর যার উপর তিনি মৃত্যুর ফয়সালা কার্যকর করেন তার রূহ আটকে রাখেন এবং অন্যদের রূহকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠিয়ে দেন। —সূরা যুমার ঃ ৪২

কিছু সময়ের জন্য রূহ যদি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে মানুষের প্রকৃতি বদলে যায় না। দেহ যেন পোশাকের সাথে তুল্য। মানুষ তা কখনো পরিধান করে আবার কখনো খুলে রাখে। মানুষের প্রকৃতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে মৃত্যু কি জিনিস ? তা কেবল এক ধরনের স্থানান্তর মাত্র। মানুষ মরে গিয়ে নিজের স্থান পরিবর্তন করে মাত্র। সে এই বস্তুজগত থেকে এমন এক জগতে প্রবেশ করে যেখানে সে একইভাবে যাবতীয় বিষয় উপলব্ধি করতে পারে এবং তার চেতনা ও অনুভূতিও বর্তমান থাকে। বরং এখানে যেকোন বিষয়ের রহস্য আরো অধিক পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় এবং চেতনা ও অনুভূতি আরো প্রখর হয়ে যায়। এই হচ্ছে মৃত্যুর সঠিক ধারণা। এছাড়া অন্য কোন প্রকারের দৃষ্টিভংগী পোষণ করা ঠিক হবে না।

আমরা যদি এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে মৃত্যুর জন্য কোন পরোয়া নেই। তার কল্পনা করে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং সাহসী পদক্ষেপে তার সাথে বুক মেলানো উচিত।

আলমে বারযাখ (মধ্যবর্তী জগত)

মানুষ এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথে তার যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যায় এবং তার প্রাপ্য সওয়াব অথবা শাস্তি সামনে এসে যায়। আখেরাতের জীবনের এই প্রথম ঘাঁটিতে মানুষ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয় কুরআন মজীদে তার কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

> দোযখের আগুন ! এর উপর তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। আর যখন কিয়ামতের মুহূর্ত এসে দাঁড়াবে, তখন হুকুম হবে, ফিরাউনী দলবলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ কর। —সূরা মুমিন ঃ ৪৬

কুরআন শহীদদের মর্যাদাও বর্ণনা করেছে। একথাও বলা হয়েছে যে, তারা তাদের সাথীদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারাও এসে তাদের সাথে মিলিত হবে। যে সৌভাগ্য তারা লাভ করেছে তাতে এরা এসে শরীক হবে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۔ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রিযিক পাচ্ছে। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত। যেসব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে (দুনিয়ায়) রয়ে গেছে এবং এখনো তথায় পৌঁছেনি— তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত। তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিত ও উৎফুল্ল। আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার লোকদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।

—সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯-৭১

মানুষ যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন তার এক পা উপরে থাকে ও এক পা কবরে চলে যায়—তখন সফলতা বা ব্যর্থতা, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের চিত্র প্রতীয়মান হয়ে উঠে। হাদীস থেকে জানা যায়, মুমিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সান্ত্বনা দেয়া হয় এবং তার শুভ পরিণতির কথা শুনান হয়। নিম্নোক্ত আয়াতও তার সত্যতা প্রমাণ করে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۔

যেসব লোক বলে, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তারা এর উপর অটল হয়ে থাকল—নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তাদের বলতে থাকে—ভয় পেও না, চিন্তা করো না। তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছে। —সূরা হা-মীম সাজদা ঃ ৩০

পক্ষান্তরে যেসব লোক জালিম এবং স্বৈরাচারী তাদের শাস্তির দুঃসংবাদ শুনান হয়।

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ·

হায়, তুমি যদি জালিমদের সেই অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খেতে থাকে! এ সময় ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলতে থাকে ঃ দাও, বের করে দাও তোমার জানপ্রাণ। আজ তোমাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে অপমানকর আযাব দেওয়া হবে। কেননা তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা দোষারোপ করছিলে এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে অহংকার প্রদর্শন করছিলে। —সূরা আনআম ঃ ৯৩

وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ · ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ·

তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবজ করছিল। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের পশ্চাদ্ভাগের উপর আঘাত করছিল এবং বলছিল, এখন আগুনে জ্বলবার শাস্তি ভোগ কর। এটা সেই শাস্তি যার আয়োজন তোমাদের হাতসমূহ পূর্বাহ্নেই করে রেখেছে। নতুবা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর জুলুমকারী নন। —সূরা আনফাল ঃ ৫০-৫১

ঈমানদার অপরাধীরা ফরয কর্তব্যসমূহ আদায়ের ব্যাপারে যতটা ত্রুটি করে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা যতটা পদদলিত করে থাকবে— তদনুযায়ী তাদেরকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। হাদীসে এসেছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى قَبْرٍ دُفِنَ فِيْهِ شَخْصَانِ وَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ كَانَ اَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهٖ وكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ النَّاسِ ۔

নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার মধ্যে দুই ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কোন মারাত্মক অপরাধের জন্য শাস্তি হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর অপরজন লোকদের মধ্যে চোগলখোরি করে বেড়াত।

কবরের শাস্তি এবং শান্তি সম্পর্কে অনেক প্রমাণ আছে। তা থেকে জানা যায়, বেহেশত অথবা দোযখে যাওয়ার পূর্বেও এমন কিছু জিনিস আছে যা মানুষকে আনন্দ ও সৌভাগ্যের খবর শুনায় অথবা বিপদ মুসীবতের সম্মুখীন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তার ভবিষ্যতে বাসস্থান তার সামনে পেশ করা হয়। সে যদি বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে বেহেশতীদের স্থান দেখানো হয়। আর যদি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে দোযখীদের স্থান দেখানো হয়।

সাথে সাথে বলা হয়, এটাই তোমার আসল স্থান। আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এখানে পাঠাবেন। —বুখারী, মুসলিম

মানুষের বয়সের বিভিন্ন স্তর হয়ে থাকে। তা তাকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়। যেমন শিশুকাল, যৌবনকাল, বার্ধক্য ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মৃত্যুও মূলত জীবনের একটি স্তর। এই স্তরে মানুষের বোধশক্তি বেড়ে যায় এবং রূহ যা কিছু অনুভব করে তা সঠিকই অনুভব করে।

যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে সে যদি জানত যে, সে কোন্ জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছে, অথবা কোন্ স্তরে পা রাখছে তাহলে সে নির্বোধের মত এই কাজ করত না। সে আত্মহত্যা করার পূর্বে শতবার চিন্তা করত। মানসিক যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যেই সে এরূপ ভয়ংকর পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। সে এমন এক জগতে পৌঁছে যেতে চায় যেখানে তার মতে চেতনা ও অনুভূতির কোন অস্তিত্ব নেই এবং তাকে যেন আর কখনো দুঃখজনক পরিণতির সম্মুখীন হতে না হয়। তার জানা নেই, সে যে জগতের দিকে পা বাড়াচ্ছে তা মূলত অনুভূতি ও পরিণতিরই জগত। এখানে অনুভূতিশক্তি কয়েক গুণ বেড়ে যায় এবং পদে পদে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে থাকে।

মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা যে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে তা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। তাদের মতে কবর এমন একটি জায়গা যা নীরবতা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং কীটপতঙ্গের খেলার মাঠ। ব্যস এতটুকুই। আমরা এই ভয়ংকর দৃশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ নই কিন্তু যে বক্ষ কল্যাণ ও অনুগ্রহের আবেগে উচ্ছ্বসিত, যা ক্ষতিকর জিনিস সম্পর্কে সর্বদা সন্ত্রস্ত, অতঃপর এই দুই ভিত্তির উপর যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি অস্তিত্ব লাভ করে এবং যেসব যুদ্ধ ও সন্ধি হয়ে থাকে, এই পৃথিবীই এসব কিছুর সর্বশেষ মনযিল এবং এখান পর্যন্তই এর কার্যকারণ সীমাবদ্ধ— একথা আমরা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নই।

কবরের এই দৃশ্যের পেছনে রয়েছে প্রশস্ত ফুল বাগান, সেখানে নানা বর্ণের ফুল ও কলির সমাহার, সর্বত্র মন-মাতানো খোশবু ছড়িয়ে রয়েছে—এই সাজানো বাগান নেককার মুমিনদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে।

অপর দিকে কবর এমন একটি গর্ত, যেখানে নিকৃষ্ট আত্মাগুলোকে নিক্ষেপ করা হয়। এখানে তাদের উপর অবিরত হাতুড়ী মারা হচ্ছে, এখানে রয়েছে

আগুনে উত্তপ্ত অসংখ্য হাতিয়ার এবং এর সাহায্যে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে দাগ দেওয়া হচ্ছে। আর এই অবস্থায় তারা তড়পাচ্ছে এবং হাঁকডাক ছাড়ছে। এ হচ্ছে সেসব লোক যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং তাঁর বান্দাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করেছে। এটা এমন এক জগত যার রহস্য অনুধাবন করতে আমরা অক্ষম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই অদৃশ্য জগতের (আলমে বারযাখ) তথ্য এত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন যে, তা একটি অবয়বের আকারে আমাদের সামনে ভেসে উঠছে। জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী মানুষ অনুভব করতে পারত, যেন সেই দৃশ্য তাদের দৃষ্টির সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং তারা অন্তরচক্ষু দিয়ে তা দেখতে পাচ্ছে।

তিনি লোকদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেন যে, মৃত্যু জীবনেরই একটি স্তর, যেমন শৈশব, কৈশোর, বার্ধক্য জীবনের এক একটি স্তর। দেহের অভ্যন্তরে অবিরত যে হৃদকম্পন চলছে তা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ বস্তুজগত ত্যাগ করে বারযাখ জগতে চলে আসতে বাধ্য হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই বারযাখ (মধ্যবর্তী) জগতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কিছুটা আমরা এখানে তুলে ধরব।

কোন মুমিন বান্দা যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে আখেরাতের জগতে পা রাখতে যায়, তখন আসমান থেকে একদল ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তাদের চেহারা সূর্যের মত আলোক উদ্ভাসিত। তাদের সাথে থাকে বেহেশতের একটি কাফন এবং সুগন্ধি। তারা এসে তার এত কাছে বসে যে, সে স্বচক্ষে দেখতে পায়। অতঃপর মৃত্যুদূত এসে তার শিয়রে বসে বলে ঃ

> হে পাক রূহ ! চল, আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং তাঁর সন্তুষ্টির দিকে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেন, অতঃপর রূহ বেরিয়ে আসে এবং তা কলসের পানির মত গড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুদূত সাথে সাথে তা হাতে তুলে নেয়। এ সময় অপর এক ফেরেশতা সামনে এগিয়ে আসে। সে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুদূতের হাত থেকে রূহটি নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং তা কাফনের মধ্যে রেখে তাতে সুগন্ধি মেখে দেয়। এই সুগন্ধি দুনিয়ার সর্বোত্তম সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আরো বলেন, অতঃপর এই ফেরেশতা রূহ নিয়ে আসমানের দিকে চলে যায়। সে ফেরেশতাদের যে দলের সামনে দিয়েই অতিক্রম করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, এটা কোন্ পবিত্র ব্যক্তির রূহ ? সে বলে, সে অমুক ব্যক্তির পুত্র অমুক। তাকে দুনিয়াতে যেমন সর্বোত্তম নামে ডাকা হত, এখানেও সেই নামে পরিচয় দেওয়া হয়। এভাবে সে তাকে নিয়ে প্রথম আসমানের কাছে পৌঁছে যায়। সে তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলে। অতএব তা খুলে দেয়া হয়।

প্রত্যেক আসমানের বিশিষ্ট ফেরেশতা পরবর্তী আসমান পর্যন্ত তার সাথে যায়। এভাবে ঐ ফেরেশতা রূহটি নিয়ে সপ্তম আসমানে পৌঁছে যায়। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার এই বান্দার ঠিকানা ইল্লীনে লিখে দাও এবং তাকে তার পৃথিবীর দেহে পৌঁছিয়ে দাও! অতঃপর দুইজন ফেরেশতা এসে কবরের মধ্যে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে ? সে বলে, আল্লাহ্ আমার রব। তারা উভয়ে বলে তোমার দ্বীন কি ? সে বলে, ইসলাম আমার দীন। তারা উভয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কাছে যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছে তিনি কে ? সে বলে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তারা বলে, তুমি তা কিভাবে জানতে পারলে ? সে বলে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, তার উপর ঈমান এনেছি এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল তা সত্য বলে মেনে নিয়েছি।

এ সময় আসমান থেকে শব্দ আসে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য বেহেশতের বিছানা পেতে দাও এবং বেহেশতের একটি জানালা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তার কাছে বেহেশতের বায়ু এবং সুগন্ধি আসতে থাকে। তার কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। অতঃপর তার কাছে উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে এক সুদর্শন ব্যক্তি উপস্থিত হয়। সে বলে, তোমাকে সাফল্যের সুসংবাদ। এই সেই দিন যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে, তোমার গোটা দেহই তো দেখছি নূরের তৈরি ? এ ধরনের চেহারার অধিকারীদের কাছে কল্যাণই আশা করা যায়। সে বলে, আমি তোমার নেক কাজসমূহ। সে তখন বলে, হে প্রভু! কিয়ামত কায়েম কর, হে প্রভু! কিয়ামত এনে দাও। তাহলে আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের সাথে মিলিত হতে পারব।

অপরদিকে কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে কুৎসিৎ ও ভয়ংকর চেহারার অধিকারী দুই ফেরেশতা হাতে চট নিয়ে হাযির হয়। তারা উভয়ে তার এতটা দূরত্বে বসে যাতে সে তাদের দেখতে পায়। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যায়। সে তার শিয়রে বসে বলে, হে কলুষিত আত্মা! চল আল্লাহর গযব এবং তাঁর শাস্তির দিকে। অতঃপর সে তার দেহের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় এবং জোরপূর্বক তার রূহ বের করে নেয়— যেভাবে উল থেকে গরম লৌহ শলাকা টেনে বের করা হয়। সে তার রূহ নিজের হাতে নিয়ে নেয়।

অতঃপর আর এক ফেরেশতা তার হাত থেকে এই রূহ নিজের হাতে নিয়ে সেই চটে পেচিয়ে নেয়। এই রূহ থেকে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম দুর্গন্ধের চেয়েও তীব্র দুর্গন্ধ নির্গত হতে থাকে। সে তা নিয়ে উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে। ফেরেশতাদের যে দলের কাছ দিয়েই সে এই রূহ নিয়ে অতিক্রম করে, তারা তাকে জিজ্ঞেস করে—এটা কার নিকৃষ্ট আত্মা ? সে বলে, অমুকের পুত্র অমুকের। দুনিয়াতে তাকে সে নিকৃষ্ট নামে ডাকা হত সেই নামেই তার পরিচয় দেওয়া হয়। সে এটা নিয়ে আসমানের কাছে পৌঁছে যায়। সে তা নিয়ে প্রবেশ করার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলে। কিন্তু তা খোলা হয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ .

> তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ মোটেই খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূঁচের ছিদ্রপথে উটের গমন। —সূরা আরাফ ঃ ৪০

এ সময় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এর ঠিকানা সিজ্জীনে লিখে দাও, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে। অতঃপর তার রূহ নিকৃষ্টভাবে ছুঁড়ে মারা হয়। এ স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ .

> যে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেল। অতঃপর হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করবে যেখানে তার বিন্দু বিন্দু উড়ে যাবে। —সূরা হজ্জ ঃ ৩১

অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় দুই ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসায় এবং জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে ? সে বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারা জিজ্ঞেস করে, তোমার দীন কি ? সে বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারা আবার জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কাছে যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল সে কে ? সে বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। এ সময় আসমান থেকে আওয়াজ আসে, এ মিথ্যাবাদী, এর জন্য দোযখের আগুনের বিছানা পেতে দাও এবং দোযখের একটি দরজা খুলে দাও।

অতএব তার কাছে গরম বায়ু ও অগ্নিশিখা আসতে থাকে এবং তার কবর এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, তার দেহের এক পাঁজর অপর পাঁজরের সাথে মিশে যায়। অতঃপর তার সামনে একটি নিকৃষ্ট চেহারার লোক এসে হাযির হয়। তার পরনে থাকে দুর্গন্ধময় বিশ্রী পোশাক। সে বলে, তুমি যে দুষ্কর্ম করেছ তার সুসংবাদ গ্রহণ কর! এই সেই দিন যার ওয়াদা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে ? তোমার চেহারা কত ভয়ানক! তোমার কাছে অকল্যাণ ছাড়া আর কি আশা করা যায়! সে বলে, আমি তোমার সেই দুষ্কর্ম। তখন সে বলে, হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম কর না।

অপর একটি হাদীসের বর্ণনাও ঠিক এরূপ। কিন্তু তাতে আরো আছে ঃ তার কাছে একটি লোক আসে! তার চেহারা অত্যন্ত কুৎসিৎ ও দুর্গন্ধময়। তার পোশাক অত্যন্ত ভয়ংকর ধরনের। সে বলে, দুর্ভাগা! চিরন্তন শাস্তি, চিরকাল ধরে অপমান, এখন নিজের চোখ জুড়াও। সে বলে, আল্লাহ তোমার ধ্বংস করুন, তুমি কে ? সে বলে, হে বদনসীব! আমি তোমার সেই দুষ্কর্ম, পাপ কাজের ব্যস্ততা এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়া। আল্লাহ্ তোমায় ধ্বংস করুন, এ তো তোমার সেই কৃতকর্ম।

অতঃপর তার উপর একটি অন্ধ, বধির ও বোবা ফেরেশতাকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। তার হাতে দেওয়া হয় লোহার একটি ডাণ্ডা। তা দিয়ে কোন

পাহাড়ের উপর আঘাত করা হলে তা গুড়া গুড়া হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। এটা দিয়ে যখন সে তাকে আঘাত করে তখন সে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা তাকে পূর্বের ন্যায় দেহবিশিষ্ট করে দেন এবং ফেরেশতা তাকে আঘাত করতে থাকে। ফলে সে এমন জোরে চিৎকার দেয় যে, মানুষ ও জিন ছাড়া আর সব সৃষ্টিই তা শুনতে পায়। অতঃপর তার জন্য দোযখের একটি দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং দোযখের বিছানা পেতে দেওয়া হয়।

কবরের আযাব ও সওয়াবের রহস্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। দেহ ও আত্মার উপর কি কি অবস্থা ছেয়ে যায় সে সম্পর্কেও আমাদের কোন জ্ঞান নেই। তবে আমরা এই আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে ঈমান রাখি। অবশ্য এর ধরন, দেহ থেকে গোশত আলাদা হয়ে যাওয়া, হাড়গুলো গুড়া গুড়া হয়ে যাওয়া এবং এরপর যে অবস্থা হয়ে থাকে—এ সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারি না। কেননা আত্মার ন্যায় জড় পদার্থের ব্যাপারটিও অদ্ভুত ধরনের। জীবনের যে বৈশিষ্ট্য এবং জগতের যে রহস্য দিনের পর দিন সামনে আসছে— যাচ্ছে, তার দাবি এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমরা যা জানতে পেরেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করব এবং তার সূক্ষ্ম দিকগুলো ভবিষ্যতের হাতে তুলে দেব। আমরা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার উপযুক্ত নই।

ব্যক্তির জীবনকাল ও পৃথিবীর জীবনকাল

কোন ব্যক্তির জীবনকাল শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আখেরাতের পানে ধাবিত হয় এবং আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখের এই যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যদের রেখে যায়। এই জীবনের জাগরণ কতদিন ধরে চলবে, কতকাল মানুষ বেঁচে থাকবে, কতদিন জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে, কত কাল এখানে তার শক্তিমত্তা প্রদর্শন করতে থাকবে এবং বেহেশত অথবা দোযখের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে ? হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার এই জগতকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কখন সিদ্ধান্ত নেবেন ?

কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, এই জগতের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমার বাইরে সে যেতে পারে না। যখন সেই নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে— আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, যমীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সাগর-

মহাসাগর শুকিয়ে যাবে, সমগ্র সৃষ্টিকুল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বিশ্ব-ইতিহাসের এই বিরাট দফতর উলট-পালট করে দেওয়া হবে।

মৃত্যুর পূর্বে কতগুলো নিদর্শন প্রকাশ পায়, যা মৃত্যুর আগাম সংবাদ বহন করে, যেমন রোগ, বার্ধক্য বা অন্য আলামত। অনুরূপভাবে গোটা মানবজাতির জীবনকাল শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে কতগুলো নিদর্শন প্রকাশ পায়। এই নিদর্শনগুলো প্রকাশ পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার বয়সসীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে, এখন তা ধ্বংস হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

আমাদের মতে জগতের অস্তিত্ব অটুট থাকার জন্য প্রথম শর্ত এই যে, যমীনের বুকে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা নিজেদের প্রতিপালককে চিনবে এবং তাঁর অধিকারসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করবে। তাদের সংখ্যা বেশি অথবা কম যাই হোক না কেন। দুনিয়াতে যখন এ ধরনের লোকের অস্তিত্ব থাকবে না এবং একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, দুনিয়ার মানুষ এ ধরনের পবিত্র স্বভাবের লোক সৃষ্টি করতে অক্ষম তখন মনে করতে হবে দুনিয়া এখন কাঙ্গাল হয়ে পড়েছে। যেসব মূল্যবোধ তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য তা সে হারিয়ে ফেলেছে। এখন তার ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। কুরআন-হাদীসে কিয়ামতের যেসব আলামত উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কারভাবে একথাই জানা যায়।

নবী-রাসূলগণ উদ্যত জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করেছেন। নিজেদের দেহের রক্ত দিয়ে সত্যের মশাল প্রজ্বলিত করেছেন। লোকদের হিদায়াতের পথে আনার জন্য জীবনের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছেন। অবশেষে মানবগোষ্ঠীর একটি অংশ তাঁদের দাওয়াত কবুল করেছে। তারা যুগ যুগ ধরে তাঁদের পতাকাতলে চলতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। অতঃপর তাঁদের অনুসারীদের সংখ্যা যখন কমে যাবে, তাঁদের পতাকা নিম্নগামী হয়ে যাবে, তাঁদের শরীআত লুপ্ত হয়ে যাবে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শেষ হয়ে যাবে এবং তাঁদের প্রজ্বলিত আলোকশিখা নির্বাপিত করার জন্য বাতিল সভ্যতার উন্মেষ ঘটবে, মানুষ তাদের দেখানো পথ হারিয়ে ফেলবে, চারদিকে বিবাদ-বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে, সম্মান ও মর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, মসজিদসমূহ অনাবাদী পড়ে থাকবে, অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ অবশিষ্ট থাকবে না,

লোকেরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে—এই সময় গোটা মানবজাতি প্রলয়ের সম্মুখীন হবে এবং হাশরের মাঠের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে।

একথা সত্য যে, মানবজাতি আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। আজ সে প্রতিটি জিনিসের উপর হুকুম খাটাচ্ছে এবং তাকে মানুষের সুখ-শান্তির জন্য বশীভূত করেছে এবং করছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, মানবজাতি বস্তুগত দিক থেকে যতই উন্নতি করছে নৈতিক মূল্যবোধ থেকে ততই দূরে সরে যাচ্ছে। সে বস্তুগত উন্নতির যতগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করছে, নৈতিক মূল্যবোধের ঠিক তত ধাপ নিচে নেমে গেছে। সে খুনখারাবিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে, বিদ্রোহের মস্তক উত্তোলন করবে, 'আমি সর্বেসর্বা', 'আমি সবচেয়ে বড় খোদা' বলে শ্লোগান দেবে। এ সময়েই বিশ্বের ধ্বংস হওয়ার চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এ সত্যই সামনে এসে যায়।

حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا اَتٰهَا اَمْرُنَا لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٠

এমনকি যমীনের উৎপাদন— যা মানুষ ও জন্তু সকলেই খায়— খুব পুঞ্জীভূত হয়ে সুশোভিত হয়ে উঠল— তখন এর মালিকগণ মনে করছিল যে, তারা এখন তা ভোগ করতে সক্ষম। তখন সহসা রাতের বেলা কিংবা দিনের বেলা আমাদের নির্দেশ এসে পৌছল এবং আমরা তা এমনভাবে ধ্বংস করে ফেললাম, যেন গতকাল সেখানে কিছুই ছিল না। আমরা চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এভাবে নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে পেশ করি। — সূরা ইউনূস ঃ ২৪

এখানে আমরা কিছু সংখ্যক হাদীস নকল করব। তা থেকে জানা যায়, যমীনের বুকে যখন কুফর ও শিরকের জয়জয়কার চলবে তখন কিয়ামত এসে যাবে। সর্বত্র দুষ্কৃতি, ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিশৃংখলার অন্ধকার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, এরপর নেকী ও তাকওয়া এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার আর কোন আশাই করা যাবে না। দুনিয়াটা লালসা-

বাসনা, বিলাসিতা ও অহংকারের পাঁকে এমনভাবে নিমজ্জিত হবে যে, এরপর এই আবর্জনার মধ্য থেকে বের হওয়ার আর কোন উপায় থাকবে না। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى اَحَدٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ .

এমন কোন ব্যক্তির উপর কিয়ামত আসবে না, যে বলে আল্লাহ্, আল্লাহ্। —মুসলিম, কিতাবুল ঈমান

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكُوْنَ اَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ .

দুনিয়ায় এমন ব্যক্তি যখন সৌভাগ্যশালী হবে যে নিজেও অসভ্য, জঘন্য ও নিচ, আর তার পিতাও নিচ, অসভ্য ও জঘন্য— কেবল তখনই কিয়ামত কায়েম হবে।

ধর্মের প্রভাব এমনভাবে বিলীন হয়ে যাবে যে, আরব উপদ্বীপে আবার মূর্তি পূজার প্রচলন হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْرِبَ عَالِيَّاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ .

দাওস গোত্রের নারীরা যতক্ষণ যুল-খালাসার চারদিকে প্রদক্ষিণ না করবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না।

যুল-খালাসা নামে আরবে একটি মূর্তি ছিল। জাহিলী যুগের লোকেরা এর পূজা করত।

মানুষ দুনিয়ার সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস ও অর্থসম্পদের প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়বে যে, বৈধ-অবৈধ যেকোন উপায়ে তা হস্তগত করার চেষ্টা করবে। নিজেদের মর্যাদা, মনুষ্যত্ব ও সম্ভ্রমকেও এর জন্য বিকিয়ে দেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا . يَبِيْعُ أَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকার রাতের টুকরার মত বিপর্যয় দেখা দেবে। সকাল বেলা যে ব্যক্তি মুমিন ছিল সন্ধ্যেবেলা সে কাফের হয়ে যাবে। আবার সন্ধ্যে বেলা যে ব্যক্তি মুমিন ছিল সকাল বেলা সে কাফের হয়ে যাবে। দলে দলে লোকেরা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের দীনকে বিক্রি করে দেবে।

মানুষের স্বভাব-চরিত্র চরম নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌছে যাবে। ওয়াদা চুক্তি প্রকাশ্যভাবে পদদলিত হবে। ফলে গোটা পৃথিবী বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় ছেয়ে যাবে। সর্বত্র যুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْهَرَجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ

কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ সূত্র 'হারাজ' ছড়িয়ে না পড়বে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হারাজ' বলতে কি বোঝায় ? নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ খুনখারাবি, যুদ্ধবিগ্রহ।

মানুষের বয়স সীমার মধ্যে কোন বরকত থাকবে না, বয়স যত দীর্ঘই হোক না কেন কিভাবে যে তা শেষ হয়ে যাবে টেরও পাওয়া যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُوْنَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَالسَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ مِنَ النَّارِ .

> কিয়ামত কায়েম হবে না— যতক্ষণ না যুগের দৈর্ঘ্য সংকুচিত হবে, বৎসর মাসের সমান হয়ে যাবে, মাস সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ্ এক দিনের সমান, দিন ঘন্টার সমান এবং ঘন্টার পরিমাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সমান হয়ে যাবে।

এভাবে অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায়, কিয়ামত তখনই আসবে যখন যমীনের বুকে ভাল মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না এবং সর্বত্র পাপাচার ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য কখনো কোন দুষ্কৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে দেখেই কিয়ামত এসে গেছে, কিয়ামত এসে গেছে বলে চিৎকার করাও উচিত নয়। নিশ্চিতই কিয়ামত আসবে। এতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এভাবে অপেক্ষা করা কোন ক্রমেই জায়েয নেই। সৃষ্টির সূচনা থেকেই যমীনের বুকে ঝগড়াঝাটি, ফিতনা-ফাসাদ, হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধ-সংঘাত চলে আসছে। ভাল-মন্দের মধ্যে অহরহ সংঘাত চলছে। কখনো কল্যাণের জয় হচ্ছে, আবার কখনো অকল্যাণের জয় হচ্ছে। যদি কখনো কল্যাণের পরাজয় হয় তবে তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেবেন।

আমাদের এতটুকুই বলা উচিত যে, এই পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানবতাকে অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। যতদিন তার মধ্য থেকে এমন কোন সভ্যতা অথবা উম্মাত, অথবা জামাআতের আবির্ভাব হতে থাকবে— যারা হকের পথে অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকবে, আবার কখনো কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, কোন সামগ্রিক কল্যাণের খাতিরে সাময়িকভাবে অকল্যাণকে সহ্য করা হয়। অবশ্য যখন তাকওয়ার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে, কোথাও হেদায়াতের সন্ধান পাওয়া যাবে না, গোটা মানবজাতি দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে, বংশ পরম্পরায় এই রোগজীবাণু ছড়াতে থাকবে তখন মানবতার এই বিছানা উল্টিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র আদালতে হাযির করা হবে। সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে, প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَـةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

وَّ اِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا

যমীনের বুকে এই যা কিছু রয়েছে তাকে আমরা যমীনের অলংকার বানিয়ে দিয়েছি, যেন এই লোকদের পরীক্ষা করতে পারি— তাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কারা। অবশেষে আমরা এই সবকিছু একটি প্রস্তরময় মরুভূমিতে পরিণত করে দেব। —সূরা কাহ্ফ ঃ ৭, ৮

কিয়ামতের কতিপয় নিদর্শন

এই বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার পূর্বে কিয়ামতের কতিপয় বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তার কয়েকটি আমরা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করব। একটি নিদর্শন এই যে, হযরত ঈসা আলায়হিস-সালাম পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন করবেন। এই বিশেষত্ব কেবল তাঁকেই দান করা হয়েছে, অন্য কোন নবীকে নয়। তাঁর পুনরাগমনের কারণ খুব সম্ভব এই যে, তাঁর সম্পর্কে যেসব ভিত্তিহীন কথা রচনা করা হয়েছে তা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁকে আল্লাহ্র আসনে বসানো হয়েছে এবং তাঁর নামে অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকটি রাষ্ট্রও রয়েছে— খোদায়ীর এই বাতিল ধারণাকে প্রতিহত করার জন্য তিনি নিজেই পুনর্বার আগমন করবেন। খৃস্টানদের এই কল্পকাহিনীর মূল্যোৎপাটন তিনি নিজেই করবেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত না জানি কত শতাব্দী অতিক্রান্ত হবে।

অপর একটি নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ। হবে তো সে কানা, কিন্তু বিপর্যয়ের অগ্রসেনা। তার বৈশিষ্ট্য থেকে জানা যায়, সে প্রকৃতিবিজ্ঞানে হবে অত্যন্ত দক্ষ। লোকদের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে দেখাবে। সে হবে নিজের যুগের সামেরী এবং লোকদের উপর যাদুকরি প্রভাব বিস্তার করা তার জন্য হবে খুবই সহজ। তার আয়ত্তে এমন কিছু উপায়-উপকরণ থাকবে যা অপর কারো কাছে থাকবে না। এভাবে সে লোকদের নিজের দলে ভিড়াবে। সে হবে ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত। সে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্বে থেকেই আমাদের তার ধোঁকায় না পড়ার জন্য সতর্ক করে

দিয়েছেন। সে জনপদের পর জনপদ চষে বেড়াবে এবং নিজের ইবাদত করার জন্য লোকদের আহবান করবে। অবশেষে হযরত ঈসা মসীহ্ আলায়হিস সালামের হাতে সে নিহত হবে।

অপর একটি নিদর্শন হচ্ছে— সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সৌর ব্যবস্থাপনায় এই পরিবর্তন ভয়ংকর দুর্যোগেরই প্রতিধ্বনি। যে সূক্ষ্ম ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার অধীনে গ্রহ-নক্ষত্র সুশৃঙ্খলভাবে মহাবিশ্বে সাঁতার কাটছে— তা এখন আল্লাহ্র হুকুমে এলোমেলো হতে যাচ্ছে। এরপর গ্রহ-নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হতে থাকবে, পাহাড় নিজ স্থান থেকে সরে যেতে থাকবে এবং বনজঙ্গলের পশুপাখি এক জায়গায় সমবেত হতে থাকবে।

চতুর্থ একটি নিদর্শন হচ্ছে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক প্রাণীর আবির্ভাব। আমার মতে, যেসব লোককে আল্লাহ্ তাআলা বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিপালককে চিনেনি এবং জীবনভর তাঁর অধিকারসমূহ থেকে নির্লিপ্ত রয়েছে— দাব্বাতুল আরদ তাদের জন্য হবে হুঁশিয়ারী সংকেত। এই প্রাণীটি গাধা অথবা খচ্চরের বংশধরও হতে পারে। তা আবির্ভূত হয়ে তথাকথিত নেতাদের কপালে আঘাত করবে আর বলবে— আল্লাহকে চেনার মত জ্ঞানও কি তোদের দেওয়া হয়নি ? তোদের সব জ্ঞান-বুদ্ধি কোথায় চলে গেছে ? কুফর ও নাস্তিকতার এই শ্লোগান তোরা কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ٠

আর যখন আমাদের কথা পূর্ণ হওয়ার সময় তাদের উপর এসে পৌছবে, তখন আমরা তাদের জন্য যমীন থেকে একটি পশু বের করব। তা তাদের সাথে কথা বলবে। সে সাক্ষ্য দেবে, এই লোকেরা আমাদের আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করত না। —সূরা নামল ঃ ৮২

হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ

অচিরেই আমরা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাব এবং এই দুনিয়াও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। —তারপর ? আমরা প্রথমেই বলতে চাই, আল্লাহ্ তাআলা মহান এবং মহিমামণ্ডিত। তাঁর মহিমার কোন সীমা নেই। তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর রহস্য অনুধাবন করা জ্ঞানবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাদের অস্তিত্বে এনেছেন এবং মূল্যবান জীবন দান করেছেন। আমরা যদি এ জীবনের মূল্য অনুধাবন করি এবং তাকে কাজে লাগাই তাহলে তা কতই না মঙ্গলজনক। যেসব লোক জীবনের এই সুযোগকে দুর্লভ সম্পদ মনে করেছে এবং নিজেদের চরিত্র ও আমল পরিশুদ্ধ করেছে— কেবল তারাই আল্লাহ্র মহিমামণ্ডিত ছায়াতলে আশ্রয় পাবে।

আল্লাহ্ তাআলা মহাপবিত্র। তিনি নিকৃষ্ট লোকদের নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন না। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। তিনি নির্বোধদের গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি পবিত্র, তাঁর কাছে পবিত্রতাই গ্রহণযোগ্য। অপবিত্রতাকে তিনি চরম ঘৃণা করেন। নিচ স্বভাবের যেসব লোক কাদামাটির সাথে মিশে থাকে এবং এর জন্য জান দেয়, তারা কি করে আল্লাহ্র দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ ۔

> যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে— তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ কখনো খোলা হবে না। —সূরা আরাফ ঃ ৪০

মানুষের একথা ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার যে, তাকে এই দুনিয়ায় যে সংক্ষিপ্ত জীবন দান করা হয়েছে, একে যদি সে উন্নতি ও পূর্ণতা লাভের উপায় না বানায়— তাহলে তার ভবিষ্যত কখনো উজ্জ্বল হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকী লোকদের জন্য যে বেহেশতের ওয়াদা করেছেন তাতে কোন দুষ্কৃতিকারীর প্রবেশাধিকার থাকতে পারে না। মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে সৌন্দর্য ও পূর্ণতা সৃষ্টি

করতে না পারে তাহলে সেখানে তার কোন স্থান হতে পারে না। ইবলীস শয়তান তো প্রথমে বেহেশতেই বসবাস করত। কিন্তু সে অহংকার ও বিদ্রোহে লিপ্ত হল তখন তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে বললেন ঃ

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ ٠

তুই এখান থেকে নিচে নেমে যা। এখানে অবস্থান করে অহংকার প্রদর্শনের কোন অধিকার তোর নেই। তুই বের হয়ে যা, তুই লাঞ্ছনা-অপমান ভোগকারীদেরই একজন। —সূরা আরাফ ঃ ১৩

হযরত আদম আলায়হিস সালাম যখন নিজের প্রতিপালকের অধিকার সম্পর্কে অমনোযোগী হলেন এবং তার মধ্যে তাকওয়া ও কল্যাণের অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে বেহেশত থেকে বের করে দেওয়া হল। সাথে সাথে তাদের এবং তাদের বংশধরদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে, বেহেশতে বসবাসের একটি পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড রয়েছে। যে ব্যক্তি এই মানদণ্ডে উৎরাতে পারবে না সে এখানে বসবাস করার যোগ্য নয়।

অতএব যার মধ্যে শিরকের কদর্যতা রয়েছে এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু এসে গেলে তাকে বেহেশতের বাইরেই বাধা দেওয়া হবে। কদর্যতা নিয়ে কখনো প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلٰى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا اُذِنَ لَهُمْ فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ ٠

মুমিন ব্যক্তিরা দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বের হয়ে আসবে। বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে অবস্থিত পুলের কাছে তাদের বাধা দেওয়া হবে।

দুনিয়াতে তারা একে অপরের উপর যে বাড়াবাড়ি ও জুলুম করেছে এখানে তার হিসাব নেয়া হবে। যখন তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

—বুখারী-কিতাবুল রিকাক, মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড

চিন্তার বিষয়, মুমিন লোকদেরও পরিশুদ্ধ করা হবে। সে দুনিয়াতে যে ত্রুটিবিচ্যুতি করেছে, জাহান্নামের আগুন তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পরিষ্কার করে দেবে।

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ . كَلاَّ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُوْنَ .

তাদের প্রত্যেকেই কি এই লোভ পোষণ করে যে, তাকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে ? কখনই নয়। আমরা যে জিনিস দিয়ে তাদের সৃষ্টি করেছি তা তারা নিজেরাই জানে।

—সূরা মাআরিজ ঃ ৩৮, ৩৯

মানুষকে অপবিত্র পদার্থ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আঁঠালে মাটি এবং মিশ্রিত বীর্য থেকে পয়দা করা হয়েছে। এই দুনিয়ায় তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা উন্নতির ধাপগুলো অতিক্রম করে রফীকে আলা হয়ে যেতে পারে। নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই রয়েছে তাদের কল্যাণ। তারা নিজেদের মধ্য থেকে মলিনতা দূর করবে, নিজেদের স্বভাব উন্নত করবে এবং নিজেদের আত্মার পরিশুদ্ধি করবে। এভাবে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যখন তাঁর প্রতিপালকের দূত তাকে নিয়ে যাবার জন্য আসবে তখন সে হবে নিম্নোক্ত আয়াতের দৃষ্টান্ত ঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

ফেরেশতাগণ যাদের রূহ এই অবস্থায় কবজ করে যে, তারা সম্পূর্ণ পবিত্র— তখন তারা বলে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর তোমাদের আমলের বিনিময়ে।

—সূরা নাহল ঃ ৩২

আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে যাদের কার্যকলাপ থেকে সেই পচা মাটির দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এবং তাদের চরিত্রে তার মলিনতা ও অন্ধকার লক্ষ্য করা যায়। তারা কখনো জান্নাতের অধিকারী হতে পারে না তারা যতই কল্পনার ডানা বিস্তার করুক না কেন।

ইসলামের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে— এই পৃথিবীতে যারা ভাল কাজ করবে তারাই আখেরাতে সফলকাম হবে এবং যারা খারাপ কাজ করবে তারা পীড়াদায়ক শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। কতিপয় লোক তাদের ভিত্তিহীন বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায়, 'আমলের সাথে পরিণতির কোন সম্পর্ক নেই।' অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, তারা যেরূপ কাজ করছে সেরূপ প্রতিফল ভোগ করবে।

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۔ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۔

ফাসাদকারী লোকদের কাজকে আল্লাহ্ শুদ্ধ হতে দেন না। আল্লাহ্ তাঁর ফরমান দ্বারা সত্যকে সত্য করে দেখিয়ে থাকেন, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। —সূরা ইউনূস ঃ ৮১—৮২

কিয়ামতের দিন যখন নাফরমান লোকেরা পরস্পরকে তিরস্কার করতে থাকবে, একদল অপর দলের কাঁধে সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করার চেষ্টা করবে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের নিম্নোক্ত ঘোষণা শুনিয়ে দেবেন ঃ

لاَ تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۔ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ ۔

আমার সামনে তোমরা ঝগড়া করো না। আমি তোমাদের পূর্বাহ্নেই খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। আমার সামনে কথা পাল্টানো হয় না। আর আমি আমার বান্দাদের উপর জুলুমকারী নই। —সূরা কাফ ঃ ২৮—২৯

নেককার বান্দাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা যেসব ভাল কাজ করে থাকবে তার পারিশ্রমিক প্রদানে সামান্যতম হেরফের করা হবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

> যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত রয়েছে। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে। এটা আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা, তিনি মহাশক্তিশালী ও সুবিজ্ঞ।
>
> —সূরা লোকমান ঃ ৮, ৯

তথাকথিত একদল বুদ্ধিজীবী এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। তারা ভাল কাজের স্বাভাবিক পরিণতিকে খাটো করে দেখানোর অপপ্রয়াস চালায়। তারা ভাল কাজের শুভ দিক এবং খারাপ কাজের অশুভ দিকের গুরুত্বকে খাটো করে দিতে চায়। তারা নিজেদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লোকদের বলে বেড়ায়, 'পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারটি আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল' আমলের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদি তাই হয় তাহলে এটা অসম্ভব নয় যে, দুষ্কৃতিকারীরা ক্ষমা পেয়ে যাবে আর ভাল লোকেরা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মত কেই নেই। এই ধরনের বক্তব্যের সাথে আল্লাহর দীনের কোন সম্পর্ক নেই।

এই নাপাক দর্শন উম্মাতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে, ইসলামী সমাজকে কলুষিত করতে এবং দীনের শিক্ষার মূল্য ও মর্যাদা খাটো করার ব্যাপারে বড়ই নিকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ তাআলা এই নাপাক দর্শনকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

যেসব লোক পাপ কাজ করেছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদের ও ঈমানদার লোকদের একই সমান করে দেব এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হয়ে যাবে ? তারা যে ফয়সালা করেছে তা অত্যন্ত খারাপ। — সূরা জাসিয়া ঃ ২১

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ۔ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرُوْا اُولُوا الْاَلْبَابِ ۔

যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের সবাইকে আমরা কি সমান করে দেব ? মুত্তাকী লোকদের কি আমরা নাফরমান লোকদের মত করে দেব ? এ এক বরকতময় কিতাব যা আমরা তোমার উপর নাযিল করেছি— যেন এই লোকেরা তার আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। —সূরা সাদ ঃ ২৮, ২৯

বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সহজেই অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহর মর্জির অর্থ কি ? তার অর্থ মোটেই এটা নয় যে, ঈমানদার ও খেয়ানতকারীদের এক সমান করে দেওয়া হবে। ক্ষমা ও উদারতার অর্থ এই নয় যে, গোটা শরীআত বাতিল হয়ে যাবে এবং আইন-কানুন অকেজো হয়ে থাকবে।

ইমামুল আম্বিয়ার শাফাআত

গুনাহগারদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআত সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস সর্বসাধারণের মধ্যে বহুল পরিচিত। এসব হাদীসের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সৃষ্ট ধারণা এই যে, প্রতিদানের যাবতীয় বিধি-বিধান বাতিল হয়ে গেছে। আখেরাতে দোযখের আগুন গুনাহগার মুসলমানদের জন্য ফুল বাগানে পরিণত হবে। এই জাহিলরা বেপরোয়াভাবে ফরযসমূহ উপেক্ষা করে এবং দুঃসাহসের সাথে মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হয় আর বলে, উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আজ যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিই সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করতেন, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতেন এবং তাদের জাহান্নামী ঘোষণা করতেন।

প্রতিদানের ব্যাপারটিও অবশ্যম্ভাবী। অণু পরিমাণ ভাল অথবা খারাপ কাজ থাকলেও তার হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রতিফল দান করা হবে। সমস্ত লোককে এই স্তর অতিক্রম করতে হবে। পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও নেক আমল করে থাকবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও খারাপ কাজ করে থাকবে, সেও তা দেখতে পাবে। —সূরা যিল্যাল ঃ ৭, ৮

কোন এক নবীর অনুসারীদের ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান পরিত্যক্ত হবে এরূপ ধারণা করাটা চরম আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্ববর্তী কোন কোন জাতিও এ ধরনের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। কুরআন মজীদ একাধিক স্থানে তার প্রতিবাদ করেছে। শাফাআত সম্পর্কে যেসব সহীহ হাদীস রয়েছে তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেগুলোর ভ্রান্ত প্রয়োগের আমরা চরম বিরোধী। আমরা সেগুলোকে তার সঠিক স্থানে রাখতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ۔

প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দোয়া রয়েছে যা অবশ্যই কবুল হয়। আমি আমার দোয়াকে উম্মাতের শাফাআতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি। ইনশাআল্লাহু তোমাদের মধ্যে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সুফল পাবে, যে আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা গেছে। —বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসের তাৎপর্য কি ? যেকোন ব্যক্তি অশ্লীল কাজে লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না করা অবস্থায় মারা গেছে—সে-ই কি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-র এই শাফাআত লাভের অধিকারী হয়ে যাবে ? সে যে অপরাধ করেছে তা থেকে এমনি ছাড়া পেয়ে যাবে ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাখ্যান করেছেন। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীস হাশরের মাঠের ভয়ংকর অবস্থা এবং দোযখবাসীদের মর্মান্তিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

দোযখের উপরে একটি পুল স্থাপন করা হবে। আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর উম্মাতদের নিয়ে তা অতিক্রম করবে। এই দিন নবীদের ছাড়া আর কারো কথা বলার দুঃসাহস হবে না। সেদিন নবীদের কথা হবে, "হে আল্লাহ্ শান্তি দাও, শান্তি দাও"। জাহান্নামে সাদান বৃক্ষের কাঁটার অনুরূপ আংটা বিছানো থাকবে। তোমরা কি সাদানের কাঁটা দেখেছ ? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন ঃ সেগুলো সাদানের কাঁটার মতই হবে। আল্লাহ্ তাআলাই জানেন তা কত লম্বা হবে। মানুষের আমল অনুযায়ী তা তাদের শরীরে বিদ্ধ হতে থাকবে। কিছু লোক নিজেদের আমলের কারণে ধ্বংস হবে, আর কিছু লোকের দেহ নিষ্পেষিত হবে, কিন্তু মুক্তি পেয়ে যাবে। অতঃপর জাহান্নামের কিছু সংখ্যক লোকের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করবেন। তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন, যেসব লোক আল্লাহ্‌র ইবাদত করত তাদের বের করে নিয়ে এস। তারা তাদের বের করে নিয়ে আসবে। কপালে সিজদার চিহ্ন দেখেই তারা তাদের চিনতে পারবে। আল্লাহ তাআলা সিজদার অংগকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন। অতএব তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। আগুন প্রতিটি আদম সন্তানকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে, কিন্তু সিজদার স্থান অক্ষত থাকবে। তারা দগ্ধীভূত অবস্থায় দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে। তাদের উপর আবেহায়াত ঢেলে দেওয়া হবে। তখন তারা নতুনভাবে গজিয়ে উঠবে, যেভাবে বন্যার পানি চলে যাবার পর চারা গাছ জন্মায়।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, এমন অনেক মুসলমান হবে যারা প্রকাশ্যত আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছে এবং শিরক থেকে বেঁচে থেকেছে, কিন্তু অন্য কোন পাপের কারণে জাহান্নামী হয়ে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা তাদের এমনভাবে

ঝলসিয়ে দেবে যে, কেবল সিজদার চিহ্ন দেখেই তাদের চেনা যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে তারা এই কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। অতঃপর তাদের পূর্বেকার মলিনতা জীবন সঞ্জীবনী পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হবে। তখন তারা একটি নবতর সৃষ্টিতে পরিণত হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ও বেহেশতের নিয়ামত ভোগ করার উপযোগী হয়ে যাবে।

এ আলোচনা থেকে জানা গেল, শাফাআতের ক্ষেত্র এতটা বিস্তৃত নয়, যতটা আমরা ধারণা করে নিয়েছি। আর এই ভিত্তিহীন ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা নির্দ্বিধায় পাপ কাজ করে যাচ্ছি। নিছক আশা-আকাঙ্ক্ষায় কিছুই হয় না। আল্লাহ্ তাআলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, কোন কাফের অথবা ফাসেক ব্যক্তি শাফাআতের দ্বারা লাভবান হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ ٠

তোমরা সেই দিনটির ভয় কর, যখন কেউ কারো এক বিন্দু উপকারে আসবে না, কারো কাছ থেকে কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কারো সুপারিশও উপকারে আসবে না এবং কোন দিক থেকেও পাপীদের কিছুমাত্র সাহায্য করা হবে না। —সূরা বাকারা ঃ ১২৩

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ٠ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئٌ وَّلَوْكَانَ ذَاقُرْبٰى ٠

কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। কোন বোঝা বহনকারী যদি নিজের বোঝা বহনের জন্য অপর কাউকে ডাকে, তবে তার বোঝার সামান্য অংশও বহন করতে সে এগিয়ে আসবে না— সে নিকটাত্মীয় হলেও। —সূরা ফাতির ঃ ১৮

অপরাধীর নিজের অপরাধের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। কোন ব্যক্তি যতই নামায-রোযা করুক না কেন, নিজের গুনাহের প্রতিশোধ থেকে বাঁচতে পারবে না। পুলসিরাত সম্পর্কিত হাদীস এই সত্যকেই তুলে ধরেছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে যে শাফাআত লাভের আশা করা যায় তা এই যে, তা কেবল এমন ব্যক্তিরা লাভ করবে যাদের পাপ-পুণ্যের দাঁড়ি-পাল্লায় সামান্য ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। কখনো হকের পাল্লা সামান্য ভারী দেখা যাবে আবার কখনো বাতিলের পাল্লা ভারী দেখা যাবে। তারা সফলতা ও ব্যর্থতার প্রান্তদেশে অবস্থান করবে।

আমাদের পার্থিব জীবনেও এরূপ হয়ে থাকে। যেমন কোন ছাত্র সামান্য দুই-এক নম্বরের জন্য অকৃতকার্য হতে যাচ্ছে। তখন তার সাথে সহানুভূতিসুলভ আচরণ করা হয়। তাকে এক-দুই নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যাদের নম্বর অনেক কম থাকে, আমরা তাদের ফেল করিয়ে দেই। তাদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয় না। হাদীসসমূহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআত সম্পর্কে যে উল্লেখ রয়েছে—আমরা মনে করি তা কেবল এমন লোকেরাই লাভ করবে, যারা মুক্তির প্রান্তসীমায় অবস্থান করবে। যদি শাফাআতের ব্যাপক পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে শাফাআত সম্পর্কিত কুরআনের সমস্ত আয়াত এবং হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না।

এই শাফাআতের একটি উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলার দরবারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে উচ্চ মর্যাদা ও নৈকট্য রয়েছে— শাফাআতের মাধ্যমে তার অধিক চর্চা হবে। এই পার্থিব জগতে যেমন স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় দিবস, রাসূলের জন্মদিবস প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলোতে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগকারী কয়েদীদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কিছুকাল পূর্বে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়ে থাকে— শাফাআতের দৃষ্টান্তও তদ্রূপ।

সাধারণ ক্ষমার আওতায়ই রেহাই দেওয়া হয়। এতে নির্ধারিত শাস্তির উপর কোন প্রভাব পড়ে না। তার অর্থ কেউ এটা মনে করে না যে, এখন আইন প্রণয়ন করা, বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা এবং বিচারক নিয়োগ করার কোন প্রয়োজন নেই। সাধারণ মুসলমানরা শাফাআত সম্পর্কিত হাদীসের অনেকটা এরূপ অর্থ বের করতেই ব্যস্ত।

এসব হাদীস থেকে আরও জানা যায় আগে-পিছের সব উম্মাতের অনেক লোক হাশরের ময়দানের প্রচণ্ড উত্তাপে অস্থির হয়ে পড়বে। গুনাহগার লোকেরা দোযখের আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকবে। তারা আল্লাহ্‌র কাছে আহাজারি করতে থাকবে তার অসন্তোষ থেকে রেহাই পাবার জন্য। তারা নবীদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করার অনুরোধ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের দরবারে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সবিনয় নিবেদন জানাবেন। এ সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীর দোয়া কবুল করবেন।

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কোন ব্যক্তির মর্যাদা যত উচ্চই হোক না কেন, সে তাঁর কাছে কেবল বিনয়ের সাথে দোয়া করতে পারে। অন্যথায় কোন নবীর পক্ষেও স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া অথবা কোন কথা জোরপূর্বক মানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ .

আর আল্লাহ্‌র দরবারে কোন সুপারিশও কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারে না, সেই ব্যক্তি ছাড়া যার জন্য আল্লাহ্ সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি যখন লোকদের মন থেকে ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদের) জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের প্রতিপালক কি জবাব দিয়েছেন ? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গেছে। তিনি তো অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ। —সূরা সাবা ঃ ২৩

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا .

সেদিন রূহ (জিবরাঈল) এবং ফেরেশতারা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, কেউই সাড়াশব্দ করবে না। অবশ্য দয়াময় রহমান যাকে অনুমতি দেবেন কেবল সে-ই যথাযথ কথা বলবে। —সূরা নাবা ঃ ৩৮

এ আয়াত থেকে জানা গেল, সেখানে বিনা অনুমতিতে কেউ কথা বলতে পারবে না এবং যাকে অনুমতি দেওয়া হবে তাকে সঠিক ও যথার্থ কথাই বলতে হবে। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব এককভাবে আল্লাহ্র হাতেই থাকবে। অতএব যেসব লোক শাফাআতের কাল্পনিক আশার উপর ভরসা করে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে, তারা যেন দোযখীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী শুনে রাখে ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۔ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۔ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۔ حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۔

কোন্ জিনিসটি তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে গেছে ? তারা বলবে, আমরা নামাযী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না। মিসকীনদের খাবার দিতাম না। উদ্ভট কথা রচনাকারীদের সাথে মিলিত হয়ে ভিত্তিহীন কথা রচনা করতাম। প্রতিফল লাভের দিনকে মিথ্যা মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত সেই প্রত্যয়মূলক জিনিসটি আমাদের সামনে এসে গেছে। এ সময় সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। —সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ৪২-৪৮

এই জরুরী অবতরণিকার পর আমরা মহান শাফাআত সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করব। আমরা আশা করি পাঠকগণ বাড়াবাড়ির নীতি অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকবেন এবং এ হাদীসকে সঠিক স্থানে রাখার চেষ্টা করবেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সব লোককে একত্র করবেন। এ সময় তারা একেবারেই নির্জীব এবং অস্থির থাকবে। তারা বলবে, আমরা যদি এক ব্যক্তিকে আমাদের জন্য শাফাআতকারী বানিয়ে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করতাম যেন তিনি আমাদের এ স্থান থেকে মুক্তি দেন। অতএব তারা হযরত আদম আলায়হিস সালামের কাছে এসে বলবে, আপনি আদম (আঃ), গোটা

মানবজাতির পিতা। আল্লাহ্ তাআলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং বেহেশতের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তিনি ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং প্রতিটি জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন— যাতে তিনি আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দেন। আদম (আঃ) বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। এ সময় তাঁর নিজের অপরাধের কথা মনে পড়ে যাবে এবং তিনি তাঁর রবের কাছে যেতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহের কাছে যাও। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রথম রাসূল করে দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন।

অতএব তারা নূহ আলায়হিস সালামের কাছে চলে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তাঁরও নিজের কৃত অপরাধের কথা মনে পড়ে যাবে এবং তিনি আল্লাহ্র কাছে যেতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও। আল্লাহ্ তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর তারা ইবরাহীম আলায়হিস সালামের কাছে চলে আসবে। এ সময় তিনিও নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র কাছে যেতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই, বরং তোমরা মূসার কাছে যাও। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত কিতাব দান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, অতএব তারা মূসা আলায়হিস সালামের কাছে চলে আসবে। তিনিও নিজের একটি অপরাধের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র কাছে যেতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই, বরং তোমরা আল্লাহ্র রূহ ও তাঁর কলেমা ঈসার কাছে যাও।

অতঃপর তারা ঈসা রূহুল্লাহ্র কাছে চলে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই, বরং তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে চলে যাও। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতএব তারা আমার কাছে চলে আসবে। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যাওয়ার

অনুমতি চাব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখতে পাব, অমনিই সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন আমি এই অবস্থায় পড়ে থাকব। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা তোল। তুমি যা বলবে শুনা হবে, যা চাবে দেওয়া হবে এবং সুপারিশ করলে গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আমি আমার মাথা তুলব এবং আমার প্রভুর প্রশংসা করব এমন বাক্যে যা তিনি আমাকে তখন শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি শাফাআত করব। এ ব্যাপারে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আমি তাদের দোযখ থেকে বের করে এনে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেব।

আমি পুনরায় ফিরে এসে সিজদায় পড়ে যাব এবং আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন এই অবস্থায় পড়ে থাকব। অতঃপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও। যা বলবে তা শুনা হবে, যা চাইবে তা দেওয়া হবে, সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রভুর প্রশংসা করব এমন বাক্যে যা তিনি তখন আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি শাফাআত করব। এ ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। আমি তাদের দোযখ থেকে বের করে এনে বেহেশতে প্রবেশ করাব।

রাবী বলেন, আমার সঠিক মনে নেই, তিনি তৃতীয় বারে অথবা চতুর্থ বারে বলেছেন ঃ আমি বলব, হে প্রভু! দোযখে কেবল সেই লোকেরাই রয়ে গেছে যাদেরকে কুরআন প্রতিরোধ করে রেখেছে (অর্থাৎ চিরকালের জন্য জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়েছে)।

আল্লাহ্র দীনের অনুসারীদের এ কথা ভালভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, আল্লাহ্র হিসাব-নিকাশ থেকে অণু পরিমাণ ভাল অথবা মন্দ বাদ থেকে যাবে না! এখানে কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এখানে অনুমানের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। প্রতিটি আমলের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইতিপূর্বে ইহূদী জাতির মধ্যে এই অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের সাধারণ আকীদা ছিল, তাদের গোটা জাতির জন্য বেহেশত রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে গেছে। অতএব তারা দুনিয়ার ভোগ-লালসায় নিমজ্জিত হয়ে থাকত এবং তৃপ্তির

সাথে বলত, আমাদের আবার চিন্তা কিসের ? আমাদের তো ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কুরআন তাদের এই মনগড়া মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ করেছে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْأَدْنٰى وَيَقُولُوْنَ سَيُغْفَرُلَنَا ۔ وَاِنْ يَاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ اَلَمْ يُؤْخَذْعَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتَابِ اَلاَّ يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ۔

কিন্তু তাদের পরে এমন সব অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এই দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলে ব্যাপৃত থাকে আর বলে ঃ অচিরেই আমাদের মাফ করে দেওয়া হবে। সেই বৈষয়িক স্বার্থই আবার যদি তাদের সামনে এসে পড়ে, তাহলে অমনি টপ করে তা হস্তগত করে। তাদের কাছ থেকে কিতাবের প্রতিশ্রুতি কি পূর্বে গ্রহণ করা হয়নি যে, আল্লাহ্‌র নামে তারা কেবল সেই কথাই বলবে যা সত্য ? আর কিতাবে যা কিছু লেখা রয়েছে— তা তারা নিজেরাই পড়েছে। আখেরাতের বাসস্থান কেবল আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্যই কল্যাণকর হবে। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পার না ?
—সূরা আরাফ ঃ ১৬৯

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলমানদেরকেও এই ইহুদী মানসিকতা গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নিজেদের দীনেরও ক্ষতি সাধন করেছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা ও কুরুচি নাস্তিক্যবাদের জন্য ময়দান প্রশস্ত করে দিয়েছে এবং গোটা ধর্ম ও তার পতাকাবাহীদের প্রতি আস্থা কমিয়ে দিয়েছে। মুসলমানদের জন্য আফসোস! তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র কালাম তিলাওয়াত করে এবং তারপরও এ ধরনের গোমরাহীর শিকারে পরিণত হয়।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَبِهٖ وَلاَ يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا ۔

শেষ পরিণতি তোমাদের আকাঙ্ক্ষা উপরও নির্ভরশীল নয় এবং আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষার উপরও নির্ভরশীল নয়। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে নিজের জন্য কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী পাবে না। —সূরা নিসা ঃ ১২৩

প্রতিদান সত্য ও নিশ্চিত। কুরআন মজীদ বারবার একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কেননা অধিকাংশ লোক সামনের জিনিসের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং পেছনের জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। দুনিয়ার নগদ প্রাপ্তির জন্য সে জান দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু আখেরাতের ওয়াদা সম্পর্কে অমনোযোগী বরং কখনো কখনো তা অস্বীকারই করে বসে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এ ব্যাপারে সে মোটেই পরোয়া করে না যে, সেই দিনটি হবে কত ভয়ংকর।

তারা যদি নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগাত তাহলে এটা অনুধাবন করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না যে, আখেরাতের জীবনই আসল জীবন। এই জীবনে সফলতা লাভ করার জন্যই প্রতিটি বিবেকবান মানুষের চেষ্টা করা উচিত। এই জীবনে আমাদের এমন ফলের বাগান করা উচিত যার ফল এখানে ভোগ করতে না পারলেও আখেরাতে অবশ্যই ভোগ করা যাবে। আমরা যেসব কাজ করি ফলাফলের দিক থেকে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনকাল শেষ হয়ে গেলে আমরা এই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব। আমরা এখানে যেভাবে খালি হাতে এসেছি ঠিক সেভাবেই খালি হাতে ফিরে যাব। দুনিয়ার সহায়-সম্পদ আমাদের পেছনেই পড়ে থাকবে। আমরা যদি কোন ভাল কাজ করতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমাদের পরকালের পাথেয়।

আখেরাতের জীবন সম্পর্কে মানুষের মনে যদি বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় তাহলে সে নিজের এ জীবনকে অযথা নষ্ট করবে না। যে অবকাশ সে পেয়েছে তা থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَّارْتَحَلَتِ الْاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً وَّلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُوْنَ فَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدَّارِ الْمُقْبِلَةِ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدَّارِ الْمُدْبِرَةِ فَاِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَّلاَ حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَّلاَ عَمَلَ ·

দুনিয়া পেছনে সরে যাচ্ছে এবং আখেরাত সামনে এগিয়ে আসছে। এদের উভয়েরই কিছু সন্তান (পূজারী) আছে। অতএব তুমি আগত দুনিয়ার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং বিগত দুনিয়ার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হও না। কেননা আজ কাজের সুযোগ আছে, আজ তার হিসাব হচ্ছে না। কিন্তু কাল হিসাব হবে, কাজের সুযোগ থাকবে না।

—বুখারী, কিতাবুর-রিকাক

আখেরাত অস্বীকারকারীদের নির্বোধসুলভ দাবি

প্রাচীনকাল থেকে একদল লোকের ধারণা হচ্ছে— তারা এই জীবনের ঘানির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। যেমন গাধা কাঠের গাড়ির সাথে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা থাকে। চাবুক তাকে যেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সে সেদিকেই ধাবিত হয়। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলে। অতঃপর সে মরে যায় অথবা বন্দুকের গুলীর আঘাতে উড়িয়ে দেওয়া হয় .... এরপর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তারা বলে, মায়ের জরায়ু আমাদের বাইরে নিক্ষেপ করেছে, আবার মাটি তার অভ্যন্তরে আমাদের লুকিয়ে ফেলবে। কালের প্রবাহের সাথেই আমাদের জীবন-মৃত্যুর সংযোগ। এই তো শেষ।

এসব লোক ঈমানদার লোকদের উত্যক্ত করে এবং তাদের নিষ্ফল বিতর্কে জড়াতে চেষ্টা করে। তারা শপথ করে নিজেদের মতবাদকে শক্তিশালী করতে চায়। আবার তারা এমন জিনিসের শপথ করে যার উপর তাদের ঈমান নেই।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ · بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ · لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ

يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا

لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۔

এই লোকেরা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, আল্লাহ্ কোন মৃতকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন না। কেন উঠাবেন না ? এতো একটি ওয়াদা যা পূরণ করা তিনি নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। আর এরূপ হওয়া এজন্য জরুরী যে, আল্লাহ্ এদের সামনে সেই মহাসত্যকে প্রকাশ করে দেবেন— যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করছে। আর কাফিররা জানতে পারবে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। কোন জিনিসকে অস্তিত্ব দান করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা তাকে হুকুম দেব, হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যাবে। —সূরা নাহল ঃ ৩৮-৪

যে ব্যক্তি আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তার জীবনে কি সৌন্দর্য ফুটে উঠে এবং একজন নাস্তিকের জীবনে কি কি ধ্বংসকারিতা দেখা দেয় ? এ সম্পর্কে আল-মাআররীর নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখযোগ্য ঃ

বলল দুজনে তারা চিকিৎসক আর জ্যোতির্বিদ ঃ

মৃতদেহ জীবিত হবে না পুনর্বার,

আমি বললাম ঃ থামো থামো,

তোমাদের দুজনের কথা সত্য হয় যদি
আমার ক্ষতি নেই তাতে
আর যদি আমি হই সত্যবাদী
তাহলে তোমরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।
আমি নামাযের জন্য কাপড় পবিত্র রেখেছি
আর এমনিও থেকেছে পবিত্র
কিন্তু তোমাদের শরীর পবিত্র রাখার বালাই নেই,
আমি প্রভুকে স্মরণ করেছি।
এভাবে আমার হৃদয়ে শান্তিরা ঠাঁই গেড়েছে,
তোমরা হৃদয়ে ভরে রাখ বিভ্রান্তি অশান্তি

আর আমি থাকি সকাল সাঁঝে
আমার প্রভুর রহমাতের অভিলাষী
কিন্তু তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় গড্ডালিকা
প্রবাহ চলে।
আমি যা কিছু করি
তাতে যদি কিছুই না পেয়ে থাকি
তোমরাও কি পেয়েছ কিছু ?
তাকওয়ার চাদর
যদিও তার দুর্বল বুনন
আল্লাহ্ জানেন তোমাদের দু'জনের চাদরের চেয়ে ভাল।

আল-মাআররীর এই কবিতায় বিষয়বস্তুর একটি দিকই সামনে এসেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দীন হৃদয়কে রোগমুক্ত রাখে, মান-সম্ভ্রমে কোনরূপ আঘাত লাগতে দেয় না। সে দেহকেও নানাবিধ রোগ থেকে নিরাপদ রাখে— যা কুপ্রবৃত্তি ও আবেগ উত্তেজনার ফলে সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই উত্তম ফলাফলই তার চূড়ান্ত দলিল হতে পারে না। মনে হচ্ছে আল-মাআররী নির্বোধদের বক্র বিতর্কের মূলোচ্ছেদ করার জন্য শুধু ঐ জিনিসগুলোর উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আখেরাত অবিশ্বাসকারীদেরই একজন একটি বিগলিত হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হল এবং তা তাঁর সামনে রাখল। সে মনে করছিল, সে এই হাড় তাঁকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবে— এই হাড় কেমন করে একটি মানুষে পারিণত হতে পারে ?

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ٠

সে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করে এবং নিজের সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। —সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮

সে নিজের সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে গেছে— এটা একটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। এ যেন সেই প্রশ্নকারীর গালে এক কঠিন চপেটাঘাত— যে আখেরাতকে অসম্ভব এবং আল্লাহ্র কুদরতের সীমা বহির্ভূত মনে করে। এই বাক্য তাকে এমন স্থানে

ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যেখান থেকে সে জোরপূর্বক সামনে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে।

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۔ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٍ ۔ اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۔ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۔

সে বলে, কে এই অস্থিগুলোকে জীবন্ত করবে, অথচ তা জরাজীর্ণ হয়ে গেছে ? বল, এগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার তা সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন ....। যিনি আকাশসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি এদের মত আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? কেন নন ? তিনি সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা।

—সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮, ৭৯, ৮১

নিঃসন্দেহে যিনি সৃষ্টি করতে পারেন, সুন্দর কাঠামো দান করতে পারেন, তিনি পুনর্বার তাকে জীবনও দান করতে পারেন। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে যেসব প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে বাস্তব ও স্বীকৃত সত্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ۔ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۔

মানুষ বলে, আমি যখন সত্যিই মরে যাব, তখন কি আমাকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে ? মানুষের একথা কি মনে পড়ে না যে, আমরা প্রথমবার তাদের এমন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছি যখন তারা কিছুই ছিল না ? —সূরা মরিয়ম ঃ ৬৬-৬৭

সৃষ্টির ধারা তো আমাদের সামনেই অহরহ চলছে— বিভিন্ন আকারে এবং প্রকারে। কিন্তু মানুষ খেয়াল করছে না। তার দৈহিক গ্রন্থি হাজার হাজার শুক্রকীট উৎপাদন করছে। প্রতিটি শুক্রকীটের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত

হওয়ার যোগ্যতাও বর্তমান রয়েছে। সৃষ্টির এই অসংখ্য উপাদান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা জীবন সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাও তাঁর জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۔ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ۔ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۔ عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْمَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلاَ تَذَكَّرُوْنَ ۔

তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ, তোমরা এই যে শুক্রকীট নিক্ষেপ কর— তা থেকে তোমরা সন্তান সৃষ্টি কর, না এর সৃষ্টিকর্তা আমরা ? আমরাই তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছি, আর আমরা কিছুমাত্র অক্ষম নই এ কাজ থেকে যে, তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দেব এবং এমন একটা আকৃতিতে তোমাদের সৃষ্টি করব, যা তোমরা জান না। নিজেদের প্রথম সৃষ্টি লাভকে তো তোমরা জান, তাহলে কেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ?

—সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৫৮-৬২

وَعَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُعِيْدُ اللّٰهُ الْخَلْقَ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ ؟ قَالَ اَمَا مَرَرْتَ بِوَادِىْ قَوْمِكَ جَدْبًا ثُمَّ مَرَرْتَ بِهٖ يَهْتَزُّ خَضِرًا ؟ قَالَ نَعَمْ ۔ قَالَ فَتِلْكَ اٰيَةُ اللّٰهِ فِىْ خَلْقِهٖ كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۔

আবু রযীন উকায়লী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিকুলকে পুনর্বার কেমন

করে জীবিত করবেন ? এর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি কখনো তোমার সম্প্রদায়ের মাঠসমূহ অতিক্রম করেছ .... যখন তা সম্পূর্ণ শুষ্ক ও ফসলশূন্য ছিল এবং যখন তাতে উর্বরতা ও সবুজের সমারোহ ছিল ? রাবী বললেন, হাঁ। নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ এই তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টির একটি নমুনা। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা মৃতদের জীবিত করবেন।

এই যে সবুজ ফসলের মাঠ যমীনের বুককে ঢেকে নেয় এবং তার সজীবতায় যে প্রাণচাঞ্চল্য বিরাজ করে—তাও আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে। এই দৃশ্যমান সাক্ষ্য থেকে চোখ বন্ধ করে রাখা ঠিক নয়। কোন কৃষক মাটির নিচে কয়েকটি বীজ লুকিয়ে রাখে, অথবা কয়েকটি ডালপালা রোপণ করে। দেখতে দেখতে তা একটি সবুজ বাগানে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র নামে বাগান ফলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং মাঠ শস্য দানায় ভরে যায়। এই মাটি, এই আবর্জনা, এই ময়লা পানি—অবশেষে সুমিষ্ট ফল, সুন্দর ফুল এবং পত্রপল্লবে সুশোভিত বৃক্ষরাজি —আল্লাহ্‌র অপর মহিমা!

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

তোমরা দেখছ যমীন শুষ্ক অবস্থায় পড়ে আছে। অতঃপর যখনই আমরা তার উপর পানি বর্ষণ করলাম, সহসাই তা সতেজ হয়ে উঠল, ফুলে উঠল এবং যাবতীয় রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপাদন করতে শুরু করল। এসব কিছু এজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই মহাসত্য এবং তিনিই মৃতদেহ জীবিত করেন। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। কিয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ্ তাআলা কবরে অন্তর্হিত ব্যক্তিদের অবশ্যই উঠাবেন।

—সূরা হজ্জ ঃ ৫-৭

আমরা যে খাবার গ্রহণ করে থাকি তার নিষ্প্রাণ পদার্থগুলো আমাদের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জীবন্ত কোষে *(Cell)* পরিণত হয়। এর মধ্যে চেতনা, অনুভূতি এবং জীবনের স্পন্দন সবই আছে। এসব ঘটনা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে যেসব ঘটনা অনবরত আমাদের মাঝে ঘটে যাচ্ছে—সে ধরনের কোন ঘটনাকে অস্বীকার করার কি অর্থ হতে পারে ? হাশর-পুনরুত্থান তো এ ধরনেরই ব্যাপার! অতএব মানুষ নিজের সম্পর্কে কি ভাবছে ?

এই যমীন এবং যমীনের বুকের গোটা মানবজাতি এই সীমাহীন বিশ্বের তুলনায় কি গুরুত্ব রাখে ? অসীম শূন্যলোকে যে শত-সহস্র লক্ষ কোটি দুনিয়া ছড়িয়ে আছে তার সাথে ক্ষুদ্র মানুষের কি তুলনা হতে পারে ?

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ·

আকাশরাজি ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অনুধাবন করে না।

—সূরা মুমিন ঃ ৫৭

যে হাত একটি আলিশান ইমারত নির্মাণ করতে সক্ষম, তার জন্য এটা কি অসম্ভব হতে পারে যে, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সে তা নির্মাণ করে দেবে ? মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের আকীদা সন্দেহাতীত। অতএব এজন্য আমাদের প্রস্তুতি নেয়া একান্ত প্রয়োজন। নেকী, আল্লাহ্ ভীতি ও পবিত্রতার পাথেয় এখনই সংগ্রহ করার সময়। এগুলোই সেদিন আমাদের উপকারে আসবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম পর্যায়ে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الرَّائِدَ لاَ يَكْذِبُ اَهْلَهُ · وَاللّٰهِ لَوْكَذَبْتُ النَّاسَ جَمِيْعًا مَا كَذَبْتُمْ وَلَوْ غَشَشْتُ النَّاسَ جَمِيْعًا مَّا غَشَشْتُكُمْ · وَاللّٰهِ لَتَمُوْتُنَّ كَمَا تَنَامُوْنَ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُوْنَ · وَلَتُجْزَوْنَ بِالْاِحْسَانِ اِحْسَانًا وَبِالسُّوْءِ سُوْءًا وَ اِنَّهَا لَجَنَّةٌ اَبَدًا اَوْ لَنَارٌ اَبَدًا ·

পরিচালক কখনো তার লোকদের মিথ্যা বলতে পারে না। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমি লোকদের মিথ্যে কথা বলেও ফেলি—তাহলেও তোমাদের সাথে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। ধরে নাও যদি সকল লোককে আমি ধোঁকাও দিই, তবুও তোমাদের ধোঁকা দিতে পারি না। আল্লাহ্‌র শপথ! যেভাবে তোমাদের ঘুম এসে যায়, ঠিক সেভাবে একদিন মৃত্যুও এসে যাবে। তোমরা ঘুম থেকে যেভাবে জেগে উঠ, ঠিক সেভাবে মৃত্যুর পর একদিন জেগে উঠবে। যদি ভাল কাজ করে থাক তাহলে অবশ্যই ভাল ফল পাবে। আর যদি খারাপ কাজ করে থাক তাহলে খারাপ ফলই পাবে। অতঃপর হয় চিরকালের জন্য জান্নাত লাভ করবে, অন্যথায় চিরকালের জন্য দোযখ লাভ করবে।

অতএব সকাল বেলা আমরা গভীর ঘুম থেকে যেভাবে জেগে উঠি ঠিক সেভাবে একদিন কবরের ঘুম থেকেও জেগে উঠতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার পর কবর থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ বলে সাব্যস্ত হবে তাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর যারা নেককার, অনুগত ও মুত্তাকী প্রমাণিত হবে, তাদের পৌছে দেওয়া হবে ঃ

فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ‎·

প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে, মহাশক্তিমান সম্রাটের কাছে।

—সূরা কামার ঃ ৫৫